

প্রবোধবন্ধু অধিকারী



শৈব্যা পুস্তকালয় • ৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৬০

প্রকাশক : গোপাল চন্দ্র বল
শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

উৎসর্গ :

যাত্রাশিল্পের সঙ্গে জড়িত আমার
লক্ষ লক্ষ পরমাত্মীয়দের

কেউ বলেছেন ইন্দ্রসভা, কারো মতে বিচিত্তিরপুর। হৃদয়ের সঙ্গে তুলনা করে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরা বলেছেন, এ-এক আনন্দ জগৎ। যে যাই বলুক চিৎপুর যাত্রাপাড়া তার নিজের পরিমণ্ডলে নিজেই সম্পূর্ণ। উনিশ শো উনষাট সালের এক উত্তর-সন্ধ্যায় চিৎপুরের মায়া আমাকে অভিভূত করে। উনিশ শো ছিয়াত্তরে লিখি লিখি খেলা শুরু করেছিলাম। হাজার হাজার মানুষ ও মানসত্তার কোনটা ফেলে কোনটা আঁকি! কাঁটা ছেঁড়া পরিমার্জনা করতে করতে মোটামুটি যতটুকু সম্ভব ছবি আঁকার কাজ করেছি, করছি এখনও। পাঠকরা যদি তৃপ্ত হন এবং অপরিচিত এই জগৎ সম্পর্কে কৌতূহল বোধ করেন তবেই সকল ছবি সম্পূর্ণ করা এবং বাকি ছবি আঁকার উৎসাহ পেতে পারি।

প্র-ব-অ

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ : উপন্যাস—বিহঙ্গবিলাস, উপকণ্ঠ, বিষম রজনী, অতসী, দিগ্বিজয়, সীমাহীন, ধলেশ্বরী। গল্পগ্রন্থ—প্রথম পরশ, প্রজাপতির রঙ।

এক

বড় ফণিবাবু অর্থাৎ ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ মশাই বলতেন, চিত্ত থেকে চিদ্—হৃদয় থেকে উপলব্ধি। হৃদয় অর্থে মনকেও বোঝায়। সব মিলিয়ে তাই চিৎপুর হচ্ছে হৃদয়পুর। আনন্দে হৃদয়কে পরিপূর্ণ রাখতে পারলেই ঈশ্বর লাভ হয়। চিৎপুর সেদিক থেকে যথার্থ নামকরণ। চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করে যাত্রা, দান করে; এ-জন্যে চিৎপুর এবং যাত্রা—এই দুই কথার মধ্যে আশ্চর্য একটা মিল রয়েছে। যাত্রা অর্থাৎ আমাদের স্বদেশী অভিনয় প্রকরণ সবগুলো চিত্তবৃত্তিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মানুষকে একটা বিশেষ বোধের জগতে নিয়ে যেতে পারে। যাঁরা বলেন, আনন্দ ঈশ্বর, ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ অথবা আনন্দেই মুক্তি—যাত্রা তাঁদের কাছে প্রিয়। চিৎপুর অতএব যাত্রাতীর্থ।

ছোট ফণিবাবু, অর্থাৎ ফণি মতিলাল বলতেন, চিৎপুর নয়, এর নাম বিচিত্তিরপুর। বিচিত্র মানসতার এ-এক অদ্ভুত জগৎ। এখানে মায়া মানবতা মমতার নামগন্ধ নেই—জাগতিক নিয়মে স্বার্থের চক্রে সবাই এখানে ঘুরছে। আজ যে রাজা, কাল সে ফকির—এটা কেবল যাত্রায় সাজার কথা নয়; সাজার বাইরে, সকাল থেকে সন্ধ্যেতক চিৎপুরের যে-জীবন তাও তেমনি। মালিক থেকে চাকর, দালাল থেকে দলিলকার সবাই লোভের লালসা মনে পুষে দিব্যি হেসেখেলে কথা বলে। বোঝবার উপায় নেই কার কি চরিত্র। কার কি মনোবাসনা। সুতরাং মৃত্যুর দিন কয়েক আগে, অতি ক্ষোভের সঙ্গে ছোট ফণিবাবু আমাকে বললেন, তাঁর মৃতদেহ যেন চিৎপুর যাত্রা-জগতের কোনো লোক স্পর্শ না করে। সেই শেষ দেখা আমার সঙ্গে। শেষ যে-দিন গিয়েছিলাম, নট্ট কোম্পানীর মালিক

শ্রীমান মাখনলাল নট্ট ছিলো আমার সঙ্গে। এক মুখ কালো গোঁফ দাঁড়ি, হাতে রাজ্যের-কাগজপত্র-ভরা পেটমোটা একটি পোর্টফোলিও। পরনে মোটা খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবী। এতে বোতাম আছে দু'টি। কেন মাখন মাত্র দু'টি বোতাম ব্যবহার করে তারও একটি ইতিহাস রয়েছে। সে-প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করবো, এখন ছোট ফণিবাবুর কথা হচ্ছে, তাই হোক।

দেখা করতে গিয়াছিলাম ব্যাগভর্তি অগুন্তি চিঠি নিয়ে। আমার দপ্তরে প্রত্যহ শতাধিক চিঠি আসে, নানা প্রসঙ্গে লেখা। কোনোটা থিয়েটার, কোনোটা নাচ গান বাজনা। সবচেয়ে বেশি চিঠি আসতো যাত্রা বিষয় নিয়ে লেখা। সনটা

বোধ হয়। মাসটা জুন। এর বছর দুই আগেই ছোট ফণিবাবু অবসর নিয়েছেন। রিটায়ার্ড লাইফ এনজয় করছেন বেহালার নিজস্ব বাড়িতে। যাত্রাশিল্প থেকে ছোট ফণিবাবুর এই প্রস্থান কোনো দল-মালিকের, কি সহযাত্রী শিল্পীর মনে বেদনার সঞ্চার করেছিলো কিনা জানা নেই। কিন্তু ওঁর লক্ষ লক্ষ অভিনয়-মুগ্ধ দর্শক তাঁর অভাব অনুভব করতেন। এবং অনেকে জানতে চাইতেন ছোট ফণিবাবু কোথায়, কেমন আছেন। তিনি আর যাত্রায় অভিনয় করবেন কিনা। করলে কবে নাগাদ করতে পারেন—এ-রকম বহু পত্র। ওই সঙ্গে হালফিলের যুবকেরা, যারা ছোট ফণিবাবুর অভিনয় না দেখতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছেন: বাবা-মা, দাদা-দিদিদের নিকট ছোট ফণিবাবুর অসামান্য অভিনয়ের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহার নামটা পুরাণের চরিত্রের মতন মনে হয়। জানি তিনি জীবিত আছেন। তাঁহাকে কি কলিকাতার কোনো রঙ্গমঞ্চে একটি ছোট চরিত্রেও নামানো যায় না?

একটি নয়, অজস্র চিঠি। তরুণদের এই ধরনের কিছু বাছাই করা চিঠি নিয়ে আমার শেষ দেখা করা। সঙ্গে মাখন ছিল। পথপ্রদর্শক। এবং কম্বিনেশন-মাস্টার অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি আগে থেকে পরিকল্পনা করলাম অজিতবাবুকে মহাজাতি সদনে কম্বিনেশন নাইট করতে বলবো। পালা 'সিরাজদ্দৌলা'। ছোট ফণিবাবু যেহেতু অসুস্থ, সে-জন্যে তাকে একটি দৃশ্যে নামানো হবে, সিরাজ-এর বাকি অংশে অভিনয় করবেন পঞ্চু সেন। অজিতবাবুর অর্থ, আমার প্ল্যান বহুবার কলকাতায় তুফান তুলেছে। এবার আর এক টাইফুনের আয়োজন। তখন সকাল দশটা। ছোট ফণিবাবু ভেতরেই ছিলেন। আমার নাম শুনে ছুটে এলেন। বললেন, 'এ যে দেখছি দধীচির ঘরে দুর্বাসার আগমন!'

বললাম, 'দুর্বাসা আজ প্রার্থী।'

'কী প্রার্থনা তব মুনিবর?' রুগ্ন, বিশীর্ণ দেহ কিন্তু কণ্ঠস্বরে সেই মধু। মুগ্ধ হোলাম। হেসেও উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে।

বললাম, 'কাব্যছন্দে দিব কি জবাব?' ছোট ফণিবাবু আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বসালেন। তারপর কুশল বিনিময়। আলোচনা। অতীতের যাত্রাগান থেকে বর্তমান যাত্রা পর্যন্ত।

চিঠিগুলো আমি মেলে দিলাম সামনে। ছেলেকে ডাকলেন, চশমা দিতে বললেন। তারপর মাখনের সঙ্গে কথা। মাখনকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'এই যে নট্ট কোম্পানীর নব্য মালিক—ও জানে, আমি সেই বাচ্চাকাল থেকে ওদের দলে এসেছিলাম। ওর বাপ-ঠাকুর্দার সঙ্গে ছিলো আমার আত্মীয়তা। কিন্তু মাখন ভুলেও আমার খোঁজখবর নেয় না। আরে, বুড়ো হয়েছি বলে কি মরে গেছিরে…।' মাখনের পিঠ চাপড়ে হেসে উঠলেন। আমি চমকে উঠলাম। শরীরের লোমগুলো নিমেষে সজারু- কাঁটার মতন খাড়া হয়ে উঠলো। বুঝতে কষ্ট হলো না, এই হাসিটা ভয়ঙ্কর এক অভিনেতার অভিমান গোপন করার হাসি। এমন হাসি কেবল ছোট ফণিতেই সম্ভব।

'মরিনি মাখন, মরিনি। ছোট ফণি ছোট হতে পারে কিন্তু মরে না।' আবার স্তম্ভিত হবার মতন কণ্ঠস্বর আর অভিব্যক্তি। চট করে তাকালেন আমার দিকে, 'কী গো দুর্বাসা, ছোট ফণি মরে?'

কথা বলতে পারি নি। কেন যেন চাপা কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিলো। ঘাড় ঝুঁকিয়ে জানালাম, না। ততক্ষণে ছোট ছেলে চশমা নিয়ে এসেছে।

মাখন এমনিতেই ভয়ানক লাজুক, চাপা এবং নরম স্বভাবের ছেলে। ওর মুখচোখ দেখলাম লাল হয়ে এসেছে। অজিতবাবু কথা বলছেন না, হা করে তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধ সিরাজ-এর দিকে।

মানুষ কথা বলে মুখে। বলার সঙ্গে বাচন-প্রতীক-ভঙ্গি বড় জোর ফুটে ওঠে মুখে। ইংরেজিতে যাকে আমরা এক্সপ্রেশন বলি। এক্সপ্রেশন আসলে আরও ব্যাপক, পরিব্যাপ্ত। এখানে তাই ইংরেজি কথাটাকে সংকীর্ণতায় বদ্ধ না করে বলছি বাচন-প্রতীক-মুখভঙ্গি। ছোট ফণিবাবুকে দেখেছি আসরে ও বাইরে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ এবং সারা অঙ্গ কাজ করে। ইংরেজিতে যাকে 'জেসচার' বলে, বাংলায় বোধ হয় তাকে বলা চলে বাচন-প্রতীক অঙ্গভঙ্গি। মুখ আর দেহকে

এমন করে কাজে লাগাতে দেখি নি কোনো অভিনেতাকেই। আমার যেটুকু অতীত মনে আছে, তাই দিয়ে স্মরণ করতে পারছি। অল্প বয়সে শিশিরবাবুর শেষ দিকের অভিনয় দেখেছি। নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশাইয়ের কথাও মনে আছে। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিটিও মনের পর্দায় স্পষ্টই জেগে আছে। অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, মহেন্দ্র গুপ্ত, কমল মিত্র, নরেশ মিত্র এঁদের সঙ্গে তো পরবর্তীকালে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই হয়েছিলো। সান্নিধ্য পেয়েছি, অভিনয় দেখেছি প্রচুর। কিন্তু থিয়েটার কি চলচ্চিত্রের হাজারো শিল্পীর মধ্যে একটা ছোট ফণিকে কোনোদিন খুঁজে পাইনি।

অভিনয় জগতের যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ—এদেশ কি ওদেশের, তাঁরা বলেছেন, অভিনেতার দেহসৌষ্ঠবই নাকি সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। সুন্দর সুপুরুষ দীর্ঘকায় না হলে নাকি কোনো ব্যক্তির পক্ষেই বড় অভিনেতা হওয়া কঠিন। কথাটা যে নির্জলা মিথ্যে, ছোট ফণিবাবুই তার একটি দৃষ্টান্ত। কত হাইট ছিলো তাঁর ? বড় জোর পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি। দেখতেও ছিলেন না আহামরি কিছু। অক্ষর জ্ঞান ছিলো, কায়ক্লেশে লিখতেও পারতেন—কিন্তু পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র পদবী দেওয়া সেই 'মূর্খ পণ্ডিত' কী না জানতেন ! আসরে উঠলে অভিনয় করে তাঁকে কেউ হারিয়ে দেবে এমন ব্যক্তিত্ব বা বড় দরের অভিনেতা আমার চোখে অন্ততঃ পড়ে নি।

খুব ছোটবেলায়, আমার যখন বয়স সাত কি আট তখন আমাদের গ্রামে গণেশ অপেরা গিয়েছিলো। ছোট ফণি, বড় ফণি, প্রভাত বোস, সুদর্শন রাণী ছিলেন ওই দলে। পাঁচ রাত্রে পাঁচটি পালা ওঁরা অভিনয় করেন। তার মধ্যে এখনও আমার মনে আছে 'বিজয়সিংহ' পালা। শুধু যে মনে আছে তা নয়, চোখ বুজলে আমি দৃশ্যগুলো স্মরণ করতে পারি, স্মৃতির পর্দায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাট্যমুহূর্তগুলোও। তার আগেই অবশ্য এঁদের নাম জানতাম, এঁদের দেখেছি। উৎসাহ পেয়েছি। যাত্রা আমাকে কেবল অভিভূত করতো—এ-কথাটুকু বললেই সবটা বলা হয় না; যাত্রাগান আমাকে রীতিমতো ভাবাতো।

ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার মাইথান গ্রামে আমার জন্ম। শৈশব কেটেছে আমার ওখানেই। কৈশোরও। গ্রাম বলে এ-কথা ভাবার কোনো কারণ নেই সংস্কৃতি ও শিক্ষার দিক থেকে গ্রাম ছিলো অন্ধকার। আমাদের গ্রামেই ছিল এই এলাকার বিখ্যাত থিয়েটার দল। বছরে পাঁচ ছয়বার থিয়েটার হতোই।

মাইল পাঁচেক দূরে টাঙ্গাইল। সেখানে চারটি সিনেমা হলে নিয়মিত ছবি দেখানো হতো। প্রায়শ দলবেঁধে আমরা সিনেমা দেখতে যেতাম। দেখে আনন্দ পাই নি বললে ভুল বলা হবে, কিন্তু ওই বয়সে যাত্রাগান যে-পরিমাণে আমাকে আবিষ্ট করে রাখতো তেমনটি পারতো না অন্য কোনো শিল্প। কারণ? কারণ অনেক। তা বলার সুযোগ রইলো। এখন বরং ছোট ফণিবাবু প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।



বিজয়সিংহ পালাটির অভিনয় যেদিন হয়, সেদিন কিন্তু পালাটি শেষ হলো না। মধ্যপথে ভেঙে গেলো যাত্রা। না, খারাপ অভিনয়ের জন্য নয়, আসলে সুদর্শনরাণী সিংহল রাজকন্যে সেজে আসার সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন উঠলো। দর্শকদের সত্তর ভাগই মুসলমান। কেন এই গুঞ্জরণ, অনেক পরে তা জানতে পারলাম। সুদর্শন এমন সাজে সেজেছেন যে, মনে হচ্ছিলো তার তুল্য সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। যেমন রূপসজ্জা তেমনি সাজ-পোশাক। কণ্ঠস্বরও বুঝতে দেয় নি তিনি পুরুষ। প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে হঠাৎ প্রচণ্ড গোলমাল। আসরে যাত্রা হচ্ছে তখনও। দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি, প্রাণ নিয়ে পলায়নের এক ভয়াবহ দৃশ্য। মেয়েরা কাঁদছে, ছলকে ওঠা জনতার পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে আর্তনাদ করছে অনেকে। মায়ের কোলের শিশুরা কেঁদে উঠে আতঙ্কে সিটিয়ে যাচ্ছিলো। আমরা নাটমন্দিরের ডানদিকের পেছনে লুকোলাম। তারপর জন সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গ হলে শোনা গেলো, একদল দর্শক আসর থেকে সুদর্শনরাণীকে লুঠ করে নিয়ে গেছে। উন্মত্ত দর্শক অবশ্য সেই রাত্রেই সুদর্শনকে ফেরৎ দিয়েছিলো কিন্তু সে-দিনের ভাঙা যাত্রা আর শুরু করা সম্ভব হয় নি। পরদিন থেকে দর্শকরা আর গোলমাল করে নি।

বড়ফণি, ছোটফণি এবং প্রভাত বোস—সেদিনের যাত্রায় এই তিনের স্থান ছিল শীর্ষে। তিন মাথা একসঙ্গে সুতরাং গণেশ অপেরার যাত্রার কাছে দাঁড়াবে কে? অভিনয়ে কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পারছেন না। বড় ফণিবাবু ছিলেন সুদর্শন, দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান এবং ফর্সা। টিকলো নাক, সনোরিয়াস ভয়েস, ডাগর চোখ। প্রভাত বোস দীর্ঘদেহীই ছিলেন কিন্তু ওসারে কিছু বড়ো। তুলনায় ছোটফণি খর্বকায়, কৃশ, বর্ণমাধুর্যহীন এবং সাধারণ মুখের অধিকারী। কিন্তু অভিনয়ের সময় কণ্ঠ দেহ মুখ চোখ দিয়ে এমন সব কাজ দেখাতেন যে, দীর্ঘদেহী সুপুরুষ অভিনেতারা পটাপট কুপোকাৎ হয়ে পড়তেন।

এ-প্রসঙ্গে দুই ফণির বিরোধের ঘটনাটা বোধ হয় আসতে পারে। যাত্রাশিল্পের দুই প্রান্তে তখন দুই ফণি। দু'জনের বৈশিষ্ট্য বলেছি। কিন্তু যাত্রার দর্শক একটু মোটা কাজ, শরীরের কাজ, অতি আবেগ পছন্দ করেন বলে, প্রায়শই শোনা যেতো, অভিনেতা হিসাবে বড়ফণিই শ্রেষ্ঠ। ছোটফণির অভিনয়-মুগ্ধ দর্শকের সংখ্যা তৎকালে খুব বেশি না থাকলেও একেবারে ছিলো না তা বলতে পারবে না কোনো শত্রুও। সুতরাং দীর্ঘকালের ক্ষোভ একদিন প্রকাশ করে ফেললেন ছোটফণি। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদকে বললেন—'আপনি নিজে একটা পালা লিখুন। তার সবচেয়ে ভালো চরিত্রটা আপনি করবেন, আমি করবো সবচেয়ে খারাপ এবং ছোট চরিত্র। শেষ পর্যন্ত আমাকে একটা জায়গায় দাঁড়াতেই হবে, আপনি বড়ো না আমি।'

বড় ফণিবাবু কেবল অভিনেতাই ছিলেন না, ছিলেন বিখ্যাত পালাকার, অভিনয়-শিক্ষক। এ-জন্যে তাঁকে যাত্রাশিল্পের সকলেই মাস্টারমশাই বলে ডাকতেন। ছোট ফণিবাবু ছিলেন অভিমানী, একগুঁয়ে, জেদি। চ্যালেঞ্জ এ্যাকসেপটেড। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ বললেন, তথাস্তু। ব্যাস, শুরু হলো 'চক্রছায়ার' কাজ। আসরে যখন এলো পালাটি, দেখা গেলো অর্জুন সেজেছেন বড়ফণি, কৃষ্ণ ছোটফণি। রামরাজাতলায় বাড়িতে বসে ঘটনাটা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে-ছিলেন বড় ফণিবাবু। বললেন, 'পার্টটা আমি ইচ্ছে করেই হেলাফেলা করে লিখেছিলাম। সিওর ছিলাম ছোটো হেরে যাবে। মহলাতে ফেলার পরেও সেই বিশ্বাসে অটুট ছিলাম। কিন্তু আসরে উঠে দেখি ছোটবাবুর অন্য চেহারা! টোটাল কনসেপশনটাই পালটে দিয়েছে। কথায় কথায় গলা আর শরীরের সূক্ষ্ম কাজ। ওমা, একটা দৃশ্যে ও ভোল পালটে দিলো যাত্রার। আমি অবাক,

বিস্মিত, মুগ্ধ, হতবাক। হারছি বটে কিন্তু গর্বে বুকটা ভরে উঠছে। মনে হচ্ছিলো, স্বয়ং শুক্রাচার্য ভর করেছে ওর মধ্যে।'

দু' মুহূর্তের নীরবতা। বড় ফণিবাবু চুপ। মাথা নিচু করে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। চোখ মুছতে মুছতে তাকালেন, বললেন, 'হি ইজ এ লিভিং ব্যুলেট।'

কথাটা ছোট ফণিবাবুকে বলেছিলাম। মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বলা শেষ হলে উঠে দাঁড়ালেন। পায়চারি করলেন কয়েকবার। তারপর বললেন, 'কী ছেলে-মানুষীই না করেছিলাম সে-দিন। আসলে কি জানেন, আমি খুব জেদি। আমার জেদকে বিলক্ষণ ভয় করতেন বড়বাবু। ওঁর মনটা জানেন, খুব বড়ো, একেবারে ওঁর নিজের বুকের সমান।'



চিঠি পড়ে হাসলেন। এ-হাসির অর্থ অল্প, গভীরতা অনেক। বললেন, 'ভাখো দুর্বাসা, ভাখো', গলায় প্রবল উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস এবং আবেগ। চট করে দাঁড়িয়ে পড়লেন, চিঠি-ধরা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'পৃথিবীটা একেবারে অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় নি এখনও। মানুষ আছে গো, মানুষ আছে।' এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম বাঘের মতো মানুষটার দু'চোখের কোল আর্দ্র। কথা বলতে ওঁর নীচের ওষ্ঠ চিরল পাতার মতো ভীরু কম্পনে কাঁপছে।

সব কথা, সকল পরিকল্পনা খুলে বললাম। চুপচাপ বসে শুনলেন। শেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দেওয়ালে টাঙ্গানো যৌবনের সিরাজকে এক পলক দেখে নিয়ে তাকালেন আমার দিকে। হঠাৎ চড়া গলায়, ভীষণ উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'করবো, আমি করবো—শেষবারের মতো আমি সিরাজ সাজবো।'

কিন্তু সেই বায়না, সেই অভিমান। না, একটি দৃশ্য করেই ক্ষান্ত হতে রাজি নন ছোট ফণিবাবু। পুরো চরিত্রটাই তাঁর চাই। বললেন, 'তুমি বিশ্বাস করো দুর্বাসা, আমি ঠিক পারবো।' বললাম, 'জীবন-ভর অনেক জেদের পরিচয় তো

দিয়েছেন, আর বাড়াবাড়িটা না-করাই ভালো।' শুনে রেগে গেলেন ভয়ানক, 'ছোটফণির অভিধানে বাড়াবাড়ি বলে কোনো শব্দ নেই। আমি পুরোটাই চাই।' তারপর ধপ করে ইমোশন থেকে সটান পতন। অল্প নীরবতা। হাঁপালেন বার কয়েক। ধরা গলায় বললেন, 'জনতা ডাক দিয়েছে, দেশ ডাকছে, মরবার আগে আমি একবার দপ্ করে জ্বলে উঠবো না কেন, সেই কথাটাই আমাকে বোঝাও।'

বোঝাই নি, বোঝাতে পারি নি। বাঙলার শেষ সিরাজ-এর ছেলেরা আমাকে ইশারায় ডেকে নিয়ে বললো, প্রস্তাবটা তুলে নিতে। বোঝালে হয়তো আপাতত রাজি হবেন, কিন্তু একবার সেজে বসলে ওঁকে আর থামানো যাবে না। পুরো সিরাজটাই করে ছাড়বেন। ওঁর যা শরীর-গতিক তাতে সম্পূর্ণ সিরাজ করা মানেই অগ্রিম মৃত্যুকে ডেকে আনা।

ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে ঘরে ঢুকলাম, দেখি অপলকে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। পাশে বসলাম। তবু তাকিয়ে আছেন। মুখে কথা নেই। মাথন বুঝেছে ব্যাপারটা। ইশারা করছিলো আমাকে, যাতে আমি উঠে পড়ি। উঠবো উঠবো করছি এমন সময় মুখ খুললেন, 'ওরা কিছু বলছিলো তোমাকে?' বললাম, 'না, আমি ওদের বোঝাচ্ছিলাম।'

বললেন 'বুঝি বুঝি, সব বুঝি। আমাকে গৌরবের সঙ্গে কেউ মরতে দিতে চায় না।'

'আজ উঠি' আমি বললাম। 'আপনি সিরাজ-এর পুরোটাই যে করবেন, তা ভেবে আমরা আসি নি। একটু ভেবে নিয়ে, দিন কয়েকের মধ্যেই আসবো।'

জানলার বাইরে দুপুরে রোদ। রাস্তার ও-পাশে খানিকটা ঝোপঝাড় পেরিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছিলো। পাখি ডাকছে কোথাও। দুপুরে নিঃসঙ্গ ঘুঘুর ডাক। ওদিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ তন্ময় হয়ে রইলেন। 'আমরা যাই'—অনুমতি চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা উঠলাম। ঠিক তক্ষুণি একটি বিশাল দীর্ঘশ্বাস ওঁর বুক খালি করে বেরিয়ে এলো। বললেন, 'জানি আর আসবে না। এলেও সিরাজ সাজার কথা আর তুলবে না। কিন্তু দুর্বাসা, শোনো, আমার যে আর একবার সিরাজ সাজতে মন চাইছে, শেষ সিরাজ...'

ছোট ফণিবাবুর শেষ বাসনা আমরা পূর্ণ করতে পারি নি। সে লজ্জা আমার, সে ব্যর্থতা আমাদের। নাই বা পারলাম সিরাজ সাজাতে, ওঁর দীর্ঘজীবন লাভের

চেষ্টাই কি আমরা করেছি ? করি নি ? ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেক যাত্রা-মালিককে অনুরোধ করেছিলাম, শিল্পীদের কাছেও রেখেছি অনেক আর্জি কিন্তু দুর্ভাগ্য, কেউ ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ান নি, বলেন নি : বাঙলার যাত্রাজগৎ এতদিন আপনার দীপ্তোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের আলোকে আলোকিত ছিলো। অথবা বলে নি, আমরা ছোট ফণিবাবু, আপনার কাছেই আছি। ডাকলেই আমাদের পাবেন। সুতরাং অভিমানে আহত সূর্য একদিন সত্যি সত্যি পশ্চিম দিগন্তে অস্তমিত হলো, আর উঠলো না।

ছোট ফণিবাবু আজ আর নেই কিন্তু ওঁর দেওয়া নামের বিচিত্তিরপুর আজও রঙিন মুখোসের আড়ালে তার কাজটুকু করে যাচ্ছে। কাউকে চিনবার উপায় নেই। একদিন রাত্রি একটায় ওঁর গাড়িতে ওঁর অনুরোধেই একসঙ্গে ফিরছি চাকদহের আসর থেকে। ওঁর গাড়ি মানে নিজের গাড়ি নয়। বয়স হয়েছে বলে কোম্পানীর মালিক একখানা কার ভাড়ায় নিয়েছেন, আট আনা মাইল হিসেবে। সম্ভবতঃ গাড়িটা ছিল কপিলের। সে ছোট ফণিবাবুকে ঠিক সময়ে বাড়ি থেকে তুলে আসরে পৌঁছে দিতো এবং গান শেষ হলে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে যেতো কপিল। ছোট ফণিবাবু প্রথমটা ছিলেন গম্ভীর। সে দিন যে কাণ্ডটা চাকদহের আসরে ঘটেছিলো, তাতে গম্ভীর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমিও কুণ্ঠায়, লজ্জায় মরে আছি। এক সময় ছোট ফণিবাবু বললেন, 'শিল্পীর জীবনটা কেমন, জানো দুর্বাসা ?'

'কেমন ?'

'হুবহু বারবণিতার মতন।'

একটু থেমে কি ভাবলেন। তারপর বললেন, 'যতদিন রূপ-যৌবন, ততদিন খদ্দের। ওই সম্পদটি চলে গেলে কোনো পুরুষই আর দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াবে না। আমরা শিল্পীরা সকলেই এই উপমার অধিকারে। ভাল কাজ, সুন্দর কণ্ঠ, কঠিন পরিশ্রম দিয়ে যতদিন দর্শকের মনোরঞ্জন করতে পারবো ততদিনই আমাদের দাম, তাই না ?'

জবাব দিতে পারতাম হয়তো কিন্তু তখন দিতে পারি নি। এই তো কিছুক্ষণ আগে যে-ঘটনা চাকদহের আসরে ঘটে গেল, তারপর লজ্জায়, অনুশোচনায় মুখ দিয়ে কথা সরছে না।

ঘটনাটা সবিস্তারে না বললে, ছোটফণিবাবুর উক্তির তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া কঠিন।



মাসটা সম্ভবত ফাল্গুন, সন উনিশশো পয়ষট্টি। নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টির মালিক কিষাণ দাশগুপ্ত ইউ এন আই থেকে ফোন করলেন। শুক্রবারে চাকদহের আসরে গান, আমি যদি দেখতে যেতে সম্মত হই তো, তিনি আনন্দিত হন। 'গান' যাত্রার ডাকনাম। আদিকাল থেকেই নামটি প্রচলিত। আগে যেহেতু যাত্রার বারো আনাই ছিলো সংগীত, সে কারণে গান কথাটার ব্যবহার। সংগীতবহুল নাট্যের নামই গান। আমাদের নাট্যশাস্ত্র কি অভিনয় দর্পণও গান অর্থে নাটক বুঝিয়েছে, আবার নৃত্য অর্থেও তাই। যাত্রায় আগে নানা ধরনের গান ব্যবহার করা হতো। বিবেকের গান, সখা-সখীদের সম্মেলক সংগীত, নায়ক নায়িকা, উপনায়িকার গান এবং জুরীদের কালোয়াতি। তার মধ্যে জুরীদের গানটাই ছিল প্রধান। আট দশ ঘণ্টার যাত্রাভিনয়ে জুরীদের আবির্ভাব ঘটতো অনেকবার। পালা যখন যে-রস নিয়ে এগোবে, ঠিক তখন হঠাৎ আসরের দু'পাশ থেকে ঝটিতি উঠে আসবে কালো চোগা-চাপকান-পরা জনা-আস্টেক গাইয়ে। তারপর শুরু হবে রাগ রাগিনী নিয়ে দু' দলের দ্বন্দ্ব। কখনও গলায়, কখনও যন্ত্রে চলবে সংগীতের প্রতিযোগিতা। একবার আসরে 'সাবিত্রী সত্যবান' পালা হচ্ছে। সত্যবানের মৃতদেহ নিয়ে রোদন করছে সাবিত্রী। এমন সময় যমরাজের প্রবেশ। বাদানুবাদ। যম শবদেহ নিয়ে যাবে, সাবিত্রী স্বামীদেহ যমকে দিতে অসম্মত। কথায় কথায় পালা উঠেছে টপ-ক্লাইম্যাক্সে, এমন সময় আচমকা জুরীদের দেখা গেলো আসরে। সাবিত্রীর রোদন অবলম্বন করে কত রকমের করুণ রসের গান হতে পারে, তাই নিয়ে দু' দলে শুরু হলো কালোয়াতি। বেচারী সাবিত্রী তখন যম আর স্বামী চিন্তা ছেড়ে ভাবতে বসলেন, কী করে তিনি

এই অ্যানটি-ক্লাইমেক্সকে আবার ক্লাইমেক্সে তুলবেন। সুতরাং ঘণ্টাখানেক গান বিনিময়ের মধ্যেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন। জুরীরা ধরতাই পেয়েও চমকালেন। সাবিত্রী করজোড়ে যমকে বললেন, 'ত্রিভুবন-ত্রাস তুমি ভয়াবহ যম, পার নাকি রক্ষিতে নারীর সম্মান? পদতলে করজোড়ে করি গো মিনতি, নহে সত্যবান, লহ দেব জুরীদের শব, বাঁচাও আমারে—শতরঞ্চ-তলা থেকে বাঁচাও পালারে।'

কথিত আছে, তারপর থেকে যাত্রায় জুরীদের অত্যাচার পর্ব উঠে গিয়েছিলো।

কিষাণবাবু ফোন করছেন। বললাম, 'গান কটায়'?

'আটটায়' ও দিক থেকে কিষাণবাবু বললেন।

বললাম, 'ঠিক আছে, আমি যাবো।'



শুক্রবার পড়ন্ত বিকেলে পাঠানো গাড়িটি আমাকে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিস থেকে নিয়ে এলো নাট্যভারতীর গদিঘরে। শোভাবাজার চিৎপুর জংশন থেকে গঙ্গার দিকে যেতেই ঠিক ডানদিকে একটা ভাঙামতন বাড়ির দ্বিতলে নাট্যভারতীর গদী। নীচে চায়ের দোকান। তার চাপা পাশ দিয়ে ঢুকলেই, পেছন দিকে নড়বড়ে খাড়া এক কাঠের সিঁড়ি। এই সিঁড়ি অতিক্রম করলে, ওপরের দু'খানি ঘর নিয়ে দলের গদী। ওপরে উঠে দেখি কিষাণ দাশগুপ্ত মশাই ঘর আর বারান্দায় অস্থির পায়চারি করছেন আর থেকে থেকে ইস্…ইস্…ইস্স্ শব্দ করছেন মুখে।

আমাকে দেখে উৎফুল্ল হলেন। বললাম, 'ব্যাপার কী, অমন ছটফট করছেন কেন?'

কিষাণ দাশগুপ্ত ওরিজিন্যালি বরিশালের লোক। ঝালকাঠি মহকুমার। পশ্চিমের শুদ্ধ বাংলা একেবারেই বলতে পারেন না। আমার প্রশ্ন শুনে দাঁড়ালেন। ওফ…

ওফ…করে দু'বার আক্ষেপের অব্যয় ছুঁড়ে দিলেন। তারপর প্যাকাটির মতন শরীরটা থপ্ করে বসলো চেয়ারে, 'মইর‍্যা গেচি, বাঁইচ্যা নাই ; হালার গিধরে আমারে জ্যাস্ত মাইরা ফ্যালাইচে।'

বললাম, 'কে ! কে মারালো আপনাকে ?'

'ছুট ফণি,' রাগে আক্রোশে তোতলাতে লাগলেন কিষাণ দাশগুপ্ত। 'আমারে জানে খতম কইর‍্যা ফ্যালাইচে। ধনে প্রাণে শ্যাষ হইয়া যামু্গা।' চেয়ার ছেড়ে ত্বরিতে উঠলেন। আবার শুরু হলো পায়চারি। নীচে শোভাবাজার স্ট্রীটের ওপর দলের বাস দাঁড়ানো। ঘর আর বারান্দা-ভরা শিল্পীরা। কারও মুখে কোনো কথা নেই। যতদূর মনে আছে সুখেন্দুবাবু দেওয়াল ঘেঁষে বসানো তক্ত পোষের ওপর লাল খেরো খাতার পাতা ওল্টাচ্ছেন। অবিরাম। বুঝলাম ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে কাজটি করে যাচ্ছেন। পায়চারিরত কিষাণবাবুর পেছন পেছন কাঁচুমাচু মুখে ফলো করে যাচ্ছে খোকা মল্লিক। খোকা যতবার কিছু বলতে যায় ততবার ধমক খায়। তাই বলে খোকাও কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়।

যাত্রায় তখন খোকা মল্লিকের খুব নামডাক। সুরপার্টিতে তার অভাব পুরণ করবার মতো কোনো লোক নেই। ক্ল্যারিওনেট হাতে তুললেই সব মাৎ। আসরের দু-পাশে যদি একজন শিল্পীও না থাকে, খোকা একাই এক ক্ল্যারিওনেটে সব ম্যানেজ করে নিতে পারে। এমন প্রতিভাবান যদি, তবে কেন বড়ো দলে ঠাঁই হয় না খোকার ! মাখনকে আমি একদিন বললাম। নট্ট কোম্পানীর মতো দলে খোকা যদি জয়েন করে তবে পালার একটি দিকে দারুণ স্ট্রং হতে পারে। মাখন কিন্তু খুব গরজ করলো না। পরে জানতে পারলাম আসল রহস্য। খোকা জাতিতে মুসলমান। নট্ট কোম্পানী গোবিন্দের দল বলে খোকাকে চাকরী দেওয়া কঠিন। চিৎপুরের সব দলে ছুৎমার্গ থাকলে খোকার চাকরী হওয়াই মুস্কিল ছিল। প্রোগ্রামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা, ওঁ পোড়ামাতৃকায়ৈ নমঃ, শ্রীশ্রীকালীমাতা সহায়, ওঁ নটনাথায় নমঃ—ইত্যাদি ছাপা হলেও এবং দলে ইষ্ট পুজোর ব্যবস্থা থাকলেও, সব দলে ছ্যুৎমার্গ নেই। সুতরাং খোকা বেকার নয়। বেঁটে গোলগাল দেখতে, মুখ চ্যাপ্টা মতন, চিবুক নরম, ভুরু মোটা, নাকের নীচে ছোটো গোঁফ, ডাগর দু'টি উজ্জ্বল চোখ এবং একমাথা কোঁকড়ানো চুল এক-নজরে খোকা মল্লিককে আকর্ষক করে তুলেছে।

নাট্যভারতীতে খোকা মল্লিকের দাপট যথেষ্ট, মালিকের প্রিয়ভাজন বলেই নয়, খোকা বিশ্বাসী, মালিকের দুর্দিনের সহযাত্রী, দল সংগঠক, অর্থ জোগানদার এবং নায়েক ভজানো ব্যক্তি। কিষাণবাবু ক্ষিপ্ত হ'লে তাঁকে ঠাণ্ডা করারও একমাত্র লোক খোকা মল্লিক। সুতরাং ক্রুদ্ধ, বিপর্যস্ত, ক্ষুব্ধ মালিকের পেছন পেছন সে এমনভাবে ঘুরে যাচ্ছে যে, দেখলে হাসি সংবরণ করাই কঠিন।

চা এলো, খাবারও। হঠাৎ ল্যাকপেকে শরীরটা আবার চেয়ারে সপে দিলেন কিষাণবাবু।

'গান কটায় ?'

'সাতটায়।' গরম চায়ের একটা গ্লাস ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ফুৎ ফুৎ করে পটাপট কয়েকটা চুমুক দিয়ে প্যাণ্টের পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে তার থাপে টোঁকা দিতে থাকলেন কিষাণ দাশগুপ্ত। মুখটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ব্যাপারখান বুজবার পারলেন ?'

'অনুমান করতে পারছি।'

'গাড়ি আচে, রুজের রুজ পাওনা দিতাচি ক্যাশ, তবু নি হালার পুতের মন পাই !'

'শরীর খারাপ হতে পারে।'

'থন মশয়। মায়ের গর্ভ থিক্যা পইড়াই যাত্রার ভাত প্যাটে পইড়া পাহাড় হইয়া গেচে গা, অসুখ হইবো ক্যান ?' টিপ ভর্তি নস্যি ফৎ ফৎ করে দু' নাকে টেনে নিয়ে মাসখানেকের অধৌত, নস্যি-কলঙ্কিত রুমাল বের করে নাক মুছলেন। 'কায়দা, বুজলেন না, হালার পুতে আমারে বেকায়দায় ফেলাইবার মতলব আটচে। আমারও নাম কিষাণ দাশগুপ্ত। অরে আমি পুলিশে দিমু, জেলে ভরুম, ঘানি টানাইয়া ছাড়ুম, কইলাম।'

'সে না হয় পরে হবে। এখন ? গান হবে ?'

'হইবো, গান হইবোই। গিধড়ডা মনে করচে কি, ছুট ফণি ছাড়া যাত্রা হইবো না—' সামনের পুরনো প্রায় নড়বড়ে টেবিলের ওপর জব্বর একখান ঘুষি মেরে কিষাণবাবু ডাকলেন, 'খুকা।'

কাছেই ছিল খোকা মল্লিক। ডাকের মাথায়ই হাজির।

'বাস ছাইড়্যা দ্যাও।'

'দিই কিষাণদা।'

'ধ্যাৎ' কিষাণ দাশগুপ্ত আবার ধমক দিলেন, 'কইলামডা কি তুমারে?' তাকালেন আমার দিকে, 'ছাখলেন নি; হালার ইডা মানুষ না গবা!'

শিল্পীদের নিয়ে বাস রওনা হলো। আগের দিন গান ছিলো বরাকরে। দল সোজা চাকদহে না গিয়ে বেলা এগারোটা নাগাদ পৌঁছেচে গদীতে। তারিখটা ছিল মাইনের। পাশের ঘরে হরিপদ বায়েন টাকা পয়সা নিয়ে রেডি। রান্না হয় নি। মাইনের সঙ্গে সকলেই খোরাকী পেয়েছেন। তাই নিয়ে কেউ গিয়েছিলেন পাইস হোটেলে, কেউ বা মুড়ি-তেলেভাজায় দ্বিপ্রাহরিক ভোজনপর্ব সমাধা করেছেন। তারপর মালিকের মেজাজ, চাকদহে যাত্রা।

আমরা যখন রওনা হোলাম, তখনও কপিলের গাড়ি ফিরে আসে নি। তাকে দ্বিতীয়বার পাঠানো হয়েছে। কপিল বিরক্ত হয়ে আবার গেছে। কিষাণবাবুর মুখ বর্ষার আকাশের মতো থমথমে। নীচে ভাড়া করা কার ছিলো। যতদূর মনে পড়ে আমার সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছেন সঙ্গীতবিদ গোপাল মল্লিক। ডানলপ-ব্রিজে তেল নিতে গাড়ি পাম্পে ঢুকলো, আমরা গেলাম চা-দোকানে।

ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে আমরা চাকদহ পৌঁছলাম। মাইকে সানাইয়ের সুর বাজছিলো। ছেঁড়া চটের প্যাণ্ডেলের চারদিকে করোগেট টিন দিয়ে ঘেরা। টিকিট ঘরের সামনে থোকা-থোকা লোক। গেটের কাছে চমৎকার একটি মেলার পরিবেশ। চা, তেলেভাজা, পাঁপড়, চানাচুর, মুড়ি, হালুইকর-এর দোকান বসেছে গ্যাসবাতি সামনে নিয়ে। গুঞ্জরণ, লোকজনের অনুচ্চ কোলাহল।

সাজঘরে পৌঁছে দেখি আর্টিস্টদের সাজবার আসর পড়েছে—ঠিক যেন নিমন্ত্রণ বাড়িতে মুখোমুখি দু'সারি পাত পেতে বসে খাওয়ার মতো সারি। পাতা আসনের সামনে একটি করে সবুজ রঙকরা তোবড়ানো টয়-বক্সের মতো মেক-আপ বক্স, সামনে একজোড়া করে জুতো, পাশে ওই সময়কার সাড়ে ছ-আনা দামের তোয়ালে। পোশাক বা মালপত্র নেবার বড়ো বাক্সের ওপরেও কিছু সরঞ্জামসহ আসন পাতা আছে। টপ-বক্সদের জন্য। এদিকে নাচপার্টির ছেলেরা সবেদা, সিঁদুর, কালি নিয়ে সাজতে শুরু করেছে। কয়েকটি বড় বাক্স দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় টাঙানো দড়িতে সারি সারি পোশাক ঝুলছে। ওটা বেশঘর। ওরই বাঁ-দিকে বিছানা পাতা আছে। ওখানে দল-ম্যানেজার রাজেন মণ্ডল খাতাটাতা বের করে দিব্যি অফিস সাজিয়ে বসে প্রোগ্রাম গুণছেন। দু'জন ছেলে এবং

জনাতিনেক প্রবীণ সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন প্রোগ্রাম গোনা। বাঁ-দিকে টানা পরদা দিয়ে আড়াল করা অংশটা মহিলা শিল্পীদের আলাদা সাজঘর। বড় শিল্পীদের কাউকে সাজঘরে দেখা গেলো না। একজন চাকর দেখলাম কেটলি হাতে বাইরে ছুটলো।

লকপক লকপক করে এসে কিষাণবাবু রাজেন মণ্ডলের পাশের বাক্সটার ওপরে ধপাস করে বসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কপালে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় কষিয়ে, রাজেনবাবুর উদ্দেশ্যে বললেন, 'হালায় আইবো না।' রাজেনবাবু যেমন প্রোগ্রাম গুণছিলেন, তেমনি গুণে যেতে লাগলেন। দু'টো বাক্সের ওপর চাদর পেতে দেওয়া হলো, আমরা সেখানে বসলাম। চা আসতে আসতে দেখি শ্রীমান খোকা মল্লিক একমুখ হাসি নিয়ে কিষাণবাবুর সামনে উপস্থিত। যেমনি আসা তেমনি কাজ। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন কিষাণবাবু এবং নিমেষের মধ্যে খোকার কাঁধে হাত রেখে প্রস্থান।

আসরে যন্ত্র গেলো সাতটায়। নাচপার্টি রেডি। পালার প্রথম দিকের শিল্পীরা একে একে বসে মেক-আপ সারলেন। নায়েকরা তাঁদের পাওনা প্রোগ্রাম নিয়ে গেলেন। রাজেনবাবু অতি বিনয়ের ভঙ্গিতে এসে বললেন, 'কাস্টিং-লিস্টটা তা হলে লিখে দিই দাদা।' আমি মাথা নামিয়ে সম্মতি জানালাম। কথা আসছিলো না মুখে। জানি ছোট ফণিবাবু না এলে নির্ঘাৎ একটা গোলমাল বাঁধবেই বাঁধবে। এমন কি ক্ষিপ্ত দর্শক প্যাণ্ডেলে আগুন পর্যন্ত লাগাতে পারে। তাই যদি হয়, তা হলে বাঁচবার উপায় কী, আমি ভাবছিলাম। তাকিয়ে দেখলাম কারও মুখে কোনো উদ্বেগ নেই। ঠিক মেসিনের মতো সব কাজ হয়ে যাচ্ছে। মনে হতেই পারে, ছোট ফণিবাবু এখন অন্ততঃ ওদের কাছে কোনো প্রবলেম নয়। গোপালবাবু নীচু গলায় বললেন, 'ভাববেন না, কিষাণদা ঠিক ম্যানেজ করে নেবে'খন।'

কী করে যে ম্যানেজ হতে পারে আমি কিছুতে ভেবে উঠতে পারছিলাম না।

ইতিমধ্যে ঘণ্টা পড়েছে দু'টো। সুরপার্টির বাজনদারেরা আসরে বসে গেছেন। রাজেনবাবু-কাস্টিং লিস্টটা লিখে দিয়ে গেলেন প্রোগ্রাম সহ। এবার আসরে যাওয়ার পালা। উঠবো, এমন সময় একমুখ হাসি নিয়ে কিষাণবাবুর প্রবেশ। সেই একই ধরনের হাঁটা, হাতটা ধরলেন, 'আসেন, বসাইয়া দিয়া আসি।'

দুরুদুরু বক্ষে প্যাণ্ডেলে গেলাম। আসরের ডান দিকটায় ছিল গেস্ট আর সিজন-

কার্ড হোল্ডারদের বসবার চেয়ার। সামনের সারির একটা চেয়ারে সালু বিছিয়ে দেওয়া হলো, আমি বসলাম। ততক্ষণে সর্পনৃত্য শুরু হয়ে গেছে। কিষাণবাবুর যাত্রা-কন্যা আরতি আর চিত্তশঙ্কর জুটি চড়া সুরের বাজনার সঙ্গে নাচটা জমিয়েছে। নাচ যতো এগুচ্ছে তত আতঙ্কিত হচ্ছি আমি। এরপরেই তো পালারম্ভ!

নাচের পর বৃন্দবাদন, ছোট ধরনের। মানে শর্ট কনসার্ট। তা থামলে কুশীলবদের বদলে আসরে এলেন কিষাণ দাশগুপ্ত। তার পরনে ঢিলেঢোলা ল্যাৎপেতে ফুলপ্যাণ্ট, গায়ে চাইনিজ শার্ট। সুরপার্টিতে বসা খোকা মল্লিকের কাঁধ থেকে ঝা করে গামছাটা নিয়ে মালার মতন গলায় পরলেন। মুখ কাঁচুমাচু। বললেন, 'মাননীয় যাত্রামুদীগণ, আইজ আমাগো যাত্রার বড়ই দুর্দিন। আমাগো ছুট ফণিবাবু…', একবার ঢোঁক গিললেন, চক্রাকারে ঘুরে এলেন আসর। করজোড়ে। 'আমাগো ছুট ফণিবাবু, কী কয়, শ্রীফণি মতিলাল আইজ বেলা একটায় আমাগো মায়া কাটাইয়া পরলোকে যাত্রা করচেন। তাঁর আত্মার সদ্গতির লাইগ্যা, আসেন, আমরা এক মিনিট নীরবতা পালন করি।' কথা শেষ করে কিষাণবাবু গামছার খুঁটে ঘনঘন চোখ মুছতে লাগলেন।

আমি স্তম্ভিত। ভেবেই পাচ্ছিলাম না, কেমন করে এটা হতে পারে! কপিলকে ছোট ফণিবাবু বলেই দিয়েছেন, আজ তিনি গানে জয়েন করবেন না। আবার কপিলকে পাঠানো হলো। আমরা কলকাতা থেকে রওনা হলাম বিকেল পাঁচটা নাগাদ। আবার ভাবলাম, মানুষের আয়ুর কথা কে আর বলতে পারে, কখন শেষ হবে! নীরবতা পালন শেষ হলো। কিষাণবাবু আসরে দাঁড়িয়েই কী ভেবে কে জানে, আমার বিভ্রান্ত অবস্থা দেখেই বুঝি ডান চোখটা ছোট করে ইশারায় কী যেন বলতে চাইলেন। সরাসরি আমি সাজঘরে গেলাম ছুটে। আমাকে দেখেই একমুখ হাসি হাসলেন কিষাণবাবু, 'কন দেখি কেমুন মুক্ষম দেওয়া দিচি হালার পুতরে।'

'মানে!'

'আরে না মশয়, না। অত সহজে মরণের পাত্র ছুটফণি না।'

তাহ'লে ব্যাপারটা কী! মিথ্যা ভাষণ? যাক তবু স্বস্তি।

আমি আসরে এসে বসলাম। কিষাণবাবু বসলেন আমার পাশের চেয়ারে। বললেন, ছোটফণিকে না মারতে পারলে নায়েক টাকা দেবে না, দর্শকরাও করবে গোলমাল, সুতরাং…

আর এক বিপদ দেখা দিলো খানিক পরেই। আসরে তখন প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে। একজন চাকর পড়িমরি করে ছুটে এসে কিষাণবাবুর কানে-কানে কী যেন বললো! নিমেষে কিষাণ দাশগুপ্তর সারা মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। চোখ দু'টো অস্বাভাবিক বিস্ফারিত। অনেকটা আর্তনাদের মতন বলে উঠলেন, 'কস্ কি, আইয়া গেচে!'

চাকরটা ঘাড় নামিয়ে সম্মতি জানালো।

দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ শুনতে পেলাম। আমার কানের কাছে মুখটা ধাঁ করে সরিয়ে এনে খুব চাপা অথচ অসহায়ের গলায় কিষাণ দাশগুপ্ত বললেন, 'কন তো এহন করি কী? হালার পুতে নাকি আইয়া পড়চে!'

আমার গলায় উৎসাহ, 'কে এলো, ছোট ফণিবাবু?'

'আবার আইবো কুন গিধরে…', কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বজ্রের গতিতে ভদ্রলোক দে ছুট সাজঘরের দিকে।

আমি তখন অন্য আতঙ্কে আতঙ্কিত। কী হবে এখন! কেমন করে, কোন উপায়ে দর্শক-নায়েকদের সামাল দেবেন কিষাণবাবু!

হঠাৎ দেখি অভিনয় বন্ধ করে আসর থেকে আর্টিস্টরা সাজঘরের দিকে প্রস্থান করলো। শিল্পীর বদলে আসরে প্রবেশ করলেন কিষাণ দাশগুপ্ত। আবার খোকা মল্লিকের কাঁধ থেকে ধা করে গামছাটা কেড়ে নিয়ে মালার মতন গলায় পরলেন। হাত জোড় করে বললেন, 'মাননীয় যাত্রামুদী বন্ধুরা…', দর্শকরা এ-দিকে চিৎকার চেঁচামেচি করতে শুরু করেছে ততক্ষণে। কিষাণবাবু ওরই মধ্যে বিভ্রান্তের মতো ঘুরে ঘুরে দর্শকদের থামাতে চেষ্টা করলেন। দর্শকরা শান্ত হলেন অল্পক্ষণ পরে। কিষাণবাবু আবার করজোড়ে নিবেদন করলেন, 'মাননীয় যাত্রামুদী বন্ধুরা, একডা আনন্দের খবর কই। ছুটফণিবাবু মারা যান নাই, বাইচ্যা আচেন। আইয়া গেচেন। আমার ম্যানেজার হালায় আমারে ভুগা দিচিলো। হ্যার ব্যবস্থা আমি করুম, আপনেরা এহন আনন্দ কইরা যাত্রা দেইখ্যা যান।'

মণ্ডপে গুঞ্জরণ উঠলো।

চি-চ/১৭

দুই.

সনটা বোধ হয় উনিশ শো চৌষট্টি, মাসটা মাঘ। তারিখ প্রথম সপ্তাহ। বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ ফোন ধরে বুঝলাম, গৌরদা ও-দিকে। গৌর দাস, সত্যম্বর অপেরার মালিক। 'কে, প্রবোধ?' বললাম 'হ্যাঁ'। গৌরদা বললেন, 'চট করে একবার গদীতে চলে এসো।' বললাম, 'একটা জরুরী লেখায় হাত দিয়েছি, অফিস থেকে এখন বেরুনো মুস্কিল।' গৌরদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় গালমন্দের একটা শব্দ ব্যবহার করে বললেন, 'জানি, কাজ করে তুমি উল্টে দিচ্ছ।' আবার সেই বিশেষ শব্দের ব্যবহার, 'একবার না এলেই চলবে না।' জানতাম আবার কিছু বলা মানেই, গৌরদার মুখের খিস্তি শোনা। ইচ্ছা করে নয়, ওটা ছিল বলার বাতিক। প্রায় প্রত্যেকটা বাক্যের সঙ্গে ওই কথাটা ব্যবহার করতে পারলেই যেন গৌরদার শান্তি। বুঝতেন না একাধিক অশালীন কথা বারংবার তিনি ব্যবহার করে যাচ্ছেন।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

আমার কন্যার অন্নপ্রাশন। একটা গোটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি বরানগরে। ইউনিভার্সাল ডেকরেটার্স-এর অমর শেঠ, যে শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রথম উৎসবে প্যাণ্ডেল করেছিলো, বাড়িটি তারই। ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। এক পাশে বসেছে ভিয়েন, বাকিটুকু নিমন্ত্রিতদের খাওয়া খাওয়ার জন্য টেবিল চেয়ারে ভর্তি। বাড়ির দ্বিতলের পাঁচখানা ঘর জুড়ে আত্মীয় স্বজন। একতলা অভ্যর্থনার জন্য ব্যবহৃত। ওখানে অতিথিরা সমাগত। সন্ধ্যা হয়েছে, প্রথম ব্যাচের খাওয়া খাওয়ার পাট সমাপ্ত। দ্বিতীয় ব্যাচ বসবে, এমন সময় জগন্নাথ ছুটে এসে বললো, 'গৌর দাস মশাই এইমাত্র এলেন ট্যাকসি করে।'

গৌর দাসের একমাত্র জামাই, আমার একান্ত বন্ধু ও শুভাকাঙ্খী শৈলেন মোহান্ত ওপরে তদারকি করছে। ওঁ আমাকে নীচে যেতে বললো।

দৌড়ে আমি নীচে এলাম। অভ্যর্থনা-কক্ষে স্থানাভাব। রাস্তায় এসে দেখি ট্যাক্সির ক্যারিয়ার থেকে গৌরদা একটা পেটমোটা চটের থলে নামাচ্ছেন। বললাম, 'আপনাকে তো নিমন্ত্রণ করি নি গৌরদা।'

গৌরদা যথারীতি সেই কুবাক্য দিয়ে কথাটা শুরু করলেন, 'কর নি তো কর নি, তাই বলে আমার নাতনীর অন্নপ্রাশনে আমি আসবো না…?' চট করে ওঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'এখানে অনেক বিখ্যাত লোকেরা রয়েছেন।' শুনে মুখটা বেঁকিয়ে ফেললেন, আবার কটু শব্দের ব্যবহার, 'রয়েছে তো (অমুক) রয়েছে, আমার কী। আমি কি (অমুক) ওদের সামনে কিছু খারাপ কথা বলছি?' গৌরদার কথায় তাঁরা লজ্জা পেয়ে সরে গেলেন। পরে একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক গৌরদার পরিচয় জানতে চাইলে, আমি পরিচয় দিলাম। তিনি বললেন, 'আজকের যুগে এতো সরল মানুষ পাওয়াই কঠিন।'

ফোন পেয়ে যেতেই হলো। একটা ট্যাক্সি নিলাম। মিনিট পনেরোর মধ্যে সত্যম্বর অপেরা। চিৎপুর ট্রাম-লাইন থেকে একজন চলাফেরা করার মতন সরু একফালি গলি দিয়ে থেমেছে শিসকো প্রিণ্টার্স কাম নিউ প্রভাস অপেরার গদীতে। অত দূর না গিয়ে ডানদিকে গেট, তারপর সিঁড়ি। ওপরে, দ্বিতলে সত্যম্বর অপেরার গদী। ভেবেই নিয়েছিলাম, হয় কোনো বিপদ, নয়তো সংকট। তাড়াতাড়ি করে সিঁড়ি ভেঙে দরজায় ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। গৌর দাসের গলা শোনা যাচ্ছিলো। চড়া গলায় কাঁচা খিস্তি করছেন। কাকে জানি না। এমন খিস্তি যে, বেশিক্ষণ শোনাই কঠিন। ভেতরে ঢুকে দেখি গৌরদা যথারীতি তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসে গলাবাজি করে যাচ্ছেন। মাঝে বেশ বড় একটা টেবিল। ও-পাশের তক্তপোষে হরিপদ বায়েন মাথা নীচু করে বসে আছে। তবে কি আজকের ঝালটা হরিপদর ওপর! ভুল বুঝতে পারলাম। দেখি দরজার কোণের দিকের অল্প ছায়ায় করজোড়ে, ঘাড় কাৎ করে অক্লেশে গৌর দাসের কথা-বুলেটের গুলিগুলো অম্লান-বদনে হজম করে যাচ্ছে রাম ঠাকুর। কথাগুলো কলমে লেখা যাবে না, তবে অর্থ করলে এই দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক মানুষের উচিত সন্তান জন্ম দেওয়ার আগে

অজাতক সেই সন্তানের বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত যাবতীয় খরচ জমা রেখে তবে কাজে নামা। সত্যম্বর অপেরার মালিক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে সেই কথাটাই বলে যাচ্ছেন। এবং জানাচ্ছিলেন যে, টাকা গাছে ফলে না, চাষ করে ঘরে তোলা যায় না, বারিধারার মতন আকাশ ফুঁড়েও মাটিতে পড়ে না। সুতরাং রাম ঠাকুরের জানা উচিত যে, টাকা তিনি পাচ্ছেন না। কিছুতেই পাবেন না। হাতে টাকা নেই। থাকলেও গৌর দাস অন্ততঃ তা রাম ঠাকুরের হাতে তুলে দিয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারেন না।

বেঁটে খাটো, একমাথা শাদা চুল, টকটকে ফর্সা রঙ, গায়ে সাদা ফতুয়া, পরনে খাটো ধুতি, পায়ে কমদামী চটি, নীচের ওষ্ঠ পানের রঙে লালাভ। বকতে বকতে চোখ দু'টোও রক্ত জবার মতন হয়েছে। আমাকে দেখেই আক্রোশে চড়া সুরে আক্রমণ করলেন, 'এই যে এসে গেছ।' এমনভাবে বললেন, যেন রাম ঠাকুরকে আমিই টাকা চাইতে উস্কে দিয়েছি। উঠে দাঁড়ালেন গৌরদা, 'তুমি, তুমিই সর্বনাশটা করেছো। আমাদের গাঁট ফাঁক করে বিজ্ঞাপনের টাকা নিয়ে নিয়ে, কাগজে যাত্রা যাত্রা বলে ফলাও করে লিখে দু' পাঁচটা টাকা বেশি পাইয়ে দিয়ে এদের সব মাথায় তুলেছ। এই রামঠাকুরকে।'

বললাম, 'হয়েছেটা কী?'

'যা হবার।' গৌর দাস আবার চেয়ারে বসলেন, 'শালারা আমার টাকা দেখেছে। টাকার গন্ধ পেয়েছে। চুষে চুষে খাচ্ছে। আবার বলে, আমার আপন জন। আপন জন না, (অমুক) শত্রু। দলটাকে আমার পথে বসিয়ে তবে ছাড়বে।'

'আজেবাজে বকছেন কেন?' আমি একটু গলা চড়াই। 'হয়েছে কী বলবেন তো?'

চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। নিঃশব্দে আঙুল বাড়িয়ে হরিপদকে দেখিয়ে দিয়ে ব্যাজার মুখে গুটিগুটি পায়ে নীচে নেমে গেলেন। যাওয়ার সময় দেখলাম ওঁর ট্যাকটা ফতুয়ার তলায় উঁচু হয়ে আছে।

গৌরদা চলে যেতে আমি আর হরিপদ একসঙ্গে হেসে উঠলাম। রাম ঠাকুরও সেই হাসিতে যোগ দিল। বললো, 'যেমন বাঘা ওল, তেমনি টক তেঁতুল। আমাদের বাবু কেবল আপনার কাছেই জব্দ।'

হরিপদ ঘটনাটা খুলে বললো আমাকে। সংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায় যে, কিছু টাকা

রাম ঠাকুর তার ভাইয়ের ছেলের বিয়ের জন্য ঋণ চেয়েছে। তারই প্রতিক্রিয়া এই।

বললাম, 'কতো টাকা?'

'তিন হাজার।' রাম বললো।

পরিমাণটা কিছু বেশিই। অন্ততঃ গৌর দাসের কাছে। যদি রাম ঠাকুর এক হাজার এক হাজার করে তিনবারে টাকাটা নিতো, তাহ'লে একেবারেই বাক্যবান সহ্য করতে হতো না, তা নয়, কিন্তু এমন সব মারাত্মক শরাঘাত নিশ্চয় হজম করতে হতো না। এক একটা টাকা গৌর দাসের এক একটা পাঁজর। তাঁর কাছে একসঙ্গে তিন হাজার টাকা ধার চাওয়া রীতিমতো অন্যায়।

রাম ঠাকুরকে আমি নীচে যেতে বললাম। 'এই চাওয়াটা কি আকস্মিক?' জবাবে হরিপদ বললো, 'আসলে দিন-কয়েক আগেই রাম ঠাকুর টাকাটা চেয়েছিলো। কর্তা আজই ওকে আসতে বলেছেন। এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই এই তুলকালাম কাণ্ড। এক ঘণ্টা ধরে বাক্য-বর্ষণ চলছে।'

বললাম, 'তা হলে ঠিক আছে।'

হরিপদ শুধলো, 'কী ঠিক আছে?'

বললাম, 'রাম ঠাকুর টাকা পেয়ে যাবে।'

হরিপদ বললো, 'ঠিক ধরেছেন। কিন্তু কী ভাবে যে দেবে, তাই ভেবে পাচ্ছি না।'

রামঠাকুর চলে গিয়েছিলো। আমার চা এলো। চা খাচ্ছি। এমন সময় চৌকাটে দাঁড়িয়ে ইশারায় আমাকে ডাকলেন গৌরদা। কাছে এলে ফিসফিস করে বললেন, 'ওটা দিয়ে দি, কী বলো?' বললাম, 'দিন।'—ব্যাস, মুখে পান, হাতে বেশ লম্বা পানের বোঁটার মাথায় এক খাবলা চুন। চুপচাপ এসে বসলেন চেয়ারে। নীরব! নির্বিকার। বললেন, 'শুনেছো সব?' 'কিছু কিছু,' আমি বললাম। রেগে বললেন, 'ন্যাকামি করো না।'

ঘটনাটা ঘটলো তক্ষুণি। গায়ের ফতুয়া তুলে ট্যাঁক থেকে রোল-করা কিছু একশো টাকার নোট বের করলেন গৌরদা। চারপাশ দেখে নিয়ে মুঠো ভর্তি টাকাগুলো গুঁজে দিলেন হরিপদর হাতে, 'আমি তোকে ধার আনতে বলবো। তুই নীচে গিয়ে ফিরে এসে বলবি, তিন পারসেন্টে কিছু টাকা পাওয়া গেছে, বুঝলি?' হরিপদ মাথা নেড়ে সায় জানালো।

গৌরদা বললেন, 'ডাক রামকে।'

রাম এলো। আগের মতোই বিনীত ভঙ্গি। দু' হাত জোড়-করা। ওকে দেখেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন গৌর দাস, 'এই যে আমার রামহরি, আমার⋯অমুক। এসো।' তারপরই সুর নরম। 'হ্যাঁরে রাম, আমাকে ধনেপ্রাণে মেরে তোর লাভটা কী?' আবার আগুন, 'চক্রান্ত, সব চক্রান্ত। শালারা আমাকে মেরে ফেলবে, ফতুর বানাবে, দলটাকে তুলে দিয়ে আমাকে ফুটপাতে দাঁড় করাবে⋯' বলতে বলতে উঠলেন, বারান্দার দিকে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালেন। 'হ্যাঁরে হরিপদ, যাতো একবার, দেখতো ধার টার কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

পূর্ব নির্দেশ মতো হরিপদ উঠলো। নীচে গেলো। আমাকে আবার আক্রমণ করলেন গৌর দাস, 'তোমরা তো ভাবো যাত্রার দলের মালিকরা পয়সার এক একটি গাছ। দেখলে তো ধার করে আনতে হচ্ছে টাকাটা।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'সত্যি!'

'বলো, বলো, ওই অপোগণ্ড, অপদার্থ, বাঁদরটাকে বলো। চিনির বলদ। সারাটা জীবন বয়েই মরলো, স্বাদ পেলো না। পাবিই না যদি তবে জন্মানো কেন! না, উনি সাক্ষাৎ বিবেকানন্দ!'

হরিপদ এলো; মুখ কাঁচুমাচু। বললো, 'কর্তা, বাজার বড় আক্কাড়া. ক্যাশে কারও তেমন টাকা পয়সা নেই।' 'বলিস কী রে,' গৌরদা হতাশ হবার ভাণ করেন। হরিপদ তক্তপোষে বসে। গৌরদা বলেন, 'যাতো ভাই, একবার তপেশের কাছে যা, আমার নাম করে বলবি, যা সুদ চায় দেবো।'

তারপরের ঘটনা মাত্র কয়েক মিনিটের। হরিপদ গদী থেকে নামলো কি তপেশকে পেয়ে গেলো, এবং তপেশ মুনিঋষির মতো আগে থেকেই জানতে পেরেছিলো বলে তিরিশখানা একশো টাকার নোট রোল করে রেখেছিলো, যা হরিপদ যাওয়ামাত্র তার হাতে তুলে দিলো। হরিপদও ট্যাঁকে গুঁজে উড়ে এলো এখন। মিনিট তিনেকের মধ্যে সবগুলো কাজ শেষ। হরিপদ ট্যাঁক থেকে রোল করা টাকা গৌর দাসের সামনের টেবিলের ওপর রেখে বললো, 'পাঁচের নীচে দিতেই চায় না। আপনার কথা বলে তিনে আনলাম। সময় কিন্তু একমাস।'

গৌর দাস মশাই বাঁ-হাতের মুঠোয় টাকাটা নিয়ে আবার মেজাজ করে উঠলেন রাম ঠাকুরের ওপর, 'প্যাঁচার মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন? নাও, মাছেমাংসে খেয়ে সাবাড় করো। পরের টাকা ফালতু পাওয়া পরের মাগ নয়, মনে রেখো।'

টাকাটা তুলে দিলেন রাম ঠাকুরের হাতে, 'বন্ধু না শত্তুর। শালা আর কোনোদিন বন্ধু বলে পরিচয় দিস নি।' কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে লাগলেন গৌর দাস। 'রাম না, শালা বিভীষণ।' বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

জানতাম গৌর দাসের দৌড় কতদুর। আনন্দ, অস্বস্তি, উত্তেজনা বা রাগ যাই হোক না কেন, গৌরদা তা লুকোবার জন্য টুকটুক করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চিৎপুর-নিমতলা ঘাট স্ট্রীট জংশনের পানের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন। কথাটি বলবেন না। দোকানী যথারীতি পরিপাটি করে এক খিলি পান সেজে তুলে দেবে গৌর দাসের হাতে। আর লম্বা পানের বোঁটার মাথায় একদলা চুন। সেই বোঁটাটা গোলাপ ফুল ধরার মতো করে ধরে গৌর দা টুকটুক করে আবার গদীতে এসে তাঁর পুরনো চেয়ারটাতে চুপচাপ বসবেন। দোকানী দাম চাইবে না, গৌর দাসও দেবেন না।

সে দোকানী এখন আর নেই চিৎপুর মোড়ে।



'আমি আর দল করবো না।' একদিন গদীতে বসে গৌর দাস বলছিলেন আমাকে। ডেকেছিলেন, পরের বছর কী পালা লেখাবেন তাই নিয়ে আলোচনা করতে। গদীতে কেউ ছিলো না। হঠাৎ গৌরদা তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ব্যাপার কী? না, শিল্পীর বাজার দর বাড়ছে, পাবলিসিটির টাকা বাড়ছে ঘনঘন। আগে এ-সবের বালাই ছিলো না। শস্তার বাজারে যাত্রার ব্যবসায়ে দু' চার পয়সা থাকতো। এখন সে গুড়ে বালি।

আমি উঠে পড়লাম। গৌরদা অবাক হলেন। 'উঠছো যে বড়ো!'

বললাম, 'দলই যখন করবেন না, তখন সময় নষ্ট করে কী লাভ।'

জিভে চুকচুক শব্দ করলেন গৌর দাস। বললেন; 'কেনায় যদি জিততে না পারো, বেচায় বেলায় ঠকতে হবে—বলতেন আমার গুরু সত্যম্বর চাটুজ্জে। আমি এখন

তাঁরই ওপর বসে আছি। আর্টিস্ট ফার্টিস্ট সে দেখা যাবেখন। বাজারে কী খাবে এখন বলো তো ?'

কথায় কথায় গৌরদা তাঁর জীবন-কাহিনীও বলতে শুরু করলেন। সত্যম্বর চাটুজ্জে মশাইয়ের দলে কোন শিশুকালে তিনি সখী হিসেবে জয়েন করেছিলেন অনাথা মায়ের দুঃখ লাঘবের জন্যে। কেমন করে শিশু সখী গৌর দাস ক্রমে দলের পুরোভাগে এলেন এবং কেমন করে হলেন দলের মালিক। গৌরদা বলেন: নিষ্ঠা, তিতিক্ষা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা এবং কষ্ট সহিষ্ণুতাই কেবল মানুষকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে।

কথা প্রসঙ্গেই গৌরদার একমাত্র কন্যার স্বামী শৈলেন মোহান্তর প্রসঙ্গ এলো। শৈলেন চাকরী করতেন রেলে। ইউ ডি ক্লার্ক। থাকেন হ্যারিসন রোডের একটা মেস-কাম-হোটেলে। সময় পেলেই চলে আসে শ্বশুরের গদীতে। প্রায়শ বচসা বাঁধে শ্বশুরের সঙ্গে। বাম রাজনীতি করা যুবক, প্রচলিত পদ্ধতির এস্টাব্লিসমেণ্ট তার পছন্দ নয়। পছন্দ নয় মামুলী একঘেয়ে বিষয়ের যাত্রাও। সে চায় যাত্রা প্রগতিশীল হোক। মেহনতী জনতার কথা আসুক যাত্রায়, নিম্ন আর মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে লেখা হোক পালা এবং যাত্রার প্রথাগত ব্যবসায় রীতিতে আসুক নব্যরীতি, নতুন ভাবনা। এ-নিয়েই অতীতে বর্তমানে লড়াই।

জামাই জেদি, একগুঁয়ে, শিক্ষিত, তার্কিক এবং রাজনীতিজ্ঞ। শ্বশুর অতীতের প্রতীক, এডুকেশন্যাল কোয়ালিফিকেশন বলতে কিছু নেই, মনের দিক থেকে নরম, কম্প্রোমাইজিং, ঠাণ্ডা মেজাজ এবং ট্রেডিশন ও সংস্কারে বিশ্বাসী ; রাজনীতির ধারই ধারেন না কিন্তু ব্যবসায়-বুদ্ধিতে বড়ই পাকা।

শৈলেন মোহান্তর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের।

১৯৫৯ সনে আমি যখন আনন্দবাজার পত্রিকায় 'আনন্দলোক' বিভাগের ভার নিই, ওই সময়ে আমার সহকর্মী এবং কল্যাণকামী জ্যোতির্ময় বসু রায় পরিচয় করিয়ে দেন শৈলেনের সঙ্গে। তার আগেই অবশ্য চিৎপুর নিয়ে আমি লেখার কাজ শুরু করি। আগে আমি বলেছি যে, যাত্রা আমায় কেবল মুগ্ধ করতো না, রীতিমতো ভাবাতো। প্রকৃত ভারতীয় অভিনয় প্রকরণ হিসাবে যাত্রাই একদিন জগজ্জয়ী হবে, এটা আমি ভাবতাম। যাই হোক প্রথম আমি চিৎপুর যাত্রাপাড়ায় এলাম, শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্তকে সঙ্গে করে। আমি ঠিক করলাম চিৎপুর-চিত্র

আমি আঁকবো লেখায়, সুবোধ রেখায়। প্রথম রচনাটি প্রকাশিত হবার পর শৈলেন মোহান্ত খবর নিতে এসেছিলেন।

আর্য্য অপেরার গদীতে, অন্ধকার সিঁড়িপথে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম। গদীতে ছিলেন অতুলকৃষ্ণ বসুমল্লিক। তাঁর সাক্ষাৎকারই লিখেছিলাম। শৈলেনবাবুর আক্ষেপ ছিলো শুরুটা কেন তাঁর দলকে নিয়ে হলো না। ওই দিনই ঠিক হয়, আমি প্রথম যাত্রাভিনয় দেখবো 'সোনাই দীঘি।' দুর্গা সপ্তমীতে বাটানগর গেলাম যাত্রা শুনতে। সঙ্গে গেলেন সাহিত্যিক বন্ধু মতি নন্দী। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম যাত্রা-সমালোচনা বেরুলো চার কলম ছবি সহ। সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন। এই সূত্র ধরেই শৈলেন মোহান্তর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। বলতে গেলেন সে এখন আমার আত্মার আত্মীয়ও।

ফিরে আসি আবার গৌর দাসের কাছে। আগেই গৌরদার উক্তি থেকে বোঝা গেছে, রাম আসলে দলের রান্নার ঠাকুর হলেও, গৌর দাসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। সেই শিশু বয়সে। এক সঙ্গে দু'জনে সত্যম্বর চাটুজ্জের দলে যোগ দেন। বন্ধুত্ব তখন থেকেই।

গৌরদা চলে যেতে আমরা তিনজন একসঙ্গে হেসে উঠলাম। গোটা ঘটনাটা যেন সেই কাক-আচরণের মতো। অর্থাৎ কাক যখন কিছু লুকোয়, তখন সে নিজে চোখ দু'টি বুজে নেয়, মনে করে কেউ বুঝি দেখতে পেলো না। দেখলাম রাম কাঁদছে।

দিন তিনেক যেতে না যেতেই আবার এক ঘটনা। আবার ফোন। এবার গৌরদা নন, হরিপদ। 'ব্যাপার কী?' 'কর্তা আবার রেগে আগুন।' হরিপদর গলা বিমর্ষ বুঝতে পারলাম। 'শিগগীর আসুন দাদা।'

তক্ষুণি ছুট। গদীর সামনে নেমে দেখি, রাস্তার ওপর লোক জমে আছে। সকলেই যাত্রার লোক। আমি নামতে ভিড় কিছু এলোমেলো হয়ে এলো। তারপর আমি ঘেরাও হলাম। সকলেই বলছে, 'হরিপদর চাকরী গেল। দেখুন আপনি যদি বলে কয়ে কিছু সুরাহা করতে পারেন।'

ওপরে পরিত্রাহি গলায় চেঁচিয়ে যাচ্ছেন গৌর দাস। কান পাতলে বুঝি মিনারভা থিয়েটার থেকেও এই গলা শোনা যাবে। অতগুলো লোক কি মিথ্যে ভাষণ

করবে ? কেউ কেউ বলছিলো, হরিপদ নাকি পুকুর চুরি করে দেশে সাম্রাজ্য গড়ে ফেলেছে। স্নতরাং সত্যম্বর অপেরা থেকে তার ভাত ওঠাই উচিত।

কথাটা যে মিথ্যে বা অবিশ্বাসযোগ্য তা নয়। কিছুদিন থেকেই দেখছি হরিপদ বায়েন, যাত্রাশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক, তাঁর কায়েমী গদী সত্যম্বরের ঘরে কেমন মনমরা হয়ে বসে থাকে। 'সোনাই দীঘি' পালার অসম্ভব জনপ্রিয়তা এবং এভারেষ্ট-তুল্য ব্যবসায়ের পর বেশ কয়েকটা বছর যে মানুষটাকে সদা প্রফুল্ল দেখেছি, তা উধাও। একদিন শুধোলাম নিজেই। হরিপদ তক্ষুণি স্পষ্ট করে কিছু বললো না। কেবল জানালো, তাঁর বলার কথা আছে অনেক। সে কথাগুলো না বলা পর্যন্ত ওঁর স্বস্তি নেই। কাজেই খুব শিগগিরই হরিপদ আমার বাসায় আসবে।

কথা মতন এলোও। সকালের ঘুম ভাঙলে দেখি পায়ের কাছে গুম হয়ে বসে আছে। ধড়মড়িয়ে উঠলাম। প্রাতঃকালীন চা-পানের সঙ্গে কথা। আগে বাড়ির খবর; পরে কুশল জিজ্ঞাসা। কতো বয়েস হবে তখন হরিপদর ? উত্তর পঞ্চাশ। কিন্তু দেখে বোঝার উপায় ছিলো না। ফরসা রঙ, টানটান মসৃণ ত্বক, মাথার চুলও প্রবীণত্ব ঘোষণা করে নি। চেহারায় তখনও দীপ্তি। জোর গলায় কথা বলার স্বভাব ছিলো না। মিতভাষী হরিপদ বায়েনের মুখে সর্বদা মৃদু হাসির রেশ লেগেই থাকতো। কেউ যদি তিরস্কার করতো, কটু বাক্য বলতো, অপমান করতো সামনা সামনি অথবা হাত পা চালাতো, হরিপদর মুখ থেকে হাসিটুকু কখনও উবে যেতো না। সেই হরিপদর মুখ এখন বর্ষার আকাশ।

হরিপদ বায়েন ছিলো এককালের বিখ্যাত পুরুষ রানী। প্রবীন যাত্রামোদী যাঁরা, তাঁদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে হরিপদ রানীর অভিনয়। একবার মেয়ে সেজে আসরে এলে চোখের পলক ফেলতে ভুলে যেতো দর্শকরা। আর আসরে একবার উপস্থিত হলে ওঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে অনেক খয়ের খাঁ অভিনেতাই চিৎপাত হতো, এ-কথা বলেছেন ছোট ফণিবাবু। পঞ্চু সেন মশাই ছিলেন হরিপদর প্রিয়তম বন্ধু। প্রায় একই সময়ে যাত্রায় আসেন। পঞ্চুবাবু অতীতের হরিপদ রানী প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেছেন। বড় ফণিবাবু, ভোলা পাল মশাই, প্রভাত বোস, শশাঙ্ক ও পূর্ণেন্দু ব্যানারজি, সূর্যকুমার দত্ত, স্নরেন মুখারজি বলেছেন : হরিপদ রানীর ছিল জন্মগত প্রতিভা। যেমন গলা, তেমনি এ্যাকটিং। ডেলিভারীও অত্যাশ্চর্য। মুখ চোখের কাজেও হরিপদর তুল্য কোনো গুঁফোরানী ছিলো না যাত্রা-জগতে। আমি নিজেও হরিপদর দাপটে অভিনীত 'দ্রৌপদী' দেখেছি ছোটবেলায়।

হরিপদ সাত সাতবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলো। গভীর সংকটে পড়লেই আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষা তাকে পেয়ে বসতো। সব কটি ঘটনাই রোমহর্ষক। একবার হরিপদ খড়ের ঘরে বাঁশের আড়ায় দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়েছিল। ওমা বাঁশটাই মচাং করে ভেঙে পড়লো। মরা হলো না। আর একবার ভোর ভোর শেষ রাত্রে একটি গাঁব গাছের ডালে উঠে পরিপাটি করে ডাল আর গলায় দড়ি বেঁধে মারলো ঝাঁপ। সেবারেও মৃত্যু হলো না তার। কারণ ভোর ভোর সকালে ওই জঙ্গলে জনৈক ব্যক্তি গাড়ু হাতে প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে দেখে ফেলেন গোটা কর্মকাণ্ড। এবং তিনি এগিয়ে গিয়ে ঝুলন্ত হরিপদকে তুলে ধরেন। ভদ্রলোকের চিৎকারে গ্রামের মানুষরা ছুটে এসে ফাঁস কেটে হরিপদকে বাঁচিয়ে তোলে। আর একবার হরিপদ বেশ চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করলো, সে গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মরবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। নিশুতি রাত্রির শেষ যামে হরিপদ ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে। ও জানতো না, একজন মৎস শিকারী মধ্য রাত্রি থেকে জাল ফেলে কাহিল, হতাশ। হঠাৎ দেখলো জল উথল পাথাল খাচ্ছে। চোখ দু'টি জ্বলে উঠলো জেলের। সঙ্গে সঙ্গে খ্যাপলা জাল পড়লো। টানেও ভারী। পারে তুলে দেখে, ওমা, এ যে মানুষ! সঙ্গে সঙ্গে গলার কলসীর দড়ি কেটে লোকটি হরিপদর দেহকে মাথায় তুলে ঘুরপাক খেতে লাগলো। বেঁচে গেলো হরিপদ বায়েন সে যাত্রাতেও।

এমনি ছয়বার ব্যর্থ হবার পর, সপ্তমবারের পালা এলো। ভরপেট কারবাইড খেয়ে একদিন মৃত্যুকে ডেকে ডেকে যখন হয়রান, এমন সময় হরিপদ বুঝতে পারলো, কারবাইড দেহ থেকে প্রাণকে মুক্তি দেয় না।

গান হচ্ছিলো শ্রীরামপুরে। রেল-লাইনের কাছেই আসর। হরিপদ তখন রাজার দল রঞ্জন অপেরার ম্যানজার। চুরির দায় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই তাঁর কারবাইড খাওয়া। অভিযোগ সত্য হলে আত্মহত্যার প্রবণতা ভর করতো না। আশ্চর্য, মিথ্যে অভিযোগই বার বার তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। হরিপদ নিজেই সে-দিনের বিবরণ দিয়েছিলো।

'গান শুরু হবার পর কারবাইডের প্যাকেট নিয়ে মাঠে যাই। সঙ্গে এক গাড়ু জল। একটা বাঁশবনে গিয়ে মুঠো মুঠো কারবাইড জল দিয়ে গিলে ফিরে এলাম। বেশকারীর পাশে টাল করা ছিলো বাক্স। তার আড়ালে বিছানা করে রাখলাম। মৃত্যুশয্যা। খোরাকী জলপানির খাতা খুলে, হিসেব করে সকলের

জলপানির টাকা তুলে দিলাম নন্দর হাতে। তারপর বিছানা। মাথা ঘুরছিলো অল্প অল্প। ভাবলাম, শুলেই কালঘুমে ঘুমিয়ে পড়বো। কিন্তু ঘুম এলো না। সারা গায়ে অসম্ভব জ্বালা। লোমকূপ দিয়ে আগুনের আঁচ বেরোচ্ছে। বিছানায় ছটফট করতে করতে উঠলাম। তখন তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য চলছে আসরে। গান ভাঙলে ধরা পড়তেই হবে। ডাক্তার আসবে, বাঁচাবে। সুতরাং হে করুণাময় কানু, উপায় করো, বুদ্ধি জোগাও, মুক্তির রথ নামিয়ে দাও।

'কানু বুদ্ধি দিলেন তৎক্ষণাৎ। দূর থেকে ভেসে আসা রেলগাড়ির হুইসেলের শব্দ কানে এলো। চমকে উঠলাম। এইতো...এইতো পেয়েছি পথ। সাজ-ঘর থেকে পনেরো সেকেণ্ডের ব্যবধানেই আছে চির মুক্তির খোলা দুয়ার। টলতে টলতে উঠতে গিয়ে মনে পড়লো, চিঠি টিঠি লিখে না গেলে দলের ওপর হামলা করবে পুলিশ। তাই ওই জ্বলুনির ঘোরে চিরকুট লিখলাম। কী লিখেছিলাম জানি না। তবে লিখবার ইচ্ছা ছিলো: আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। লেখাটা শেষ হলো কিনা মনে নেই, দু' চাখ ছাপিয়ে জলের বন্যা এলো। প্রাণের প্রতি মায়া। এ-পৃথিবী যতই দৈন্যের অন্ধকারে ঢাকা থাক, যতই কষ্টকর হোক না কেন, এর মধ্যেই তো কখনও সখনও আলো দেখান পরম করুণাময় কানু। তবে এই ভয়াবহ মৃত্যু কেন?

'আস্তিনে চোখের জল মুছে নিয়ে শক্ত হোলাম। মরতে আমাকে হবেই। রাজার লোক এসে গেছে দলে। আজকের গানের পর দল বন্ধ করে দিয়ে আমাকে নিয়ে যাবে রাজবাড়ি। তারপর যা হবে তা যে কী ভীষণ, কী ভয়ানক তা আমার জানা ছিলো। মৃত্যু বরং তার চাইতে অনেক কম যন্ত্রণার, স্বস্তির। সুতরাং টলতে টলতে এগোলাম। সাজঘরের চট ফাঁক করে দেখি, একটা আলোর গোলক ছুটে আসছে এ-দিকেই। উজ্জ্বল, দীপ্ত, তীব্র। এই গোলকই আমাকে মহাজীবনের আলোর জগতের ঠিকানা এনে দেবে। আলো.. আলো...আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওই আলো ছুঁতে এগিয়ে যাচ্ছি, নাকি আলোটাই আমাকে তীব্র টানে টানছে জানি না।...কানু, আমায় নাও; প্রেমের কানু, ঠাঁই দাও তোমার চরণে, তোমার বাঁশীর সুর শুনতে পারছি মুরলীধর—বাজাও.. বাজাও—আরও জোরে আরও তীব্রস্বরে, বেসুর স্বরে অন্ধ করে দাও জগৎ। তারপর বেসুর সুর থামলো। চাকার শব্দ। ত্রিভুবন দলিত মথিত করে চক্রধারীর রথ আসছে ছুটে। আলো—চোখ ধাঁধানো আগুন। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম কানু বলে।'.

হরিপদ সেবারও কাস্থর কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ভেবেছিলো তার মৃত্যু হয়েছে। তিনদিন পর জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখলো, হেতমপুর রাজবাড়ি। মাথার কাছে ডাক্তার। পাশে একটা চেয়ারে বসে আছেন স্বয়ং বাবু। তাঁর হাতে গড়গড়ার নল। হরিপদ চোখ মেলতেই তিনি ভুরুক টান দিতে ভুলে গেলেন। হাতের নলটা রাখলেন পাশে।

হরিপদ বায়েনের আত্মহত্যার প্রবণতা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিলো। অষ্টমবারের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু সে অনেকদিন পরের কথা।

সাত সকালে হরিপদ তার দুঃখের গাওনা গাইলো। সে একটি কমিশন এজেন্সী খুলেছে, নাম : প্রমোদ প্রতিষ্ঠান। নায়েকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন যাত্রাদল বায়না করে কমিশন খাওয়াই এ-প্রতিষ্ঠানের কাজে। সত্যম্বর অপেরায় বসে দালালী করতে আপত্তি জানিয়েছেন শৈলেন মোহান্ত। এ-নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয়েছে অনেক। জামাই সাফসুফ বলেই দিয়েছে, হরিপদ যেন যে-কোনো একটি পথ বেছে নেয়।



নীচ থেকে গৌরদার হুঙ্কার তখনও শুনতে পাচ্ছিলাম। চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন। খিস্তির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। পা পা করে ওপরে উঠলাম। দ্বিতীয় দরজা পেরোতেই দেখি, গৌরদা টেলিফোনের রিসিভারটা প্রাণপণে চেপে ধরে রয়েছেন কানে, পাছে ও-পাশের কথা ফাঁকফুঁক পেয়ে না বেরিয়ে যায়, আর চিলের চেয়ে চড়া গলায় গগন ফাটানো চিৎকার করছেন যেন ও-পক্ষ একটি কথাও মিস না করে। 'গলায় কী ক্যান্সার হয়েছে (অমুক) যে চেঁচাতে পারছো না? কী বললে? অ্যাঁ। বসতি? শালারা আমার দলটাকে তুলে দেবে। সুবলা কোথায়?

বসে বসে বুঝি শালা আখের গোছাচ্ছে। (অমুক) আখের আমি বার করবো। বুড়ো শালিখের বাচ্চা শালাকে ডেকে দে…।'

ও-পাশে বোধ হয় টেলিফোন-ধরা লোকটি রিসিভার নামিয়ে গৌরদার সুবলাকে ডাকতে গেল। সুবল অধিকারী, বহুদিনের পুরনো দল-ম্যানেজার, গৌরদার দলে অর্থাৎ সত্যম্বর অপেরায় আছেনও দীর্ঘকাল।

ও-দিকের রিসিভার নামিয়ে রাখলে কী হবে, এ-দিকে গৌরদা আরও জোরে, হাতের শিরা তুলে প্রাণপণে রিসিভারটা কানের ওপর চেপে রেখেছেন। আমাকে বসতে বললেন ইশারায়। রিসিভারসুদ্ধ মাথাটা ঘুরিয়ে আমাকে বললেন, 'মাথাভাঙ্গার ফোন।' বোধ হয় তক্ষুণি ওদিকে সুবল অধিকারী টেলিফোন ধরে থাকবেন, সুতরাং আবার কথার ঝড। মাঝে টেলিফোন অফিস থেকে টাইম ওভারের নোটিশ দেওয়া হয়ে থাকবে, গৌরদা একটা খিস্তি করে টাইম এক্সটেনশন করতে বললেন।

ঝড় যখন থামলো, গৌর দাস মশাই তখন রীতিমতো হাঁপাচ্ছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের চেয়ারটাতে বসে একটু দম নিলেন। বিড়বিড় করলেন খানিক বিরস বদনে। তারপর ধরলেন হরিপদকে। 'তাঁতি শালা, রাস্তায় না মরছিলি? আমার ঘাট হয়েছে তোকে চাকরী দিয়ে। সারাজীবন মাদুর আর মিশ্রীর সরবৎ বয়ে মরতিস। আমি না তোকে ম্যানেজার করেছি? এখন আমার বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে শালা আমারই দাঁড়ি ওপড়াচ্ছিস। হারামী। তোর ভালো হবে কোনোদিন? তোকে শাপমুন্নি করছি আমি…'

অগত্যা ছোট একটি ধমক দিতেই হলো। গৌরদার রাগের আগুন নেভাতে এটা দরকার। 'চুপ করবেন? অযথা শাপমুন্নি দিচ্ছেন কেন গোবেচারাকে!'

ফৎ করে কেঁদে ফেললেন গৌরদা। ধুতির খোঁটে ঘনঘন চোখ মুছতে লাগলেন। 'হরিপদ শালা গোবেচারী! শালা সাপ, সাপ। দুধ দিয়ে আমি কালসাপ পুষেছি প্রবোধ। এখন শালা আমাকে খুবলাচ্ছে। বিষে জরজর হয়ে গেছি। আবার দাঁত বার করে হাসছে দেখ শালা। হারামীকে সেই তখন থেকে তেল দিয়ে যাচ্ছি: চ-চ-চ দেখি; আমার কথা কি কানে নেয় শালা।'

বললাম, 'যেতেটা হবে কোথায়?'

'আমার শ্মশানে, আবার কোথায়?' হরিপদর দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন গৌরদা। পরে সুর নরম, রাগ গলে একেবারেই জল, 'বিয়েশাদি বলে কথা,

কতো রকমের ঝামেলা হতে পারে। তাই বলছি চ হরিপদ, আমার সঙ্গে একবার চ। রামটা তো চিরকালের বোকা, লোকে ঠকিয়ে টকিয়ে নেবে। তারপর যদি টাকা পয়সার টান পড়ে তো বেচারী জীয়স্ত মরবে। তাই হাজার দু'য়েক টাকা এনেছি সঙ্গে করে। বিদেশ বিভূঁইয়ের পথ, অতগুলো টাকা নিয়ে একলা যাওয়া যায় না। তাই বলছি, চ ভাই হরিপদ, একটিবার আয় আমার সঙ্গে। মারানীর পুতে নি কথা শোনে। টাকা পয়সায় অভাবে রামটা যদি বিপদে পড়ে তো দুর্নামটা হবে কার? লোকে বলবে গৌর দাসের চাকরী করে তোমার এই হাল?'

আমার দু'চোখের পাতা ভিজে এলো।

গৌরদা উঠলেন। টুকটুক করে নেমে গেলেন নীচে।

হরিপদ নিশ্চুপ।

গোটা গদী ঘরটা অনেকক্ষণ শবদেহের মতো হয়ে থাকলো। একটু পরে দেখি এক বাক্স সন্দেশ আর চা নিয়ে বিপিন হাজির, 'কর্তা আপনাকে খেতে বললো।'

তাকিয়ে দেখি হরিপদ হাসছে।

বললাম, 'যান না গৌরদার সঙ্গে।'

হরিপদ বললো, 'যেতে আপত্তি কি বলুন। আসলে রাতের দিকে দু'জন নায়েক আসবে মালদা থেকে। ট্রাঙ্কে কথা হয়েছে। দলটাকে ফেরার পথে গান দিতে হবে না?'

ভাড়া করা একটা মোটর কার-এ গৌরদার সঙ্গে অগত্যা আমাকেই রওনা হতে হলো রাম ঠাকুরের বাড়ির দিকে। পথে যেতে যেতে অনেক কথা। রাস্তার একটি ঠিকে দলকে কত পরিশ্রম, কত ত্যাগ আর চিন্তার মূল্যে একটা প্রথম শ্রেণীর বিখ্যাত দলে পরিণত করেছেন, তার ইতিহাস। কথা প্রসঙ্গে এলো শৈলেনের কথা। প্রথমটা খিস্তি করলেন, গালাগাল করলেন। এমন কথাও বললেন যে, এই জামাইয়ের জন্যেই উঠে যাবে তাঁর দল। ছেলেটিকে মনে ধরেছিলো বলেই না একমাত্র সন্তান মেয়েকে তুলে দিয়েছিলেন। এখন (অমুক) সেই জামাই-ই শ্বশুরকে ধমকায়। বোঝে না, আমি মরলে দলটা যে ওরই হবে। যদি বিগড়ে যাই, তখন পাবে আমার এই কলাটা।'

লগ্ন ছিলো রাত আটটায়। আমরা সোয়া আটটা নাগাদ পৌছলাম। গাড়ি

গ্রামের বাড়িতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে রব উঠলো। একগাদা লোক গাড়ি ঘিরে ভিড় করলো। তার মধ্যে লোক ঠেলে ঠেলে এগিয়ে এলো রাম ঠাকুর। খাটো ধুতি পরনে, গায়ে একটা বালাপোষ। মুখময় উজ্জ্বল প্রশান্তির হাসি।

দরজা খুলে নেমেই শুরু হলো খিস্তি। গৌর দাস মশাইয়ের সেই পেটেণ্ট কথার ঝুরি. 'বরকর্তা সেজে (অমুক) আমার মাথা কিনে নিয়েছো। বুড়ো হয়েছো, আক্কেলটা হবে কবে? একটা খবর দিতে কি অঙ্গ খসে খসে পড়ছিলো শালা। বিয়েশাদি বলে কথা, বিপদ-আপদ হতে পারে যখন তখন—একটা খবর দিতে কী হয়েছিলো? এদিকে আমি মানুষটা দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারি না।'

রাম ঠাকুর মুখ কাচুমাচু করে, করজোড়ে বলছিলো, 'বিপদ-আপদ তেমন কিছু হয় নি।'

'হয় নি তাই বসে থেকে আমায় উদ্ধার করেছ।' আমার দিকে তাকালেন গৌরদা, 'কী বলো প্রবোধ, হয় নি বলে হবে না তাকি বলা যায়? শালা আবার হাসছে দেখো। ওরে ভাই পো-র বিয়েতেই এত আনন্দ—নিজেরটা যদি হতো, তবে ভাবতো? তা না গেড়েটা বিবেকানন্দ সাজলো। বোঝ এবার বিবেকানন্দের ঠ্যালা।'

রাম ঠাকুর সবিনয়ে বাধা দিলো, 'অনেক হয়েছে আর গালাগাল দেবেন না। আসুন, ভেতরে একটুখানি পায়ের ধুলো দিন।' রাম আমাকেই বললো শেষ কথাটা।

'পায়ের ধুলো নে', আমাকে দেখিয়ে রাম ঠাকুরকে বললেন,' 'প্রণাম কর শালা। তোর বাবার ভাগ্যি আনন্দবাজার পা দিয়েছে তোর ভাই-ব্যাটার বিয়েতে।'

রামকে আমার পা ছুঁতে দিই নি। হোক না যাত্রার দলের ঠাকুর, মানুষ হিসেবে, শিল্পী হিসেবে কোনদিকে ও ছোট? ওর হাতের অনেক অমৃত-স্বাদী রান্না আমি খেয়েছি। রান্না যদি আর্ট হয় তবে রামও তো একজন আর্টিস্ট।

ভেতর বাড়ি গেলাম। আলোর সাজসজ্জা চারদিকে। উঠানে ছাদনাতলা। বহু নারী পুরুষের কলগুঞ্জন। ব্যস্ততা চারদিকে। থেকে থেকে উলুধ্বনির হাওয়াই ফাটছে। সানাই বেজে যাচ্ছিলো। কচি মেয়েরা কলকল করছে। হাসছে যেন কারা। গৌরদা রাম ঠাকুরকে টানতে টানতে এককোনে নিয়ে এলেন। আমার পাশে। ট্যাঁক থেকে রোল-করা দু' হাজার টাকা রামের হাতে গুঁজে দিয়ে, ফিসফিসে গলায় বললেন, 'হালুইকরের পাওনা, মাছের দাম আর বাজনদারদের প্রাপ্যি আগে দিয়ে দাও। আনন্দের দিনে বাকি বকেয়া একেবারে রাখতে নেই।'

টাকাটা রাম নিচ্ছিলো না। বললো, 'সে সব তোমার কৃপায় আগেই আমি মিটিয়ে দিয়েছি।'

'আর কিছু বাকি নেই ?' গৌরদার মুখটা ব্যাজার দেখা গেলো।

'না।' রাম বললো, 'ছোটবেলা থেকে এই শিক্ষেটা তুমি আমায় ভালভাবেই দিয়েছ।'

'তোকে সুদ দিতে হবে না রাম।'

'আমার তো দরকারই নেই।'

'দরকার নেই ? তুই শালা সংসারের বুঝিসটা কী ? জীবনটা তো কাটালি দড়ি-ছেঁড়া খাসির মতো। তা মেয়েটাকে কী কী দিয়েছিস ?'

'ভরি তিনেক সোনা, কাপড়-চোপড়…।'

'থাক থাক…' গৌরদা ধমক দিলেন। 'শালা গেড়েবাজ, তিনভরি সোনা দিয়ে তুই বিয়ে সারছিস ? কেন, মেয়েটা কি ফ্যালনা রে ? বুকটা তোর ভেঙে গেলো না ? একবার মনে পড়লো না তোর, ও কার মেয়ে ?'

রামঠাকুর কাঁদছিলো, গৌরদাও কাঁদছেন।

'ডাক শালা, আগে স্যাকরা ডেকে আন। আমার জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীকে আমি সাজাবো। দু' হাজারে না হয় দশ হাজার খরচ করবো। গৌর দাসকে ধার বাকি দেবে না পৃথিবীতে এমন কোন শালা জন্মেছে।' গৌরদা আমাকে বসাতে বলে দিয়ে, রামকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চললেন স্যাকরার বাড়ির দিকে।



আমরা রাত এগারোটা নাগাদ রওনা হোলাম বাড়ির পথে। রাম ও তার পরিবারের সকলে, মায় বরবধূ আনন্দের দিনে ছলোছলো চোখে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো ওখানে থাকবার জন্যে। কিন্তু থাকার উপায় নেই। বাসায়

খবর না দিয়ে চলে এসেছি এতদূর পথ। যত রাত্রি হোক, আমাকে যে ফিরতেই হবে।

ফেরার পথে, গাড়িতে গৌরদাকে শুধোলাম, 'বরের বাড়িতে বিয়ে হওয়াটা কি রীতিসিদ্ধ ?'

গৌরদা বললেন, 'কনে পক্ষের সংস্থান না থাকলে সবই সম্ভব।' গৌরদা তখন আসল ঘটনাটা বললেন, কেন রাম মেয়ে তুলে এনে বরের বাড়িতে বিয়ের ব্যবস্থা করেছে।

'রাম ঠাকুরের দাদা বিয়ের পর মাত্র বছর কয়েক দাম্পত্য জীবনের স্বাদ ভোগ করেছিলো। আকস্মিক মৃত্যু সংসারে আনে শোকের ছায়া। গৌরদা বললেন, মানুষ দেবতা নয়। বাঁচবার জন্য তার চাই অবলম্বন। জীবনের জন্য চাই প্রেম। তাই মানুষের এক আধটু দোষ ভগবানও ক্ষমা করে নেন। এই যে লোকে নানা কথা বলে, আঙুল তুলে বৌদি-দেওরের সম্পর্ক নিয়ে কুৎসা রটায়, তার সবটাই যে সত্যি তা কে বলতে পারে ? আর সত্যি হলেই বা দোষটা কোথায় ? শরীরটাকে তো আর ফেলে দিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। শরীর থাকলে তার রসদ চাই। মনের জন্য চাই প্রেম। পেটের খিদে হাবিজাবি দিয়ে মেটানো যেতে পারে, কিন্তু মনের খিদেটা বড়ই সূক্ষ্ম। তাই একজন বঞ্চিত আর একজন কিছু না-পাওয়া মানুষ যদি অদৃশ্য একটি সুঁতোয় বাঁধা পড়ে পড়ুক না। ক্ষতিটা কিসের ?

'রাম ঠাকুর যে ঠিক এই কারণেই বিয়ে করে নি, তা নয়। আসলে যৌবনকালে এই গ্রামেরই একটি মেয়ে রামের মনোহরণ করেছিল। এক মাথা কোঁকড়া চুল, ডাগর দু'টি চোখ, পাকা কামরাঙ্গার মতন বর্ণ যে-কিশোরীর, সেতো রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। শেষ পর্যন্ত দয়িতাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাম রাখতে পারে নি। গৃহলক্ষ্মী করে আনতে পারে নি ঘরে। সেটা দুঃখ হলে দুঃখ, ত্যাগ বললে ত্যাগ, ব্যর্থতা বললে ব্যর্থতা। মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায় হঠাৎ। রাম তখন দলের সঙ্গে মাস তিনেকের জন্য আসাম পাড়ি দিয়েছে। হঠাৎ কেন এমনটি হলো, বলতে পারেন নি গৌর দাস মশাইও। কেবল কাহিনী শেষ করে কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বললেন, 'আজকের বিয়ের কনে সেই মেয়েটির একমাত্র কন্যা।'

সারা পথ ধরে রামের ভালোবাসার কাহিনী আমি যুক্তি দিয়ে নিজের মতো করে

সাজালাম। যেমনটি থাকে গল্পে কি উপন্যাসে। তার আগেই, বলতে ভুলে গেছি, গৌরদা বলেছিলেন, 'মেয়েটি মা-হারা বাপ-হারা, মানুষ হয়েছে কাকার সংসারে। রাম ওর বাবা বললে বাবা শ্বশুর বললে শ্বশুর।'

গৌরদার মনে বড়ো দুঃখ। সে দুঃখটা বরাবরের চাপা। একটা অংশ রেগেটেগে গেলে হয়তো প্রকাশ পেতো কিন্তু অন্যটার কথা শুনি নি কারও কাছেই। দুঃখটা পুত্র সন্তানের অভাববোধ-জাত। আশা ছিলো অভাবটা পুরণ হবে নাতির মুখ দেখলে কিন্তু সে-বাসনাও তাঁর পূর্ণ হয় নি। মেয়ের কোল আলো করেছে চারটি কন্যা সন্তান। শৈলেন নিজেও এ-দিক থেকে শ্বশুরের অনুগামী, কিন্তু তাই বলে গৌরদার মতো অভাববোধ তাঁর আছে কিনা কে বলতে পারে? ও খানিকটা আপন-ভোলা মানুষ। হাসলে উদ্দাম হাসির ফোয়ারা ছুঁড়ে দেয়, রাগলে হয়ে যায় স্টীল গলানো আগুন—আর রাজনীতির আলোচনা পেলে তো খাওয়া-দাওয়াই ভুলে যায়।

গৌরদা বললেন, 'গালমন্দটা ধরো না, আসলে যাই বলি, তুমি জানো জামাই আমার মহাদেব। ব্যবসাটা বোঝাতে চাই, বোঝে না। ও-নিজের মতো করে দল গঠন করতে চায়, চালাতে চায়। তা চালাক। সত্যস্বর বাঁচলেই আমি বাঁচবো। যতদিন দল ততদিন গৌর দাস।' খপ করে হাত দু'টি ধরে ফেললেন গৌরদা, 'তুমিই পারো ওকে লাইনে আনতে। তোমার প্রতি অনেক শ্রদ্ধা ওর। চেষ্টা করো যাতে সত্যস্বর বাঁচে। শৈলেন তোমার বন্ধু বলেই তার পিতার মতো আমি তোমাকে বলছি···।'

তিন.

তনুশ্রী মারা গেল হঠাৎ। যাত্রাশিল্পের প্রথম গ্ল্যামার গার্ল তনুশ্রী দেবী। ওর মৃত্যুটা কি সাদাসিধে ছিল? বোধ হয় না। থাকলে চিৎপুর জুড়ে এতো গুজবের ফুলঝুরি জ্বলতো না।

তনুশ্রী, ওই সময়ের যাত্রার একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী। হঠাৎ মারা যায়। কী হয়েছিলো তনুশ্রীর? নানা লোকের নানা মত। যাত্রায় তখন তনুশ্রীর যশ গগণচুম্বী। জীবিতকালে তার খ্যাতি ও অভিনয় শক্তি নিয়ে যত না আলোচনা হয়েছে চিৎপুরে, আকস্মিক এবং অভাবিত মৃত্যু ওকে যখন এই দুঃখময় জগৎ থেকে পরম প্রশান্তির জগতে ঠাঁই করে দিয়েছে, সেই সময়টা গোটা চিৎপুর তার চেয়েও অনেক বেশি গুলজার। কেউ বলেছেন, তনুশ্রী ধীরে ধীরে নিজেকে শেষ করেছে, তিল তিল করে; কেউ বলেছে, এ-নিছকই সুইসাইড কেস; কারো মুখে বলতে শুনেছি, পেটে একটা বিশাল আকারের টিউমার হয়েছিলো, সেটা বার্স্ট করেই ঘটেছে এই অঘটন।

সত্যিকারের এমন কোনো কারণ ছিল কি যে চিৎপুরের সবসেরা চমকদারী নায়িকা দুঃখে ক্ষোভে বঞ্চনায় আশাহত হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে মৃত্যুর কোলে? জবাব দিতে পারে নি কেউ। অনেককে আমি শুধিয়েছি। যাঁরা তনুশ্রীর সঙ্গে অভিনয় করেছেন, যে-সব নায়কের নায়িকা ছিল তনু এবং যে যে দলে কাজ করেছে তার মালিক, পরিচালক, দল ম্যানেজার সকলকেই। সঠিক করে কেউ বলতে পারেন নি তনুশ্রী দেবীর আসল মৃত্যুর কারণ। সকলকেই বলতে শুনেছি ওঁর তো অভাব ছিলো না কিছু। যাত্রশিল্পে যত নায়িকা আছেন তনুশ্রী দেহগত সৌন্দর্যে সকলকেই হার মানাতে পারতো। টল স্লিম টেণ্ডার

ফিগার; গায়ের রঙটা কিছু মাজা-শ্যামলা কিন্তু ওর মধ্যেই আলাদা ধরনের জৌলুষ ছিল। মুখ চোখ? জীবনানন্দের ভাষা চুরি করে বলি: শ্রাবস্তীর কারুকার্য। টানা চোখ, গভীর দৃষ্টি, উড়ন্ত প্রজাপতির দু'টি মেলে দেওয়া পাখার মতন জীবন্ত ভুরু, টিকলো খাড়া নাক, পাতলা ওষ্ঠে আশ্চর্য কমনীয়তা ও টান—ও যখন সেজে আসতো, অথবা না-সেজেই এসে দাঁড়াতো সম্মুখে, মনে হতো খাজুরাহোও বুঝি লজ্জা পাবে। গান গাইতে জানতো তনু, নাচতেও; রয়্যাল ড্রেসে সাজলে মনে হতো অনন্যা এক সম্রাজ্ঞী সামনে এলেন।

সে বছর তনুশ্রী রয়েল বীণাপাণি অপেরার হিরোইন। হিরো বিজনবাবু, বিজন মুখার্জী—নট-সম্রাট স্বপনকুমারের অগ্রজ। শিবপুরে শুনতে গেলাম দলের যাত্রা। গান শেষ হলো রাত দেড়টায়। খাওয়া থা'স্থির পাঠ চুকিয়ে রওনা হবো, পাইলট এসে জানালো, গাড়ি বিগড়েছে। সারাতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগবে। সুতরাং বিশ্রাম। যাত্রার দল থেকে তখন রাত্রির রান্নার পাট উঠে গেছে। চালু হয়েছে জলপানির সিস্টেম। অর্থাৎ রাত্রির খোরাকি সম্প্রদায়ের পজিসন হিসাবে নগদ মিটিয়ে দেওয়া হয়। যে যা পারে দোকান থেকে খেয়ে নেয়। তনুশ্রীর খাবার এনে দিয়েছিলো একজন চাকর, তনুশ্রী তার সদ্ব্যবহার করে বসে আছে আমার দেরি হবে জেনে কাছে এলো, বললো, 'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে দাদা। আসবেন?' সেই যে প্রথম কথা তা নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সময় সুযোগ পেলেই তনুশ্রী তার মনের ভার কিছু কিছু করে লাঘব করেছে। ওর মৃত্যুর পর সেই ভারী বস্তুগুলো প্রায়শ আমার মনে পড়তো।

তনুশ্রীর জীবনে ভালোবাসা এসেছিলো অনেকবার। একবার তা নিয়েছিলো চরম আকার। দয়িতের নামটা নাই বা করলাম। চিৎপুরের যাত্রা ইণ্ডাস্ট্রির একজন খ্যাতনামা অভিনেতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিতা হতে হয়েছিলো তনুশ্রীকে। যে-রাত্রে ঘটনা, থুরি, দুর্ঘটনা ঘটে, তার পরদিন সকাল থেকেই চিৎপুরের ইন্দ্রসভা গুলজার। তনুশ্রী সবটাই খুলে বলেছিলো আমাকে। বলেছিলো: ঘটনাটা ঘটলো আকস্মিকভাবে। গান ছিল দক্ষিণবঙ্গের এক আসরে। দলে সেবার নিয়ম হয়েছিলো, গান ভাঙলে নায়ক নায়িকা এক ঘরে বসে খানাপিনা করবে, বিশ্রাম নেবে। হিরো নিজেই এই আইনটি চালু করেন। ক্রমে সেটা দাঁড়ালো দরজা-বন্ধ ঘরে। সেদিনও যথারীতি যাত্রা ভাঙলে ওরা দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলো।

যা ভাবা যায় নি, সেদিন তাই ঘটলো। হঠাৎ দরজা কড়া নড়ে উঠলো : খুটখুট ! বাঘের গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন্ নায়ক : কে ! জবাব এলো না। দরজার ওপাশে আবার খুটখুট শব্দ। আবার হুঙ্কার। জবাব নেই। কড়া নাড়ার শব্দ ক্রমশ জোরদার হচ্ছিলো। তারপর অস্থির। কুপিত নায়ক সদম্ভে এগিয়ে গেলেন দরজার কাছে। হুঙ্কার ছাড়লেন : কে! জবাব এলো এবার। নারীকণ্ঠ ; গম্ভীর। নায়ক মশাই চমকে দু' পা পিছিয়ে এলেন। তাঁর চোখমুখ নিমেষে বরফ-সাদা হয়ে গেলো।

বাইরের আওয়াজ আরও শব্দিত, দ্রুত এবং ভয়ঙ্কর হলে, নায়ক অসহায়ের মতো একবার এবং শেষবার তনুশ্রীকে দেখলো। তারপর দরজাটা খুলে দিলো শব্দ করে। দমকা হাওয়ার ঝাপটার মতন ঘরে ঢুকলেন একজন মহিলা, যার পরনে বহুমূল্য আভরণ, অঙ্গে অলঙ্কারের ছড়াছড়ি। ভদ্রমহিলার চোখ যেন চোখই নয় ; জলন্ত অগ্নিগোলক। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা তাঁর হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে মারলেন নায়কের মুখের ওপর। 'বাপ্‌স্' ! একটা হৃদয়বিদারী আর্তনাদ করে, দু' হাতে মুখ চাপা দিয়ে নায়ক ধপাস্ বসে পড়লেন মেঝেতে।

তনুশ্রীর কাছে গোটা ব্যাপারটাই অবাকের। ঘুণাক্ষরেও ও ভাবতে পারে নি এমন একটা কাণ্ড ঘটতে পারে। চোখের পলক ফেলার সময় না দিয়ে আগন্তুক মহিলা বজ্রের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন তনুশ্রীর ওপর। তারপর কিল চড় ঘুসি। এই সুযোগে নায়ক খোলা দরজা দিয়ে চোঁচা দৌড়। রাগে আক্রোশে ক্ষিপ্ত মহিলা তনুশ্রীর অঙ্গবাস, মাথার চুল ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন করতে লাগলো। আত্মরক্ষার তাগিদে অতএব শুরু হলো জোর চুলাচুলি।

'নায়ক দাদা গেলেন কোথায় ?' আমি শুধোলাম।

তনুশ্রী বললো, 'য পলায়তে, স জীবতি। তার আর পাত্তাই পাওয়া গেলো না দাদা।'

যাত্রার এক কনিষ্ঠ যুব নায়ক, অনেক চেষ্টা করেও যে হিরোর পোস্ট পেলো না, নায়ক হয়ে দাঁড়াতে পারলো না আসরে, তার নাম ধরে নিলাম সুধীরকুমার। রূপ আছে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা, রঙ ফর্সা, চোখ মুখ নাক সার্প, হাইটেও বেমানান নয় ; একটা বটগাছের ছায়ায় থেকে থেকে ওর বাড়বাড়ন্ত হলো না। সুতরাং মন-জোড়া দুঃখের পাথর। হরিপদ বায়েন তখন নাট্যভারতীতে। ওখানে

প্রায়শ আসতো সুধীর। এলেই আসর জমজমাট। কোন কোন বড় অভিনেতা এবং অভিনেত্রী কেমন করে এ্যাকটিং করেন, কী তাঁদের মুদ্রাদোষ, কেমনভাবে মডিলিউশন করেন—এ-সব হুবহু অনুকরণ করতে পারতো সুধীর। অঙ্গভঙ্গি, হাঁটাচলা, ডেলিভারি দেখাতো। দেখাতে দেখাতেই আচমকা উঠে পড়তো। তারপর সটান প্রস্থান। ও যে কী ভেবে গদীতে আসতো, কেনই বা হঠাৎ চলে যেতো খুঁজে পাওয়া যেতো না।

সুধীরকুমারকে আমি সুধা বলে ডাকতাম।

যে-বছর তনুশ্রী নিগৃহীতা হলো নায়কের জাদরেল সহধর্মিনীর হাতে, সে মরশুমটা সুধা ওই দলেই ছিলো। বটগাছের আশ্রয়ে। ওকে যত বেশি শুধোই ও তত বেশি হাসে এবং হাসায়। আমার ধমক খেয়ে সুধা সোজা হয়ে বসলো। তারপর তনুশ্রী-লাঞ্ছনা-সংবাদ বর্ণনা করলো।

'আমাদের নায়কের স্ত্রী প্রায়শ সারপ্রাইজ ভিজিট দেন দলে। স্বামী অনুগতার স্বামীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস? এমনও হয়েছে যে, আপার-আসামে হচ্ছে দলের গান, হঠাৎ সেখানে সাবিত্রী দেবীর প্রবেশ। আচমকা, উইদাউট নোটিশ। দল-মালিকের খরচে তিনি বিমানযাত্রী হয়ে উড়ে আসেন অনুগত বাধ্য সচ্চরিত্র সোয়ামীর সুবিধে অসুবিধে, স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ নিতে। তার আগমন মানেই একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। দল ম্যানেজার, আর্টিস্ট—মায় চাকর-বাকরেরা পর্যন্ত তটস্থ। সত্যিই তো কে আর বলতে পারে, রণরঙ্গিনী কখন কোন মূর্তি ধরবেন! দক্ষিণবঙ্গের আসরে, অতো রাত্রে যখন এই মহিলা বুক চেতিয়ে ঢুকলেন, সকলেই তখন প্রমাদ গণলো। সাজঘরে ঢুকতেই সুধার সঙ্গে দেখা। 'তোমার দাদা কোথায় সুধীর?'

সুধা আমতা আমতা করে। 'দাদা?' ঢোক গেলে। 'দাদাতো ছিলেন এখানেই।' মাথা চুলকোতে থাকে সুধীর। 'এখানেই, মানে এই সাজঘরেই দেখেছিলাম খানিক আগে।' সময় নিতে থাকে সুধা। 'আসবে, আসবে।' সান্ত্বনার সুর ওর গলায়, 'আপনি একটু বসুন, এখনই এসে যাবে।' চাকরদের ডাকতে থাকে সুধা, 'বাক্সের ওপর আসন পেতে দে-রে, বৌদি বসবে।' ওদিকে আতঙ্কে গলা কাঁপতে শুরু করেছে সুধীরের, 'হয়তো চা-ফা খেতেটেতে...'

'চা!' ভদ্রমহিলা প্রায় আৎকে ওঠেন। 'তোমার দাদা আবার চা খেতে শুরু করলো কবে থেকে? তাও আবার নিজে দোকানে গিয়ে!'

'ওই আর কি ; মানে সর্দিসর্দি ভাবটাব হলে…'
'কিন্তু চাকরেরা যে বললো, বাসাবাড়ির দিকে যেতে দেখেছে…!'
সর্বনাশ ! আকাশ থেকে ধপাস করে মাটিতে পড়লো সুধীর। আর রক্ষে নেই। কারণ এই একটু আগেই শ্রীমান সুধীরকুমার বাসাবাড়ি থেকে জরুরী কিছু নিতে সাজঘরে এসেছে। স্বচক্ষে সে দেখে এসেছে, হিরোদাদা হিরোইনকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করলো।
আঙুল নাড়িয়ে সুধা আমাকে বললো, 'পড়লাম এক মহা ফ্যাসাদে। দরজা বন্ধ করার আগে হিরোদাদা প্রত্যহের মতো আমার কানে কানে বলে রেখেছিলো, তাঁর মিসেস এলে যেন তাঁকে আগে থেকেই জানান দেওয়া হয়। সুতরাং আমি রণরঙ্গিনীর হাত ফসকে পালিয়ে যাওয়ার কৌসিস করছিলাম। চাকরগুলোকেও চোখ টিপে ইশারা করতে করতে আমার চোখ দু'টো ব্যথা হয়ে গেলো। বেচারীরা বুঝেছিলো, আমি ওদের দৌড়ে গিয়ে খবর দিতে বলছি। কিন্তু বেচারীদের নার্ভগুলো পটাপট ফেল করে গেছে। ভয়ে কাঠ। অবস্থা বুঝে তারা পাদমেকং ন…'
'হতেও পারে,' সুধা এতক্ষণে অর্ধেক সারেণ্ডার করলো। 'হয়তো এক্ষুনি…'
'চলো—', হাত বাড়িয়ে রাস্তা দেখালেন রণরঙ্গিনী। গলা গম্ভীর। বক্ষ ওঠানামা করছে, 'এসো আমার সঙ্গে।'
সুধা গড়িমসি করে। 'আমার না বৌদি, মানে, আপনাকে বলতে লজ্জাও হচ্ছে, আবার পেটও কামড়ে যাচ্ছে ভীষণভাবে।'
'এগোও।' আবার সেই ধমকের গলা। আগের তুলনায় কিছু চড়া স্বর।
সুধীরকুমার আমাকে বললো, 'আমি দাদা একজন যাত্রার এ্যাকটর, ভাবলাম, হেরে যাবো তুচ্ছ এক রমণীর কাছে ? তাই একটা ফর্মা ধরলাম। `এমন অভিনয় —মানে বাচনিক নয়, সাত্ত্বিক আর আহার্য ধরলাম— যেন প্রকৃতির বেগ আর চেপে রাখতে পারছি না। কিন্তু অচিরে বুঝলাম, এই মহিলার কাছে আমি নগণ্য এক শিশুপুত্রের মতন। যদিও জানতাম, মহিলা একদা যাত্রাদলে নৃত্য এবং অভিনয় দুই-ই করতেন। যিনি চড়াও হয়ে জব্বর নায়কদাদার ঘরে উঠে গিয়ে সহধর্মিণীর অধিকার অর্জন করেছেন। কিন্তু তখন বিশ্বাস করতে পারি নি।'
আবার একটা প্রচণ্ড ধমক, 'চল্ হারামজাদা।' যেমনি বলা, অমনি, প্রায় কম্বুই

পর্যন্ত নানা ধরনের গয়না-পরা শক্ত হাতের মুঠিতে আমার কব্জি চেপে ধরা। এবং হ্যাঁচকা টান।

'অগত্যা যেতেই হলো। সামনে প্রাণের ভয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো একজন চাকর। তার হাতে কালিঝুলি পড়া লণ্ঠন। পেছনে আমি এবং আমার হাত চেপে ধরা রণরঙ্গিনী মহামায়া। এই ফাঁকে রাস্তা থেকে বেশ পুরুষ্টু গোছের একটা গাছের মড়া ডালও তিনি কুড়িয়ে নিয়েছেন। ওঁর ডান হাতে চেপে ধরা সেই নীরস তরুবর, আমি এবং চাকর—দু'জনেই জানতাম, নায়কের গাত্র স্পর্শ করার আগেই আমাদের দেহও রক্তাক্ত করতে পারে।

'বাসা-বাড়িতে ততক্ষণে খাওয়া-খাওয়ির পাট শেষ। বাস ছাড়বে না; কারণ পরদিনও এখানেই যাত্রা। ফ্লিটের অংশীদারেরা সকলেই শয্যার আশ্রয় নিয়েছে। ছেলেদের কয়েকটি ঘরে তখনও কেউ কেউ জেগে। আমাদের এই অবস্থা দেখে একটা ভীরু গুঞ্জরণ উঠলো। কে যেন ছুটতে যাচ্ছিলো, মহিলার একটি টি এন টি ফাইভ থাউজেণ্ড মার্কা ধমক, এবং পুরুষ্টু বৃক্ষশাখার আচমকা আঘাতে একেবারে ধরাশায়ী। আঘাতটা কতো হর্স-পাওয়ারের ছিলো জানি না, তবে দেখলাম, স্বাস্থ্যবান গাছের ডালটা ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে মাটিতে পড়লো। চোখ ছানাবড়া হয়ে আসা চাকরটা কাঁপতে কাঁপতে নির্দিষ্ট ঘরের সামনের দরজায় এসে দাঁড়ালো। মহিলা বন্ধ দরজায় চোখ রেখে বার দুই বুকটাকে চলন্ত হাঁপর করলেন। এবং চক্ষের নিমেষে ঝপাং করে দোর-গোড়া থেকে একখান চটি তুলে নিয়ে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তা প্রত্যক্ষ করে, বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

'এটা কী, এ্যা!'

'মানে, মানে…'

'এটা কি ব্যাটাছেলেদের চটি?'

'আজ্ঞে না', সুধীরকুমার তোতলায়। 'কী রকম যেন মেয়েদের মেয়েদের মনে হচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে একটি কান তালা-করা ধমক এবং পাঁচ কেজি ওজনের থাবড়া একসঙ্গে আছড়ে পড়লো সুধার শরীরে। 'মনে হচ্ছে? হারামজাদা, তোর মনকে আজ আমি দেখাচ্ছি।'

অমনি কড়ার মধ্যে হাত। খুটুং খুটুং আওয়াজ।

সুধা বললো, 'ঘটনাটা দাদা এখানেই সমাপ্ত নয়। আরও আছে।'
বললাম, 'আরও।'
সুধা বললো, 'এতো সবে এ্যানটি ক্লাইমেক্স।'
'বলিস কী!'
'হ্যাঁ,' সুধা বললো, 'শয়নকক্ষে রণরঙ্গিনীর সদর্প প্রবেশ ও তৎক্ষণাৎ নায়িকাকে আক্রমণের সুযোগে নায়ক দাদা পালিয়ে এসে আমার হাত ধরে টানতে টানতে লুকোলেন এসে রান্নাবাড়ির ঠাকুরদের ঘরে। তুই রমণীর কুরুক্ষেত্র ওদিকে জব্বর জমে উঠেছে। এখান থেকে শোনা যাচ্ছিলো ধুপধাপ, ধমাধম, ধপাস ধপাস শব্দ। নায়কদাদা আমার হাত ধরে অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকলেও ওই ভয়াবহ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আৎকে আৎকে উঠছিলেন। এক সময় আমার কানের ওপর মুখ গুঁজে দিয়ে বললেন ফিসফিস করে, 'ধরা পড়ে যাবো নাতো রে সুধা?' ততোধিক চাপা গলায় আমি উত্তর দিলাম, 'পাগল!'
'এক সময় রণদুন্দুভি থামলো। আমরা শুনতে পেলাম রমণী কণ্ঠের চিকন কান্নার রেশ। রণরঙ্গিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাঁক দিচ্ছেন, 'কোথায়? গেলো কোথায়?' ওই কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে নায়কদাদা বারবার আমাকে জাপটে জাপটে ধরছিলেন আর কাঁপছিলেন। তনুশ্রীর কান্নার স্বর তখনও শুনতে পারছি আমরা। কিন্তু ওই কান্না যে বেশ বড়ো হয়ে আমাদের কণ্ঠেও ভর করবে বুঝতে পারি নি। পারলে আমরা দু'জনে ওখান থেকেও পিট্টান দিতাম।
'হঠাৎই একটা টর্চের জোরালো আলো হুমড়ি খেয়ে পড়লো আমাদের ওপর। নড়েচড়ে বসার অবকাশই পাওয়া গেলো না, তার আগেই কী যেন জব্বর ভারী বস্তু ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের ওপর। অন্ধকারে বুঝতে পারি নি কে আমার চুলের মুঠি শক্ত থামচায় চেপে ধরেছে। নায়কদাদাও আর্তনাদ করছেন। চুল ধরা হাতটি ধরতে গিয়ে মালুম হলো, ওমা! এযে দেখছি কোনো চুড়িপরা মহিলার নরম নরম হাত!
'হিরোদাদার যন্ত্রণা কাতর চিৎকারে লণ্ঠনবাতি নিয়ে ছুটে এলো দলের কয়েকজন আর্টিস্ট। আলোয় দেখতে পারলাম নায়িকা-খতম-পর্ব সমাপ্ত করে ভয়াবহ রণচণ্ডী আমাদের পঞ্চম বায়ু মুক্তি দিতে আবির্ভূতা। ওঁর ডান হাতে নায়কের মাথার ফোলাফোলা বাবড়ি চুল জোর মুঠোয় ধরা। বাঁ হাতের ধরেছেন আমার ঝুঁটি। রণরঙ্গিনী ডান পায়ে নায়কের পেটে হেভি ওয়েটের প্রচণ্ড লাথি কষে

যাচ্ছেন। বেচারী নায়ক ওই আশী কেজি ওজনের এক একটা পদাঘাতে কোৎ কোৎ শব্দ তুলছেন।

'ভগবান রামকৃষ্ণ বলেছেন : ওরে পড়ে পড়ে মার হজম করিসনে, মাঝে মাঝে ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করিস। দেখলাম অতীব মারাত্মক বাণী। নায়কদাদা সজোরে একবার ফোঁস করতে গিয়েছিলেন, হঠাৎ একটি কাষ্ঠখণ্ডের ভয়ঙ্কর আঘাতে শেষ চিৎকার করে পপাত ধরণীতল। যেই পড়া সেই গোঁ গোঁ শব্দ। এবং অচিরে মূর্ছা। ততক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম, আমার মস্তকটি একটি ব্যাঘ্রের থাবা থেকে আপততঃ মুক্ত। দে ছুট। দৌড়ে পালাতে গিয়ে পা হড়কে পড়লাম। শুনেছিলাম আমাদের কোন শাস্ত্রে যেন আছে, মা-কালী অসুর নিধনে নেমেছিলেন। পিটপিট করে তাকিয়ে দেখি, রণরঙ্গিনী নায়ক-বধূর হাতে একটি আস্ত চ্যালাকাঠ প্রায় খড়্গোরই মতন শোভা পাচ্ছে। এবং তাই দিয়ে তিনি দলের অসুরদের বেদম ঠেঙিয়ে যাচ্ছেন। আর অসুররা ধপাস ধপাস ভূমিশয্যা নিচ্ছে।

'জ্ঞান হারাই জ্ঞান হারাই ভাব থাকলেও আমি অজ্ঞান হয়ে যাই নি। চোখ বুঁজে থাকলাম কিছুক্ষণ। চোখ খুলেই দেখতে পেলাম, চারদিক চুপচাপ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা আমার মনে পড়লো। হুবহু সেই দৃশ্যই। কয়েকটা অচৈতন্য আহত দেহ ইতস্ততঃ পড়ে আছে, লণ্ঠনগুলো ভেঙে চুরমার, লণ্ডভণ্ড সবকিছু।

'ধীরে ধীরে আমি উঠলাম। এগিয়ে গিয়ে দেখি সব কটি ঘরই ফাঁকা। নায়ক-শূন্য ঘরে নায়িকা টানা রোদন করে যাচ্ছেন। তাঁর দেহটা তক্তপোশের উপর। আলুথালু বেশবাস, বিস্রস্ত চূর্ণকুন্তল, শরীর রক্তাক্ত। বুঝলাম বাকি সবাই পালিয়েছে।

'একঘটি জল নিয়ে আমি রান্নাবাড়ির রণস্থলের দিকে এগোলাম। কয়েক আঁজলা জল নিয়ে চোখেমুখে ঝাপটা মারতেই নায়কদাদা কাহিল গলায় বললেন, 'চলে গেছে!'

'হ্যাঁ।'

সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকায় বপুটা সটান উঠে দাঁড়ালো। তাঁর জামা-কাপড়ের হাল দেখলে ভিক্ষুক পর্যন্ত লজ্জা পাবে। কপালে, গালে, গলায় রক্ত, সামনের দিকে ফোঁপানো টেরির খানিকটা ওপড়ানো। পরনের ওই হাল হওয়া জামা-কাপড়ই অভ্যাস-

বশত ঝাড়তে ঝাড়তে কান্না-কাঁপা গলায় নায়ক বললেন, 'এরপর বিয়ে করে কোন শালা।'



নায়ক বনাম নায়ক বধূ সংঘর্ষ সংবাদ কিন্তু এখানেই সমাপ্ত নয়। এর চাইতেও রোমহর্ষক ঘটনা রয়েছে পেছনে। হরিপদ হেসে গড়ান খাচ্ছিলো। আমার অবস্থাও কাহিল।

সুধা পরবর্তী কাহিনীর বর্ণনা শুরু করলো।

'খুনোখুনি রক্তারক্তি যাই ঘটে থাক, আদপে ওই সম্পর্কটা তো স্বামী-স্ত্রীর। তাই আহত নায়ক-দাদা অতীব ক্ষীণ এবং যৎপরোনাস্তি কাহিল গলায় ধুঁকতে ধুঁকতে ডাকলেন, 'সু-ধী-র্যা।'

'আজ্ঞে।'

'তোর বৌদি গেল কোথায়?'

'ততক্ষণে ঝোপেঝাড়ে, আড়ালে-অবডালে, আনাচে কানাচে লুকিয়ে পড়া লোক-গুলো অতি সন্তর্পণে ইতিউতি তাকাতে তাকাতে এগিয়ে এলো। যেন একটা লড়াই হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেকে আহত নিহত পরিজনদের খুঁজতে বেরিয়েছে। ভয়ে ভয়ে।

'একজন চাকর বললো, বৌদি নাকি যে-গাড়িতে এসেছেন সেদিকে একেবারেই যান নি। হাঁটা দিয়েছেন রেলস্টেশনের দিকে। অগত্যা আমরাও সেদিকেই। দাদা বললেন, 'সুধীর. তুই ডানদিকের ঝোপঝাড় দেখতে থাক, আমি চোখ রাখছি বাঁ-দিকে।'

'রাত ততক্ষণে শেষ থামে এসে পৌঁছেচে। লক্ষ্মীকান্তপুর রেল-স্টেশনটা অন্ধকারে মনে হচ্ছিলো ভূতুড়ে বাড়ি। ডাইনে বাঁয়ে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে আমরা স্টেশনে এসে উপস্থিত হোলাম। দূরে দূরে এক আধটা নিবু নিবু আলো জ্বলছে। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে মড়া, মিশকালো এক বিশাল অজগড় সাপের মতো।

প্ল্যামফরমে যতায়াত-করা মানুষগুলোকে স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে ছায়া-ছায়া প্রেতমূর্তি। গাড়ির ভেতরে কোনো আলো নেই। দাদা আর আমি ট্রেনের শেষ কামরা থেকে টর্চের আলোয় খুঁজতে শুরু করলাম অসুর বিনাশিনী রণরঙ্গিনীকে।

অবশেষে আবিষ্কার করা গেলো।

নানা ধরনের শাকসব্জি ফলমূল আলু পেঁয়াজের বস্তাতে ভর্তি একটা কামরার কোণের দিকে বেগুন কি আলুর বস্তার ওপর মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন ফেরার-জননী। টর্চের আলো পড়তে দেখলাম, ওঁর ভেজা চোখের কোল তখনও চকচক করছে।

নায়ক ডাকলেন, 'সুধীর‍্যা।'

'দাদা।'

'থাক।' কী ভেবে যেন হিরো আর কথা বাড়ালেন না। উল্টো দিকের সীটে, বস্তার ফাঁকে একটু জায়গা বের করে সেখানে বসলেন। 'ঘুমোক' দাদা বললেন। 'খামোকা জাগিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং আয়, আমরা এখানেই বসি।'

'কিন্তু…' জায়গা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান আমি একটা আলু বস্তার ওপর জায়গা পেলাম। কাছাকাছিই। বসে আমতা আমতা করছি।

'কিছু বলবি?' নায়ক শুধোলেন।

'বলছিলাম কি দাদা…।' আমি সাহসের অভাবে ঢোঁক গিলে কুল পাই না।

'বল বল, কী বলছিলি, বলে ফেল।'

'এখানে থাকাটা কি ঠিক হবে আমাদের?'

'কেন হবে না?'

'ঘুম ভাঙলেই যদি আবার…'

'ভয় পাচ্ছিস?' দাদার গলায় সাহসের ভীরু স্বর। 'ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় নেই; আমিতো জলজ্যান্ত তোর পাশেই রয়েছি। তা ছাড়া…' একটা সিগ্রেট ধরাবার আছিলায় হিরো দি গ্রেট স্ত্রীর মুখটা দেখে নিলেন, 'তাছাড়া মেয়েদের আবার ভয় কিসের রে?'

'মেয়ে নয় দাদা, মেয়ে নয়…,' আমি সাহস পেয়ে বলি।

'তবে!' নায়ক বিস্মিত।

'ব-উ…', টেনে টেনে বললাম আমি।

'বউ !' হিরো এক ফুৎকারে সহ-অভিনেতাকে উড়িয়ে দেবার মতো শব্দ করলো। ঠোঁটের ফাঁকে সিগ্রেট জ্বলছে। 'ঠিক বলেছিস রে সুধীর‍্যা, মেয়েরা শালা বউ হলেই না ডেঞ্জারাস হয়ে যায়।'

'কথা বলতে বলতে আমরা মশগুল। কখন যে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলো হুঁস নেই। তাকিয়ে দেখি গোটা কয়েক স্টেশনও পেরিয়ে এসেছি। আকাশের অস্বচ্ছ আলোর জলে কাহিল ব্যাঙাচির মতো তারারা কাটছে ডুব-সাঁতার। হঠাৎ কিছু লোক বস্তাফস্তা নামাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। স্টেশন এসে গেছে, কামরাশুদ্দ্ কলরোল। বস্তা নামানো, লোকজনের ওঠা-নামার শব্দে ঘুম পাতলা মহিলার চোখ দেখলাম পিটপিট করছে। সর্বনাশ! আমার রক্ত জল হয়ে এলো। আর পড়তো পড় দৃষ্টিটা সরাসরি যেই পড়লো আমারই ওপর, আমি না প্রচণ্ড ঘাবড়ে গিয়ে নায়ক-দাদার পশ্চাদ্দেশে কাটলাম একটা চোরা চিমটি। ওমা হঠাৎ দেখি ফড়িং এর মতো তিড়িং করে লাফিয়ে উঠেই নায়কদাদা পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করলেন, 'সাপ সাপ সাপ…'। সীটের উপর দাঁড়ানো জাইঘান্টিক হিরোর হাঁটু দু'টো তর-র-র-র করে কাঁপছে। কাঁপা হাতে-ধরা টর্চের আলোটাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না কোথাও।

সাপ…সাপ…সঙ্গে সঙ্গে সারা কামরা জুড়ে হুটোপুটি, ঠেলাঠেলি, দুপদাপ, থুপথাপ শব্দ। হঠাৎ দেখি রণরঙ্গিনী মহামায়া তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই ঝাপিয়ে পড়লো, জব্বরভাবে জাপটে ধরেছেন স্বামীকে। আর গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছেন, 'বাঁচাও · বাঁচাও…।'

সুধা বললো, 'দাদা ভেবেছিলাম বুঝি আমার চিমটিটা জলজ্যান্ত সাপ হয়ে বুঝি নাটকের মিলনান্ত পরিণতি ঘটালো। শিয়ালদহ পর্যন্ত ওই ধারণাই আমার ছিলো। কিন্তু যেই না ট্যাক্সিটা ছাড়া, ব্যাস, শুরু হয়ে গেলো সাপ-নেউলের খেল। নায়ক দাদা বসেছিলেন ড্রাইভারের পাশে। গৃহিণী স্বামীর অনুগত শিষ্যসহ পেছনের সীটে। কী কথায় যে নারদের বীণা বেজে উঠলো কে জানে, হঠাৎ দেখি সামনে পিছনে তুমুল যুদ্ধ। মহিলা বাঁ-হাতে নায়কদাদার ঝাউগাছের মতন ক্যালকেশিয়ান ঝাঁকড়া চুলের ঝুঁটি খামচা দিয়ে ধরেছেন আর ডান হাত দিয়ে বেদম চালিয়ে যাচ্ছেন কিল-চড়-ঘুসি-খামচি। অসহায় স্বামী বেচারী বউয়ের হাত থেকে মাথা ছাড়াতে না পেরে অন্ধের মত দু'হাতে স্ত্রীর মাথাটা খুঁজে

বেড়াচ্ছেন। ট্যাক্সিটা কিন্তু সোজা সার্কুলার রোড ধরে ফিফটি মাইলস স্পীডে ছুটছে শ্যামবাজারের দিকে। ফাঁকা রাস্তায়।

'রাত যেন তার অন্ধকার আঁচল গুটিয়ে নিয়েছে। উঠি উঠি সূর্যদেব' কোন দিগন্তে আড়মোড়া ভাঙছে কে জানে। কলকাতা ঘুমোচ্ছে না-আলো না-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে। হোস পাইপের জলের ঝর্ণা দিয়ে পথ ধোয়া হচ্ছে। চারদিকে ঝাপসা এক কুয়াশা কুয়াশা ভাব। হঠাৎ রণরঙ্গিনী ড্রাইভারকে আক্রমণ করলো, 'থামাও, থামাও বলছি।' ঘ্যাঁচ করে ট্যাক্সিটা থেমেও গেলো ঠিক গ্রে স্ট্রীট-সার্কুলার রোড জংশনে। ড্রাইভারের কলার-এর পেছনদিক ছেড়ে দিয়ে ফট করে দরজা খুলে ঝটিতি রাস্তায় নেমে পড়লেন নায়ক-বধূ এবং নিমেষে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, পথ আটকে চেঁচাতে লাগলেন, 'বাঁচাও, বাঁচাও, মুঝে বাঁচাও ভাইসব।'

'রাস্তার ও-পাশে সারিবাঁধা গণ্ডা কয়েক লরি দাঁড়ানো ছিল। একজনও লোক ছিলো না ওদিকে। হঠাৎ দেখি লরি ফুঁড়ে লোক উঠছে। ওখানেও ছুটোপুটি। লরী পুঙ্গবেরা অবোধ্য ভাষায় কী যেন বলাবলি করতে করতে ছোটাছুটি করছে। ওমা, হঠাৎ দেখা গেলো, খাটো আণ্ডার-ওয়্যার-পরা ঝাঁকড়া চুল অলা গণ্ডা তিনেক সর্দারজী লোহার হ্যাণ্ডেল তুলে ছুটে আসছে ট্যাক্সির দিকেই। 'তেরে ইভক্ক পিডক্ক তেণ্ডুল্লা দিকরা...' ঠিক এই ধরনের কিছু জিগির ওদের মুখে।

নায়ক হতভম্ব। চক্ষু ছানাবড়া, বুকে কাঁপুনি। ডাকলেন, 'সুধীর্যারে...'

'দাদা।'

ঝট করে ট্যাক্সির দরজা খুলে সটান রাস্তায় লাফিয়ে পড়লেন হিরো। আলুথালু ছেঁড়া ছত্রখান ধুতিখানা কাঁচিয়ে তুলে ফেললেন নিতম্বের সীমায়। 'পালা...' কথাটা পুরো বলার আগেই পড়িমরি দে ছুট। সিধা সার্কুলার রোড ধরে চিৎপুর যাত্রাপাড়ার হিরো প্রাণপণে ছুটছে শ্যামবাজারের দিকে।

এ-দিকে লোহার ডাণ্ডা তোলা ডজন তিনেক সদ্য ঘুম থেকে জেগে ওঠা ভয়াবহ রমণী-রক্ষক দল ছুটে আসছে বিদ্যুৎ-গতিতে, ওদিকে নায়কদাদা দেড়গজী কাইক ফেলে ছুটছেন শ্যামবাজারের দিকে। হঠাৎই একটা আর্ত চিৎকার। দেখা গেলো ড্রাইভার বেচারী গাড়ির ভাড়ার মায়া পরিত্যাগ করে গ্রে স্ট্রীট বরাবর মেরেছে চোঁচা দৌড়।

মহিলা তখনও চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, 'লেকে ভাগতা হায়, মুঝে বাঁচাও, মুঝে বাঁচাও।' ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া সুধীরকুমার কী যে করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। ডজন তিনেক লরীর হ্যাণ্ডেল তারই দিকে এগিয়ে আসছে দেখে, সেও লাফ মেরে ফুটপাথে পড়েই মার দৌড়।

সুধা বললো, 'দাদা, অগত্যা আমি মহাজানো যেন গতঃ স পন্থাঃ। ছুটছি তো ছুটছিই। সামনে যাত্রার হিরো, পেছনে লরীর হ্যাণ্ডেল উর্ধ্বে তোলা জনা-বারো আণ্ডার-ওয়্যার-পরা ভীমমার্কা ড্রাইভার, ক্লিনার। আমরা যত ছুটি ওরা তত এগোয়।

'কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেললাম নায়কদাদাকে। তিনি ছুটছেন আর পেছন ফিরে ফিরে দেখছেন। দুই পক্ষের মধ্যেকার ব্যবধান কমে আসছে ক্রমশঃ। অগত্যা ধরেই নিতে হলো, ডজন খানেক লরীর হ্যাণ্ডেলের হাত থেকে আমাদের নিস্তার পাওয়ার কোনো পথ নেই। গলা বুক শুকিয়ে কাঠ। কোমরে ব্যথা। নায়কদাদা হাঁপাচ্ছেন রীতিমতো। স্পীড কমে আসছে তাঁর।

'কাণ্ডটা নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল। দেখি হোস-পাইপ-অলাকে জাপটে ধরে হিরোদাদা পাইপের মুখটা দখল করে নিয়েছেন। এবং হোস পাইপের মুখটা তাক করেছেন ঝাকড়া চুল উড়িয়ে, হ্যাণ্ডেল তুলে আসা লরী পুঙ্গবদের ওপর। গ্যালন গ্যালন জলের তোড় আছড়ে পড়লো ওদের ওপর। পিছল পথে পটাপট কুপোকাৎ হতে লাগলো যমদূতের মতো আক্রমণকারীরা। হঠাৎ শুনতে পেলাম হিরোর চিৎকার, 'সুধীর্যারে…'

'দাদা গো…'

'বাঁ দিকের গলি দিয়ে মার দৌড়।'

মহাজন-বাক্য অমান্যি করি নি। সর্পিল, আঁকাবাঁকা, সরু গলিপথ ধরে ছুটছি। অনেকগুলো মোড় পেরিয়ে আসার পর দেখি আমায় ধরে ফেলেছেন দাদা। টলতে টলতে, হাঁপাতে হাঁপাতে একটা রোয়াকে বসলাম দু'জন। একজোড়া হাঁপর চালু হলো।

হিরোদাদা বেশবাসের কথা একদম ভুলে গেছেন। আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম কাঁচিয়ে ফেলে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রাং দেবা না জানন্তি কুতো আমি…'

তনুশ্রী বললো, 'পরের দিনই গানে দেখা। আমার শরীরে ধাই ধাই করছে জ্বর, সারা গায়ে ব্যথা। তবু যাত্রা তো, আসতেই হলো। ভেবেছিলাম ব্যাপারটা বোধ হয় আকস্মিক, হঠাৎ ধরা পড়াটা ভুলতে কতক্ষণ। আগ বাড়িয়ে কথা বলতে গিয়ে থাপ্পড় খেলাম। হিরো সাহেব আমাকে না-দেখার ভান করে সোজা গিয়ে বসলো সাজঘরে, তার নিজের জন্য আলাদা করা বাক্সর ওপর। সারাটা সময় চোখ রাখলাম, কাছে পাশে গেলাম...' চুপ করলো তনুশ্রী। ওর নীচের ওষ্ঠ আর নরম চিবুক চিরল পাতার মতো থরো থরো কাঁপছিলো। মুক্তাবিন্দুর মতো দু'ফোটা টলটলে জলবিন্দু দেখা গেলো ওর চোখের কোলে। এবং তা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তেও দেখলাম।

বললাম, 'থাক এ-সব কথা। মনে আনলেই কষ্ট পাবি।'

'কষ্ট!' এক গলা কান্না নিয়ে আষাঢ়ের পলকা আকাশের আলোর মতন নিনি হাসলো তনুশ্রী। খানিক আগে দু' বিন্দু অশ্রু ঢালুর দিকে যে পথরেখা এঁকে, গালের সীমানা পেরিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলো রমনীর কোলে, সেই পথরেখা এখন ঝর্ণার মতো সতত বহমান। 'মেয়েদের মনে কষ্ট রাখতে নেই দাদা।'

আঁচল তুলে তনুশ্রী গালের ঝর্ণার রেখা মুছে ফেললো। বললো, 'নাই বা কথা বললো, ওকি একটু হাসতেও পারলো না আমার দিকে তাকিয়ে? তা হ'লেও তো স্বস্তি পেতাম।'

বললাম, 'জেনেশুনে আগুনে হাত দিয়েছিলি কেন? জানতিস না, ও বিবাহিত, ওর ছেলেপুলে আছে?'

'জানতাম।' তনুশ্রী ততক্ষণে প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসছে। ওষ্ঠ কাঁপছে না, চোখের কোণেও আর জল নেই। গলাটা কেবল কিছু আর্দ্র আর ভারীভারী। বললো, 'ঈশ্বর তো পট আঁকনেঅলা ব্যবসায়ী কুমোর নয় যে, মাত্র কয়েকটি ছবির মধ্যেই তার শিল্পকর্ম নির্দিষ্ট। ঈশ্বর এ-জগতে এমন কিছু মানুষের জন্ম দেন, যারা আজীবন এ্যাডভেঞ্চারাস, বিপদের প্রতিই তাঁদের যত মোহ। অর্থাৎ দুরন্ত জয়ের বাসনা নিয়ে তাদের জন্ম। উঠিতো এভারেষ্ট, পার হইতো প্রশান্ত মহাসাগর আর কি।' ধরা গলাটা এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে এলো। স্বচ্ছন্দে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে পারছিলো। 'আমিও দাদা সেই দলেরই; জেনেশুনে বিষ করেছি পান।'

যখনই কথা বলে তনুশ্রী তার সঙ্গে 'মন' কথাটার ব্যবহার থাকবেই। মন

বলা হয় যাকে, সে নাকি বিচিত্রতম কিছু। ঠিক যে কী, তা জানা নেই অবশ্যই 'এ যেন একটা বিশাল উদ্যানে অজস্র ফোটা ফুলের বনে প্রজাপতির আগমন। ছুঁই ছুঁই করে অথচ ছোঁয় না, বসিবসি করে কিন্তু বসে না। ডানায় ভর করে উড়তে-উড়তে অজস্র ফুলের মধ্যে কেন যে নির্দিষ্ট একটি ফুলই ওকে টানে, বোঝা যায় না। আমার মনটাও ঠিক তাই। কেবল আমার কেন, বোধ হয় প্রায় সকলেরই। কাটা হেরি ক্ষান্ত নহি কমল তুলিতে।'

'জেদ, তনু, মানুষকে শান্ত থাকতে দেয় না,' বললাম আমি, 'দেয় না স্বাভাবিক থাকতেও।'

'তাই।' তনুশ্রী বললো, 'কিন্তু একটা জায়গায় নিয়ে যায় তো দাদা? সে জায়গাটা স্বর্গই হোক, অথবা নরক। সংকোচ কিন্তু বাইগ্রস্ত বিধবার মতন। সব কিছুতে নেতি নেতি…'

তনুশ্রীকে তাই বলে কি প্রজাপতি বলবো? জেদি প্রজাপতি? রঙীন ডানা মেলে ও উড়ছে তো উড়ছেই। ক্লান্ত হলে ও হয়তো বসেছে, ডালে নয়, ফুলেই; সে-বসা সাময়িক। ক্ষণিকের বিরতি। কিন্তু লক্ষ লক্ষ ফুলের মধ্যে ও সবচেয়ে কাঁটাঅলা ফুলটাকেই বেছে নিয়েছিলো।

'আপনি বলছিলেন না, বিবাহিত? কিসে বিবাহিত হয়? কাকে বিবাহিত বলে? পুরুষের সামনে হাতে হাত রেখে মন্ত্র পড়ে, কি কাগজে সই-সাবুদ করে বিয়ে করাটাকেই যদি বিয়ে বলা হয়, তাতে আমার আপত্তি আছে। জীবনের এটাই শেষ কথা হলে দাদা এতো বিচ্ছেদ হতো না পৃথিবী জুড়ে। আপনি বলবেন, বিচ্ছেদের সংখ্যাটাতো নগণ্য। তা ঠিক। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানুন, বেশির ভাগ দম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যেই আত্মিক বন্ধন নেই। অশালীন একটা বাঁধনে ওরা বাঁধা থাকে শুচিবায়গ্রস্ত বিধবার মতো।' তনুশ্রী আমার দিকে তাকালো। কিছু গম্ভীর, কিছু জেদ ওর মুখে চোখে, নিঃশ্বাস তপ্ত। 'এই পুরুষটা কি আত্মদান করতে পেরেছে ওর স্ত্রীর কাছে? ওকি শান্তি পেয়ে শান্ত হয়েছে? হয় নি, সেটা ওর মুখ চোখ ব্যবহার থেকে ধরা যায়। আমি ওঁর মধ্যে আগুনের আকাঙ্ক্ষা দেখেছিলাম। ও পুড়তে চায়।' একবিন্দু মলিন হাসি ওর ওষ্ঠের ডগায় ফুটিফুটি, 'আর আমি, আমি চাই পোড়াতে। এ-একটা অদ্ভুত কম্বিনেশন তাই না?'

তনুশ্রীর জবানবন্দী থেকে জেনেছি ও প্রেম করেছে অনেক, কিন্তু প্রেমে পড়েছে এই একবারই। সেই সৌভাগ্যবান পুরুষটা এই নায়ক। 'যাত্রায় আমার

আগের কথা নাই বা বললাম দাদা, ও বয়সের চাপল্য-উপলব্ধির অগভীরতা ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু যাবতীয় প্রেমের নন্দনকানন শেষ পর্যন্ত হলো চিৎপুর। যাত্রাদলের একজন চুক্তিপত্র করার আছিলায় বারকয়েক আমার বাড়িতে গতায়াত করতে করতে শেষ পর্যন্ত বেচারী নিজেই ধরা দিলো। একটা খামে ভদ্রলোক অ্যাডভান্সের টাকা দিয়েছিলেন। জানতাম না তার ভাঁজে ভদ্রলোক নিজের মনটাও আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'টাকার ভাঁজে মন! বলিস কী রে!' আমি অবাক হই।

'ঠিক মন না, মনের ছবি; চিঠি। তনুশ্রী অদ্ভুত ভ্রূভঙ্গি করে হেসে উঠলো, 'কী লিখেছিলো জানেন?' চোখ ঘুরিয়ে গম্ভীর হলো তনু, 'কানের সঙ্গে মাথা। অর্থাৎ আশাতিরিক্ত বেতন, পরিবর্তে কাজ আর কাম দুই-ই চাই। টাকার দামে কিনতে চান প্রেম, ছিঃ!'

তনুশ্রীর জীবনের যে আসল গোপন ঘরটা তার দুয়ার সে খোলেনি কোনোদিন। বলেছিলো, 'সবটা জানতে চাইবেন না, শুনতেও নয়। সে-কথা দাদা, বলে শেষ করা যায় না; সে এক চিৎভারত।'

'চিৎভারত! সেটা আবার কী?'

'মহাভারতের 'মহা'টা তুলে নিয়ে যা থাকলো, তা চিৎপুরের এর চিৎ-এর পরের জায়গায় বসিয়ে দিন, একটা এপিক হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা মানে হয়ে যাবে অর্থাৎ যা নেই ভারতে তা নেই ভারতের ঠিক উল্টোদিক। অর্থাৎ চিৎপটাং। যা নেই চিৎপুরে তা নেই ভারতে।'

তনুশ্রীর প্রেম যখন খুব ঘন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই দক্ষিণবঙ্গের যাত্রার আসরে দুর্ঘটনা ঘটলো।

'রাগে দুঃখে অভিমানে ভেবেছিলাম কোনো সম্পর্কই আর রাখবো না কিন্তু ঘটনার পরের দিনই আমাকে কাঁদতে হলো। কাঁদলামই যদি, তবে ছেড়ে যাবো কেন? ঠিক করে নিলাম, জগৎটা যদি উল্টেও যায়, আমার অধিকার আমি তুলে নেবো না কিছুতেই। কেন নেবো?'

তারপর যতদূর আমার মনে পড়ে, একটা বছরও ঘুরলো না, অলক্ষ্যে বিধাতার বিচার হয়ে গেলো। আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তনুশ্রীকে যেতে হলো বিধাতার অধিকারে।

গোটা যাত্রাপাড়া জুড়ে তনুশ্রীর মৃত্যু নিয়ে যতো না গুজব ও গুঞ্জরণ হয়েছিলো,

তার এক সহস্রাংশও দেখিনি শোকের ছায়া। তনুশ্রীর শবদেহ যখন মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো, আমার তো মনে পড়ে না সেখানে যাত্রা ইনডাসট্রির জনা-তিনেকের বেশি মানুষ দেখেছি। এমন কি, যে-নায়ককে তনু আপন হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়ে পরম সমাদরে পুজো করেছিলো, পরদিন সেই দেবতার মুখে একটা বিষন্ন রেখাও দেখতে পাইনি। শ্মশানে না যাক, শোক প্রকাশে অসুবিধে কোথায় ?

বিজয় মিত্র বলেন, 'চিৎপুরটা একটা গাড়ির মতন। সে ছুটছে তো ছুটছেই। তাই তার যন্ত্রপাতিগুলো ওই গতির তীব্র নেশায় মশগুল। দুঃখ করার কিছু নেই।'

'পৃথিবীতে এমন কিছু ভাগ্যবানকে ভগবান পাঠান, যাঁরা অজস্র প্রেমের ষোড়শ উপাচারে পূজিত হয়েও অভিশপ্ত। ওদের মধ্যে কী যে থাকে, মানুষের পক্ষে তা আবিষ্কার করাই কঠিন। রূপ ? না। ব্যক্তিত্ব ? না। দেহ-সৌষ্টব ? তাও না।' তনুশ্রী বলেছিলো, 'কী যেন, কেমন যেন একটা কিছু থাকে। ওই যে রাস্তাটাস্তা সারাবার সময় টাঙিয়ে দেওয়া হয়, "সামনে বিপদ"—অনেকটা তেমনি নোটিশ গায়ে মেখে এদের বিচরণ। আর আমার মতো মেয়েরা ওই বিপদকে জয় করতেই পাগলের মতো এগোয়। রহস্য উদ্ঘাটনের একটা প্রবণতা মানুষের মধ্যে থাকে বলেই এতো অঘটন ঘটে, ঘটছে এবং ঘটবেও।'

তনুশ্রীর কথায় আবার সেই মন। মন নিয়ে টানাটানি। শেষ যেদিন দেখা হয়েছিলো, তনু বললো, 'দেখুন দিকি মনের কি কারবার ! একটা আসরে গান, নাম করবো না। স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাসায় হিরো হিরোইনের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। স্কুলেরই চ্যারিটি। ছিলামও তোফা। নতুন তোলা কোঠাবাড়ির একটা ঘর, খাট, আলো, পাখা, আলমারি, বিছানা। একটা আসরে তিন দিনের গান। সুতরাং বাড়ির লোকরা অল্পেতেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। মাস্টার মশাইয়ের পুত্রবধূর সঙ্গে বেশ ভাবও জমে উঠেছিলো। আমাদের হিরোর প্রতি দেখলাম তার পর্বত-প্রমাণ ঘৃণা। সেই বধূই বলেছিলো, বছর পাঁচেক আগে এই স্কুলের একজন শিক্ষকের একমাত্র কন্যা নাকি এই হিরোর জন্যেই গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

তনুশ্রী বললো, 'ঘটনাটা শোনবার পর আমার কী মনে হয়েছিলো জানেন ?'

'কী !'

'আসলে সকল যুবতীর মনেই নায়ক জয়ের একটা বাসনা সুপ্ত থাকে। অবচেতন মনের তুলিতে আঁকা সেই ছবিটার সন্ধান সারাজীবন ধরেই করে যায়। কোথাও যদি সেই ছবিটার সঙ্গে কারও এক-আধটু মিল খুঁজে পায় সেখানে সে ঝাঁপিয়ে পড়বেই পড়বে।'

'হয়তো।'

'হয়তো নয়, সত্যি। বউটি আমাকে বলেছিলো, মেয়েটি তার হৃদয়-মন সঁপে দিয়েছিলো নায়ককে। না দেওয়ার জ্বালা থেকে দেওয়ার যন্ত্রণা অনেক বেশি। অনেক। নিবেদন করলেই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। এই আকাঙ্ক্ষাটাই ভয়ানক।' তনুশ্রী আমার মুখের দিকে তাকালো, 'দেওয়া মানেই বিলীন হওয়া। আর মন যদি নিবেদিত হয় দাদা, দেহটা আলাদা থাকতে চায় না কিছুতে। সমর্পনেণ পাওনাটুকু সে ষোলো আনা বুঝে নিতে বদ্ধপরিকর হয়।'

একজন সাধারণ অভিনেত্রীর কথা আমাকে অভিভূত করেছিল। এক শিক্ষিত সাধু একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'মানুষের কণ্ঠে কথা বলে মানুষ নয়, মহাকাল।' কথাটা আমি বিশ্বাস করি। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, 'মন শরীর-বদ্ধ হতে পারে না। সে বাইরে, মহাকাশ থেকে আসে।' এই মনই যদি কথার উৎস হয়, তবে বিশ্বাস না করে উপায় কি, মানুষের কণ্ঠে কথা বলেন অন্য কেউ। অর্থাৎ কথা বলান। তাই তনুশ্রীর কণ্ঠে কে কথা বলছেন আমি ভাবছিলাম। মহাকাল ? পরমেশ্বর ?

'মন দিয়েছিলো বলেই দেহদানে সংকোচ আসে নি।' তনুশ্রী বলেছিলো। 'শয্যাসুখ যতই স্থূল হোক না কেন দাদা, বড় লোভনীয়। এই নশ্বর ক্ষুধার্ত দেহটা তৃপ্তির ঘাট খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।. তাই মেয়েটি আত্মসমর্পণ করেছিলো যাত্রার নায়কের কাছে। আত্মদানটা যদি সীমিত হতো তবে তো ঘটনাটাই ঘটতে পারতো না। কিন্তু প্রাপ্তির নেশাটা অনেকটা গঙ্গার জোয়ারের মতো। সেই জোয়ার এলে একদিন হাতেনাতে ধরা পড়লো। হয়তো তিরস্কৃতও হয়ে থাকবে, অথবা লাঞ্ছিত। না হ'লে পরম পাওনা হাতের কাছে পেয়েও কেন মেয়েটির মন গেরুয়ার রঙে রঙীন হলো। কেন বেছে নিলো উদার আকাশের নীচেকার অনন্ত পথের আশ্রয় ?'

'আমি ঠিক একমত হতে পারলাম না রে।' বাধা দিলাম তনুশ্রীকে। 'এত অল্প সময়ে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে প্রেম বলা বোধ হয় ঠিক না,

ওটা দেহগত, রূপজ মোহ। প্রেম কি অত সহজে সত্তাকে সমর্পণ করতে পারে?'

'হয়তো পারে, হয়তো পারে না। কে জানে?' তনুশ্রী যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছিলো। কেমন বিমনা, অন্যমনস্ক, ডুবন্ত; দৃষ্টি উদাস। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকালো আমার দিকে, 'জন্মান্তর বিশ্বাস করেন আপনি?'

'করি।' বললাম।

'তবে?'

'তবে কী?'

'দর্শনমাত্র প্রেম সব সময়ই দেহসর্বস্ব হয় না, কামজ তো নয়ই। মেয়ে হলে না, আপনি বুঝতে পারতেন বস্তুটা কী?'

এ-তর্কের শেষ নেই; যেহেতু শেষ নেই কিছুরই। আমি স্থির করলাম আর কথা বাড়াবো না। এটাকে এক ধরনের পরাজয়ও বলা যেতে পারে। তনুশ্রীর সব যুক্তিকে কি আমি খণ্ডন করতে পারছি?

'সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানেন? ওই যে ভদ্রমহিলা, প্রধান শিক্ষকের পুত্রবধু, যার অনেক ঘৃণা নায়কের প্রতি? ক্রমে দেখা গেলো, সেই বধূটি কিছুতেই আমাদের ঘর ছাড়তে চান না। যতক্ষণ নায়ক থাকেন ততক্ষণ নট নড়ন চড়ন। নায়ক না থাকলে তার আর আমার সম্পর্ক জানতে চায়। আমি কিন্তু দাদা বুঝেছিলাম, মহিলা মরেছে। স্থূল আত্মহত্যা অবশ্যই করেনি, কিন্তু যা ঘটেছে তাকেও তো আত্মহত্যাই বুঝি বলা যায়। কিন্তু একে কি সত্যি আত্মহত্যা বলা চলে? যদি বলি দাদা, এটাও আত্মনিবেদন, আপনার বলার কিছু আছে কি?'

জবাব দিই নি। তনুশ্রীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর বারবার আমার মনে হয়েছে, ও কথাপ্রসঙ্গে বারবার কেন আত্মহত্যায় এসে পৌঁছতো। তবে কি আত্মদান আর আত্মহত্যায় কোনো তফাৎ নেই?

কে যেন আমাকে বলেছিলো, তনুশ্রীর সংসার ছিলো স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখের। 'কিন্তু সকলের সুখ দাদা, সর্বত্রই থাকে না। তাই না পৃথিবী জুড়ে এত অঘটন।'

———

চার

হঠাৎ হেসে উঠলেন বড় ফণিবাবু, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ। চোখের কোল ভেজা কিন্তু মুখে হাসির ছটা। বললেন, 'বছর দশেক আগে যাত্রা করতে গিয়েছি টাটানগরে। পুজোর মরশুম। ভিড়ও খুব। প্রথম দিনের যাত্রা নিয়ে টাটায় পড়ে গেলো সাড়া—পরদিন দুপুরে রান্নাবাড়িতে আমরা সার-বেঁধে খেতে বসেছি, দেখি অদূরে দাঁড়িয়ে কিছু কৌতূহলী ছেলেমেয়ে আমাদের দেখছে। কী কথাবার্তা হচ্ছিলো কে জানে, হঠাৎ ওর মধ্য থেকেই একটি মেয়ে, বালিকা, চোখ দু'টো বড় বড় করে আমাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাচ্ছে আর বলছে, 'দেখ দেখ, যাত্রাঅলারা কেমন মানুষের মতো ভাত খায়।'

আমি হেসে উঠলাম।

শোভাবাজার রাজবাড়ির যাত্রা উৎসব করে যে সাফল্য অর্জন করেছিলাম, সেই চোখেই আমি বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখেছি। কলকাতা জয় করেছি সুতরাং চলো দিল্লী। জানাশোনা তেমন কেউ নেই একমাত্র নয়াদিল্লীর কালীবাড়ির লোক-জনদের ছাড়া। ওঁদেরই লিখলাম। জবাব এলো না। আবার পত্রাঘাত। চেষ্টা করি হয় না। একসঙ্গে অতগুলো টাকার ঝুঁকি নিতে সাহস পায় না কেউ। চিঠি চাপাটি চালাতে চালাতে গেলো কয়েকটা বছর। অবশেষে আমার এক বন্ধু, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নয়াদিল্লী কালীবাড়ি থেকে চিঠি লিখলেন যে, তিনি নয়াদিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। যাত্রা তাঁর বড়ই প্রিয়। কার্যকরী সমিতির সঙ্গে কথাও হয়েছে। তাঁরা খুব একটা গড়-রাজি নন, তবে প্রার্থিত অর্থ প্রদানে তাঁরা অক্ষম। সাতদিনের যাত্রার জন্য বড়জোর তাঁরা এগারো হাজার টাকা দিতে পারেন। থাকার জায়গা

খাওয়া দাওয়া তাঁরাই দেবেন। সিঙ্গল ফেয়ার ডাবল জার্নির ব্যাপারটা আমাদের নিজেদের করে নিতে হবে। চিঠিপত্রে, ব্যক্তিগত সাক্ষাতে কথা চালাচালি করতে লেগে গেলো একটি বছর। অবশেষে চুক্তি হলো। এগ্রিমেণ্ট পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এসে গেল এ্যাডভান্সের টাকাও। ইতিমধ্যে বেঙ্গলী ক্লাবের নতুন নির্বাচন হয়ে গেছে। সেক্রেটারী হয়েছেন রঞ্জিত ঘোষ। সহঃ সম্পাদক প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বতন সেক্রেটারী নন্দবাবু ভোটে প্রমোশন পেয়েছেন। তিনি নির্বাচিত হয়েছেন সহঃ সভাপতি।

নতুন কমিটি প্রাক্তন সমিতির সিদ্ধান্তকে বানচাল করেনি। চুক্তিক্রমে উল্লিখিত সমস্ত শর্তই তাঁরা মেনে চললেন। এখানে বলে রাখা ভালো হরিপদ, বায়েন সত্যাম্বর অপেরার চাকরী ছেড়ে দিয়ে যোগ দিয়েছেন কিষাণ দাসগুপ্ত মশাইয়ের নাট্যভারতী দলে। অভিনেতা পালাকার শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত এই দলটি কিষাণবাবু প্রথমে লীজে নেন, পরে কিনে নেন সত্ত্ব। নট্ট কোম্পানীর ডেপুটি ম্যানেজার আশুতোষ সাহা ওই দল ছেড়ে জয়েন করেছেন নাট্যভারতীতে। বড়ফণিবাবু, জয়শ্রী মুখার্জী, মোহন চ্যাটার্জী, নমিতা, দীপেন চ্যাটার্জী, ক্ষমা ভট্টাচার্য, শান্তি হাজরা, সীমা দাস প্রভৃতি যোগ দিয়েছেন শিল্পী হিসাবে।

আমি কতগুলো লক্ষ্য স্থির করে নিলাম। [এক] যেহেতু কিষাণ দাশগুপ্ত বলতে গেলে আমার সহকর্মী, অর্থাৎ নিজেও একজন সাংবাদিক, এবং বন্ধু সেহেতু এই দলটিকেই আমি দিল্লী নিয়ে যাবো। [দুই] যাত্রা সুধী ও শিক্ষিত মহলের কাছে তখনও অচ্ছ্যুৎ, সুতরাং তাকে জাতে তুলতে হলে সরকারী স্বীকৃতি আদায় করে নিতে হবে। [তিন] আমাদের রাজ্য সংগীত আকাদেমি যাত্রাকে নাট্য বলে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত। অহীন্দ্র চৌধুরী মশাই যেন রবীন্দ্র-ভারতীর ডীন অভ ফ্যাকাল্টি। তাঁর অভিনয় জীবনের শুরুও কিন্তু যাত্রা দিয়েই। তাই বলে তিনি যাত্রাকে জাত-শিল্প বলে স্বীকার করে নেওয়ার পক্ষপাতী নন। তাই নিয়ে সাধন ভট্টাচার্য এবং অহীনবাবুর সঙ্গে আমার প্রবল বচসা শুরু হয়। ওঁরা বলেন, যাত্রা আসলে ফোক কালচার, ফোক প্লে - তাকে নাটক বলা চলে না। আমার যুক্তি ছিলো, যাত্রা আসলে মডার্ণ আর্ট। যেহেতু সে থেমে থাকে নি ; সময় সভ্যতা মানুষের রুচিকে অবলম্বন করে তার অবয়ব, বক্তব্য, উপস্থাপনা, রীতি পালটাচ্ছে, এবং জনজীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্র ডাইরেক্ট—সেহেতু একে নাট্য বলে স্বীকার করতে অপরাধ কোথায় ?

পাল্টা যুক্তি ওঁরা খাড়া করতে পারেন নি অবশ্যই কিন্তু যাত্রাপালাকে নাটক বলে স্বীকারও করে নেন নি। সুতরাং আমি এই সংকল্প নিলাম যে, প্রয়োজনে সংগীত নাটক আকাদেমির সঙ্গে ফাটাফাটি করতে হয় তাও করবো। কিন্তু যাত্রাকে আকাদেমি দিতেই হবে। একটা আকাদেমি চিৎপুরে আনতে পারলে যাত্রার ওপরকার অবজ্ঞাকে ধূয়েমুছে ফেলা যাবে এবং রবীন্দ্র ভারতীও যাত্রাকে 'নাট্য' আখ্যায় ভূষিত করতে বাধ্য হবেন। পুরস্কার পাওয়ার মতো লোক অনেক। যেমন সূর্যকুমার দত্ত, ফণি মতিলাল, ব্রজেন্দ্রকুমার দে, ভোলা পাল, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কিন্তু বড়ফণিবাবুকেই বেছে নিলাম। তিনি শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম। তাছাড়া নাট্যভারতী দলের সঙ্গেই তাঁকে দিল্লী নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

আমার মনোবাসনাগুলো মনেই পুষে রেখেছিলাম। কাউকেই বলিনি। নাট্যভারতীকে নিয়ে রওনা হলাম মে মাসের আধাআধি। কিষাণবাবুকে আগে যেতে বললাম। তিনি ওখানে গিয়ে উদ্বোধনের দিন একটা সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন যাতে করেন। কিষান দাশগুপ্ত অতএব তাঁর যাত্রা-কন্যাকে নিয়ে দুদিন আগেই দিল্লী রওনা হলেন। নন্দবাবুকে আমি চিঠি লিখে দিলাম, কিষানবাবুকে সাহায্য করতে। একখানা গোটা বগী পাওয়া গেলো জনতা এক্সপ্রেসের। এক বগীতে পাঁচটি কামরা। হরিপদ সাত তাড়াতাড়ি একটা বাঙ্ক দখল করে বেডিং পেতে নিলো। মাঝের এক কামরায় আমি সস্ত্রীক, সকন্যা একটি গোটা সীট জুড়ে বসলাম। ঠিক মুখোমুখি বসলো, আশুতোষ সাহা, জয়শ্রী মুখার্জী, জয়গোবিন্দ রায় চৌধুরী এবং ছোট তপন। রাত্রে আমি বাঙ্কে ঘুমোলাম। আমার স্ত্রী কন্যাসহ নীচের সীটটাতে।

সকাল থেকেই যে যখন পারছে আমাদের কামরায় আসছে গল্প করতে। তিন বছরের মেয়েটাকে আদর করছে। গল্প করছে। বেলা যতো বাড়ছে গরম বাড়ছে ততই। এগারোটা নাগাদ বাথরুমের ট্যাপ খুলে দেখি, জলে আগুন। গামছা ভিজিয়ে ভিজিয়ে কোনোরকমে স্নান করে নিলাম। ডাইনিং-কার থেকে মীল দিয়ে গেলো। খাওয়া খাত্তির পাট চুকিয়ে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার ব্যবস্থা করছিলাম। এমন সময় স্টেশন, গোলমাল।

গাড়ি আরা জেলায় পড়েছে বুঝতে পারলাম। রিজার্ভ বগীর দুই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। ভেতরে সবাই বাঙালী। দরজা খোলা না পেয়ে কিছু

যাত্রী জানলার কাছে গোলমাল করছিলো। কেউ বোধ হয় কিছু বলে থাকবে, ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে হামলা শুরু। স্টেশনের যাবতীয় যাত্রী, এবং অন্য কামরার যাত্রীরা লেগে গেলো জানলা ভাঙার রণে। থান ইটের ঘায়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়তে লাগলো জানলার কাচ। মনে হলো গোটা গাড়ির যাত্রীরা কাচ-ভাঙা জানলা দিয়ে মালপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে পটাপট ঢুকে পড়লেন। গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো একবার। কোন কামরা থেকে যেন চেন টানা হলো। মুহূর্তের মধ্যে গোটা বগীতে গাদাগাদি, ঠাঁসাঠাঁসি। তিল রাখার জায়গা পর্যন্ত নেই।

মে-মাসের শেষ, জুনের মধ্যকার বিহার, কে না জানে, দ্বিপ্রহরে তপ্ত অঙ্গারের চেয়েও বেশি তাপিত। লু বইছিলো বাইরে; ভাঙা জানলার ফাঁকফুক দিয়ে এই গনগনে আঁচ কামরার মধ্যে আছড়ে পরতে লাগলো। বাষট্টি জনের বগীতে ছয়শো লোক। আগ্রাসীরা ভেতরে ঢুকে গালাগাল করছিলো। জোর করে সীট দখল করতেও শুরু করলো। সকলকে আমি প্রতিবাদ করতে বারণ করলাম। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে দেখি অত্যাচার আরও বাড়ছে। এমন সময় হঠাৎ একটা জিগির। আগ্রাসীরা থমকে গেলো। আমরা গলা বাড়িয়ে থাকলাম। দেখি শান্তি হাজরা একটা পাউরুটি কাটা ছুরি বাগিয়ে ধরে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে বগীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিছিল করেছে গোটা পাঁচেক চাকর আর দু'জন অল্প বেতনের শিল্পী। 'আয় শালা, এগিয়ে আয়, কচুকাটা করে ছাড়বো এক-একটাকে...' শান্তি ঝুটি ঝাঁকিয়ে, মুখের চেহারাটা বীভৎস করে ছুরি তুলে রীতিমতো লাথি-ফাথি মারতে মারতে আসছে।

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলো আগ্রাসী যাত্রীরা। কিন্তু যখন দেখতে পেলো অস্ত্র হিসাবে এঁদের সম্বল কেবল একটা লোফ-কাটার, সংখ্যাতেও এঁরা মাত্র জনা ষাটেক লোক, তখনই শুরু হলো অন্য চেহারা। হঠাৎ ওরা দলবেঁধে ঝাপিয়ে পড়লো শান্তি এবং তার মিছিলের ওপর। মারপিট, খিস্তি, ধ্বস্তাধ্বস্তি। যন্ত্রণা কাতর শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। শুনতে পারছিলাম কান্নাও। জানলায় গলা বাড়িয়ে হাত নেড়ে গার্ড সাহেবকে গাড়ি ছাড়ার জন্য অনুরোধ করলাম। ছেড়েও দিল গাড়ি আবার থেমেও গেলো—'কে কাঁদছে! ভিড়ের মধ্যে এগোলাম। দেখি ক্ষমা ভট্টাচার্য বুক চাপড়ে কাঁদছে। কাকে নিয়ে

গেলো। হুড়মুড় করে আমি দরজার দিকে এগোচ্ছি। দেখি জনা তিরিশেক লোক একজন শিল্পীকে চক্রাকারে ঘিরে বেদম মারছে। আরও কয়েকটি ব্যূহ দেখলাম। একই আকারের। একজন চাকরকে দেখি রেল-লাইনের ওপর ফেলে থান ইঁট দিয়ে থ্যাৎলাচ্ছে।

একছুটে স্টেশন মাস্টারের ঘরে গেলাম। প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপছি। সাহায্য চাইলাম। ভদ্রলোক দেখি নিজেও কাঁপছেন। বললেন, 'ছোট স্টেশন, প্রোটেকশন ফোর্স কি রেল-পুলিশ নেই। স্টাফ আছি আমরা জনা সাতেক। ওই সবের সামনে আমরা উড়ে যাবো।' ভদ্রলোক টেলিফোন কানে গুঁজে ট্যাপ করছেন আর অবিরাম হ্যালো হ্যালো করে যাচ্ছেন। বললাম, 'কাছাকাছি রেলপুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না?' 'তাই চেষ্টা করছি,' ভদ্রলোক জানালেন। ওদিকে প্ল্যাটফর্ম, রেল লাইন জুড়ে ভয়াবহ প্রহারের নারকীয় চিত্র, দুপুরের রোদে চামড়া-পোড়ানো আগুন, ইঞ্জিন থেকে ড্রাইভার লাগাতার হুইসেল বাজিয়ে চলেছে।

রাগে আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে স্টেশন মাস্টারের হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিলাম। 'থানাতে একটা খবর পাঠাতে পারেন নি?' ভদ্রলোক বিপর্যস্ত গলায় বললেন, 'পাঠিয়েছি।' আমি রিসিভার কানে গুঁজে বললাম, হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো···ওমা এ যে দেখছি কেবলই কটকট করছে। যেন আমাকে উপহাস করে যন্ত্রাসুরটা বলছে—'গেলো, গেলো, গেলো···।' যত ট্যাপ করি, উত্তর একই।

রিসিভারটা আমি আছড়ে ফেললাম টেবিলের ওপর। ধুত্তোর। বিভ্রান্ত ভয়ার্ত স্টেশন মাস্টারকে-বললাম, 'আসুন, আপনি একবার স্বচক্ষে দেখে যান।' জোরে একটা হাঁক দিলেন ভদ্রলোক। টালিক্লার্ক, পয়েন্টসম্যান, পোর্টার মিলিয়ে জনা চারেক লোক ছুটে এলো। আমরা ছয় জন মারপিট থামাবার কাজে লেগে গেলাম। হঠাৎ শুনি, দূর থেকে কে বাঁচার করুণ আবেদন জানাচ্ছে। কে? তাকিয়ে দেখি যে-চাকরটাকে রেল-লাইনে থ্যাতলানো হচ্ছিলো তার রক্তাক্ত দেহটা হাতে হাতে শূন্যে তুলে একদল ক্ষিপ্ত মানুষ স্টেশনের উল্টো দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ছুটে যাচ্ছিলাম, স্টেশনমাস্টার আমাকে জাপটে ধরে ফেললেন। বললেন, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তার চেয়ে গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি, এঁদের নিয়ে আপনি রওনা হন।'

দেখলাম, শান্তি হাজরাকে গাড়িতে তোলা হয়েছে। তিন চারজন চাকর ধুঁকতে ধুঁকতে উঠলো গাড়িতে। প্ল্যাট-ফরম ফাঁকা হয়ে আসছে। আগ্রাসীরা পালাচ্ছে।

বললাম, 'ওই ছেলেটার কী হবে?'

গার্ড সাহেব বললেন, 'ভাববেন না, ওকে ঠিক মাস্টারবাবু দিল্লী পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। এখনই গাড়ি ছেড়ে না দিলে বিপদ হবে।' সঙ্গে সঙ্গে হুইসেল বাজিয়ে, সবুজ ফ্ল্যাগ দেখিয়ে গাড়ি ছাড়লেন গার্ড সাহেব।

শান্তি হাজরার অবস্থা সত্যিই ভয়াবহ। আর একজন অভিনেতারও গা-গতর ফেটে রক্ত পড়ছে; মুখ চোখও। বেচারী প্রলাপ বকে যাচ্ছে: মারো ধরো কাটো...

আমাদের যার যার কাছে যা ছিলো, তাই নিয়ে মোটামুটি একটা ফার্স্ট এইড দেওয়া হলো। পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই ছুটে এলেন একজন ডাক্তার, সঙ্গে স্টেশনমাস্টার। বললেন ঘটনাস্থল থেকে স্টেশন মাস্টারমশাই এখানে ডাক্তার মজুত রাখতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

দিনের বাকি অংশ এবং গোটা রাতটা একটা বিষণ্ণ ঘোরের মধ্যে কেটে গেলো। সকাল দশটার পর নয়াদিল্লী স্টেশন। আমাদের নিতে আসছেন কিষাণবাবু, আমি গোটা ঘটনাটা বর্ণনা করলাম। নিয়ে যাওয়া চাকরটার কথা বললাম। কিষাণবাবু বললেন, 'একদম মন খারাপ করবেন না, ও ঠিক পরের গাড়িতেই এসে যাবে দেখবেন।'

নয়াদিল্লী কালীবাড়ির পেছনের মঞ্চগৃহটি তখনও অর্ধসমাপ্ত। এর সামনে, মন্দিরের পেছনের জায়গায় দিল্লীমার্কা প্যাণ্ডেল বসেছে। মন্দিরের বাঁ-পাশের দেওয়াল ঘেঁষে বসেছে রান্নাবাড়ি।



জয়দা অর্থাৎ জয় গোবিন্দ রায়চৌধুরী ডাক্তারের সঙ্গে ছুটলেন ওষুধ আনতে। ফিরেও এলেন ওষুধপত্র নিয়ে।

নয়াদিল্লী কালীবাড়ির বারো নম্বর ঘরে, আমরা দু'জন মুখোমুখি বসে।
আমি দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম নিতে বিছানায় এসেছি, এমন সময় এলেন বড় ফণিবাবু। বললেন, তাঁকে একটু সময় দিতেই হবে। আমি চেয়ার টেনে বসতে দিয়েছিলাম, বললেন, 'একটু সময় বিরক্ত না করে পারছি না।'
বললাম, 'কাল বিকেলে চওয়নজী আর নন্দিনী শতপথী আসবেন, আপনাকে দেখতে। আপনি কিন্তু ওই সময়টাতে বাইরে যাবেন না।'
বড় ফণিবাবু, এই প্রথম দেখলাম, পকেট থেকে এক প্যাকেট চারমিনার বের করলেন। খুলে একটা সিগ্রেট বাড়িয়েও দিলেন আমার দিকে। আমি অবাক। বললাম, 'আজ হঠাৎ সিগ্রেট।'
বড় ফণিবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'জায়গাটা যে রাজধানী সেটা ভুলতে পারছি কোথায়? এখানে এলেই মেজাজটা কেমন নবাব নবাব হয়ে যায়। দিন দুই ধরে দেখছি, সকলেই বিপুল কেনাকাটা করছে। আমি বুড়ো মানুষ, বাড়িতে বয়স্কা সহধর্মিণী, মেয়েটা শ্বশুরালয়ে—কার জন্যে কী কিনি বলুন তো? তাই খোসমেজাজে সামনে থেকে এটা কিনলাম। আপনি ভালবাসেন, আমিও একটু না হয় নবাবী করে নি।'
বললাম, 'তা হলে আপনি আমারটা খান মাস্টারমশাই, আমি আপনারটা।'
বাধা দিয়ে বড ফণিবাবু বললেন, 'অত্যন্ত সৎ যুক্তি। কিন্তু এতো আমি খাই না। এক আধটা খাবো কথা কইতে কইতে। বাদ বাকিটা আপনার।'
আমিও নাছোরবান্দা। বললাম, 'সেটা না হয় পরেই হবে। আপাততঃ আমার আব্দারটা থাক না বহাল?'
'থাক।' ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ আমার প্যাকেট থেকে একটা সিগ্রেট তুলে নিলেন। আমি নিলাম ওঁর প্যাকেট থেকে। দেশলাই জালিয়ে, সিগ্রেট ধরালাম, ধরিয়ে দিলাম।
এক মুখ ধোঁয়া না গিলে, মুখ থেকে বার করে দিলেন। অল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন জলন্ত সিগ্রেটের দিকে। একটু আনমনা হলেন, বললেন, 'জলজ্যান্ত বস্তুটা কেমন ছাই হয়ে যায়। মানুষের জীবনটাও তেমনিই, কী বলেন?'
'হ্যাঁ, অনেকটাই তাই।'
'দিল্লিতে যখন নিয়ে এসেছেন, তখনই বুঝেছি একটা কিছু মতলব আছে আপনার করবেন।'

'চেষ্টা করছি।' আমি বললাম।

'ওইটাই আসল'। ফণি বিদ্যাবিনোদের চোখ দুটো কেমন ছলোছলো হয়ে এলো। 'ভালো নেতৃত্ব না পেলে মুমূর্ষু শিল্পের পুনরভ্যুদয় হয় না, সবল শিল্পও কাহিল হয়। জানেন, আমি এখন ভরসা পাই। যাত্রা করি বলে সর্বত্র সম্মান মিলতো না। একএক সময় ভাবতাম, অনাদর আর উপেক্ষার ভার বহন করতে করতেই বুঝি জীবন দীপটা একদিন হঠাৎ নিভে যাবে। শোভাবাজার রাজবাড়িতে আপনার বিশাল কর্মযজ্ঞ দেখে ভেবেছি রবীন্দ্রনাথ সত্য, তাঁর রথের রশি সত্য। সেই রশিতে আপনি প্রথম টান দিলেন।'

বললাম, 'সিগ্রেটটা তেঁতো লাগছে না?'

আমার কথার জবাব দিলেন না বড় ফণিবাবু। বললেন, 'জানেন তো আগে জমিদার বাড়িটাড়িতেই যাত্রা হতো। প্রজারা হতেন দর্শক। বিনি পয়সায়। একপাশে চিকের আড়ালে বসতো মেয়ে বউরা। জমিদারবাবু আসরের সামনে ফরাসের ওপর মখমলের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে গড়গড়া টানতেন। যাত্রা দেখা কি শোনা তার বড় একটা হতো না। গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে ভুরুক টানতেন আর প্রজাদের মুখচোখ লক্ষ্য করতেন। দেখতেন প্রজারা কতক্ষণ যাত্রা দেখে, কতক্ষণ তাঁকে। শুনবার চাইতে শোনাবার গর্বটা বেশি আর কি। যদি কোনো প্রজা যাত্রায় অভিভূত হয়ে রাজাবাবুকে দেখতে ভুলে গেছে, ব্যাস পরদিন তার বাড়িতে পাইক গিয়ে হাজির। বকেয়া দু' বছরের খাজনা দে। এতো বড় সাহস তোর, আমার দিকে না তাকিয়ে যাত্রা দেখা! ফ্যাল, ফ্যাল কড়ি।'

আমি হেসে উঠলাম।

সেই যে চাকরটা, যাকে স্টেশন থেকে ইলোপ করে নিয়ে গিয়েছিলো তার নাম রতন। সেদিন সে ফিরে এলো না। সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু হলো, শান্তি হাজরার জ্ঞান নেই। ক্ষমা নাওয়া-খাওয়া ভুলে তাকে শুশ্রুসা করে যাচ্ছিলো। ওদিকে আর এক দৃশ্য প্রথম দিনের যাত্রা 'মা ও ছেলে' পালায় শান্তির জায়গায় ডুপ্লিকেট সাজানো হলো।

বেলা যায়, দ্বিপ্রাহরিক দিল্লীর তপ্ত আঁচ কমেছে। হাওয়া দিচ্ছিলো অল্প অল্প। মিঠে হাওয়া। প্রাণ জুড়লো, কিন্তু মন? নাট্যভারতীর যাত্রা দেখতে সেদিন দিল্লীর তাবৎ সমালোচক উপস্থিত। বিখ্যাত ব্যক্তিরাও। টেলিভিশন, রেডিও-ও বাদ যায় নি।

বহুবার দেখা পালাটা মন ভাল থাকলে পুরোটাই দেখতে পারতাম। ছুটি দৃশ্য দেখার পর মন্দিরের সামনের একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। চুপচাপ। ভাল লাগলো না। হলঘরে ঢুকে দেখি শান্তি হাজরা তখনও অচৈতন্য।

বেরিয়ে আসছি, পেছন পেছন দেখি আশুবাবু আসছেন। একটা বেঞ্চেই দু'জন বসলাম। বললেন, 'মনমরা দেখাচ্ছে কেন অধিকারী সাহেব ?'

বললাম, 'রতনের কোনো খবর এলো না'

আশুতোষ সাহা, বি. এ. বি. এল. বললেন, 'মন খারাপ করবেন না। যাত্রার দলের এটাই নিয়ম। ঠিক বাস চলার মতন। পেছনে কী থাকলো, কে থাকলো, কেন থাকলো কেউ ভাবেনা।'

'ওকে তো মেরেও ফেলতে পারে', আমি বললাম আশুবাবুকে। 'যে-ভাবে থেৎলেছে হয়তো সারা জীবনটাই ওকে পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে।'

'সবই হতে পারে, আবার পারেও না।' আশুবাবু বললেন। 'তাতে যাত্রাদলের কিছু আসে যায় না।'

আমি চুপ করে থাকলাম। আশুবাবুও। দিনমানের তপ্ত দিল্লীর চেহারা এখন সম্পূর্ণ আলাদা। বাংলাদেশ হলে বলা যেতো, বসন্তের মৃদু সমীরণ বইছে। প্রাণ শীতল করা। প্যাণ্ডেল থেকে ছিটকে ছাটকে দু'চার জন করে লোক আসছে। মন্দিরের মূর্তি দর্শনকামীরা বাঙালী অবাঙালী মিশিয়ে অনেক। হলঘরের সামনে যে টিকিট কাউণ্টার সেখানে দেখলাম অ্যাডভান্স বুকিংয়ের জন্য লাইন পড়েছে।

'আমাদের ব্যাপারটা একটু দেখবেন।' আশুবাবু স্মরণ করিয়ে দিলেন ট্রেনে বলা কথার। অর্থাৎ আগামী মরশুমে তিনি নাট্যভারতীতে থাকবেন না। থাকবে না জয়শ্রী মুখার্জীও। জয়শ্রীর সঙ্গে আশুবাবুর সম্পর্কের কথাটা পরে বলা যাবে। আপাততঃ জয়শ্রীর এগারো হাজার টাকা অগ্রিম দাদন চাই। ওই টাকার জন্যে নাকি মেয়েটা সিঁটিয়ে আছে। আমাদের জয়দা, জয়গোবিন্দ রায় চৌধুরী মশাই, জয়শ্রীর অন্যতম কাকামনি, যিনি নিজ খরচে দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টে একখানা পাকা বাড়ি করে দিয়েছেন জয়শ্রীকে। দেনার কিছু শোধবোধ হয়েছে, বাকি আছে দশ হাজারের মতো। 'আপনার কানে কানে বলি', কিষাণ আর অন্য কেউ সুবিধের মানুষ না। টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে আপনি মেয়েটিকে বাঁচান।'

আমি ভাবছিলাম, এ তো দেখছি সত্যিই এক বিচিত্তিরপুর। এদিকে গলায় গলায় ভাব, ওদিকে নিন্দে। তবে এই দু'দলের মধ্যে খাঁটি মানুষটা কে ?

ভোর ভোর সকালে বিছানা থেকে উঠলাম। সারারাত গভীর ঘুম হয় নি। থেকে থেকে ছুটকো ছাটকা স্বপ্ন দেখছিলাম। কালিবাড়ির চত্বরে চলে এলাম। দেখি কালিবাড়ির সদরের পাশের একখানি বাগিচার খাটো দেওয়ালের ওপর বসে আছে হরিপদ বায়েন। চা খাচ্ছে। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো, 'চা খাবেন দাদা ?' বলেই গেটের পাশের অস্থায়ী চা দোকানীকে এক গেলাস চা দিতে বললো। আমি হরিপদর পাশেই বসলাম। অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো হরিপদ বায়েন। 'রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি ?'

'না' বললাম আমি। 'রতন ফিরেছে ?'

'ফিরবে, ফিরবে। না ফিরে যাবেটা কোথায় ? যাত্রাদলের চাকর অন্য কোথাও কাজ করতে পারে না।'

চা পান শেষ হতেই দেখি কালীবাড়ির হল ঘরটার দরজা খুলেছে। বেরিয়ে এলেন কেউ কেউ। বললাম, 'চলুন একবার শান্তি হাজরাকে দেখে আসি। প্রভাতের অবস্থাও একদম ভালো না।'

হল ঘর জুড়ে অনেক বিছানা। বেশির ভাগ লোকেরা শুয়ে আছেন। শান্তি হাজরার বিছানা পড়েছে একেবারে কোণের দিকে। গিয়ে প্রভাতকুমারের কাছে দাঁড়াতেই আমি অবাক।

অচৈতন্যের মতো শুয়ে আছে সে। মণীষা তার বুকের কাছে জেগে বসে আছে। তার চোখ মুখ শুকনো, উসকো খুসকো চুল, চোখের নীচে ঘন ছায়া। দুশ্চিন্তায়। রাত্রি-জাগরণের সবগুলো চিহ্ন এই মুখে।

'কেমন আছেরে এখন ?'

মণীষা না তাকিয়ে মাথা ঝুকিয়ে ইঙ্গিতে বললো, ভালই।

'রাত্রে জ্ঞান ফিরে এসেছিলো ?'

মণীষা এবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকাতে গিয়ে লহমায় মুখ ফিরিয়ে নিলো। ক্ষতে ওষুধ লাগাচ্ছিলো। আমি চমকে উঠলাম, যতদূর মনে পড়ে কাল রাত-তক, মানে রাত্রি এগারোটার পরেও যা প্রত্যক্ষ করি নি, এখন তাই দেখছি। কী ? মণীষার শাদা সিঁথিপথে জ্বলজ্বল করছে রক্তজবার মতো সিঁদুরের রেখা। কপালেও ওই সিঁদুরের উজ্জ্বল একটি ফোঁটা।

আর আমি কিছু বললাম না। ঘোর কাটতে সময় লাগলো। বললাম, 'কাল রাত্রে ?'

ইঙ্গিতপূর্ণ কথাটা বুঝতে পেরেছিলো মেয়েটি। মাথা নিচু করে রয়েছে। নাড়তে নাড়তে আমার দিকে না তাকিয়েই বললো, 'হ্যাঁ, কাল রাত্রে।'

এই ছিলো, এই নেই। পাশে তাকিয়ে দেখি হরিপদ নেই। গেলো কোথায়! বেরিয়ে এলাম। দেখি হরিপদ কালীবাড়ির ফাঁকা চত্বরে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে।

'চলে এলেন!'

'এমনি।' হরিপদও আমার দিকে না তাকিয়ে জবাব দিলো।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে বললাম, 'দিল্লীর আকাশে আবার দেখলেন কী ?'

'আকাশটা না, আজ একটু অন্যরকম।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি।

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো হরিপদ। আর হঠাৎই চোখ মুছতে মুছতে হনহন করে এগিয়ে গেলো কালীবাড়ির সদর ফটকের দিকে। ওখান থেকে সোজা মন্দির মার্গ।

হরিপদ কী কিছু লুকোতে চাইলো আমার কাছে, কী! পরে বুঝলাম, কেন মেয়েটির সিঁদুর-রাঙানো-সিঁথিপথ দেখার সঙ্গে সঙ্গে হরিপদ ছিটকে বেরিয়ে গেলো।

সেদিন সন্ধ্যে নাগাদ রতন ফিরে এলো। ফটকের মুখে দাঁড়িয়ে আমি দিল্লী নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা-পুরুষ পরেশ দাসের সঙ্গে কথা বলছিলাম। পরেশ তাঁর নাট্য-সতীর্থদের নিয়ে যাত্রা দেখতে এসেছে। গত রাত্রে যাওয়ার সময় দেখা করে গিয়েছিলো। আজ এসে বলছিলো, 'আমাদের থিয়েটারকে, আপনি ঠিকই বলেছেন, আসরে নামিয়ে আনলে ভারতীয় থিয়েটার সত্যি মুক্তির পথ পেতে পারে।'

ঠিক তক্ষুনি দেখি সারা গায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রতন ঢুকছে। আমাকে দেখেই মুচকি হাসলো। ওর সারা মুখে বিন্দুতম কষ্টের ছায়া নেই। বললাম, 'এত দেরি হলো কেনরে রতন ?'

রতন বললো, পুলিশ এসে ওকে রক্ষা করে নিয়ে গিয়েছিলো হাসপাতালে। স্টীচ ব্যাণ্ডেজ করে, হাতে ওষুধপত্র দিয়ে ওকে নিয়ে গিয়েছিলো স্টেশন-মাস্টারের

কাছে। মাস্টারবাবু খাইয়ে দাইয়ে খুব সকালে গাড়িতে তুলে দিয়েছেন। রতন বললো, 'আমাকে না বাবু, কুড়িটা টাকাও দিয়েছে।'
'বাড়ি চলে গেলেই পারতিস। এই শরীর নিয়ে কাজ করবি কী করে। কে দেখবে তোকে?'
'করবো, ঠিক করতে পারবো দেখবেন।' রতন বললো, 'বাড়িটাড়ি থাকলে তো যাবো। ছোটবেলায় সৎমা তাড়িয়ে দিতো। বাবাটা মাতাল হয়ে এসে মারধোর করে। যাত্রাদলের কাজ ছাড়া এখন আর কোথাও ভাল লাগে না বাবু।'

হাসি সামলে, বড় ফণিবাবুকে একটা ঘটনার কথা বললাম। ঘটনাটি বিজয়দার মুখে শোনো। বিজয় মিত্র। ম্যানেজার বলো ম্যানেজার, পরিচালক বলো পরিচালক, আবার মালিকের বাবা মালিক। চিৎপুরে বড়ো দরের এমন কোন্ দলটা আছে, বিজয় মিত্তির কোনো না কোনোদিন তার হাল ধরেন নি? নট্ট কোম্পানীতে বহুদিন কাজ করেছেন, দলের বর্তমান মালিক মাখনলাল নট্টকে তিনি তুই-তোকারী করেন। কারণ মাখনের পিতা ছিলেন বিজয়দার বন্ধু লোক। সূর্যকুমার দত্ত, যাঁকে বলা হয় 'যাত্রার সূর্য' তিনিও ছিলেন বিজয়দার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। সত্যম্বর অপেরাকে প্রতিষ্ঠিত বড়ো দল করতেই কি বিজয়দার দান কম? এ-দলের মালিক গৌর দাস মশাইয়ের সঙ্গে বিজয়দাকে খিস্তি করতে দেখে'ছ। নিউ গণেশ অপেরার গোষ্ট ঘোষকে 'গোষ্টা' বলে ডাকতেন বিজয়দা। বলতেন, 'দুধে জল দিয়েও পার পাওয়া যায়রে গোষ্টা, যাত্রায় ফাঁকি চলে না। দিলি কি হাঁটুরে মার খেয়ে অথর্ব হয়ে বসে থাকতে হবে।' বাকি সব দলের মালিকরাই বিজয়দার সন্তানের মতো। নবরঞ্জন অপেরার মালিক জীবনকৃষ্ণ দাসকে রীতিমতো হুকুম করতেন বিজয় মিত্তির। এই আশ্চর্য মিশুকে, জমাটি লোকটির মুখে অতীত যাত্রার বহু আখ্যান শোনা যায়। ডাকাতের হাতে দল লুঠ ও লড়াই, মড়কের মধ্যে যাত্রাদল, বাঘের সঙ্গে যাত্রাদলের লড়াই, পাহাড়ে পর্বত-কন্দরে দলের অ্যাকসিডেন্ট, মগদের সঙ্গে যাত্রাদলের নৌ-যুদ্ধ—আরও কতো কি। এ-সব বলা গল্পের বর্ণনা পরে দেব, আপাতত পরিচালক হিসেবে একজন জমিদারের মন জয় করার ইতিবৃত্ত বড় ফণিবাবুকে বলছি।
দল সে-বছর মুক্তাগাছায়। জমিদার বাড়িতে সাত রাত্রের টানা গান। চার

দিন পরে খবর এলো, মল্লিকপুর রাজবাড়িতে যে পরবর্তী ছয় দিনের বায়না হয়েছিলো, লোক এসে তা ক্যান্সেল করে গেছে। কারণ রাজাবাবুর পুত্রবধূ হঠাৎ দেহ রেখেছেন। কেউ-বলছেন স্বাভাবিক মৃত্যু, কেউ ব্যাপারটার মধ্যে অন্য গন্ধ শুঁকছে। আত্মহত্যা? হতেও পারে। মল্লিকপুরের রাজকুমার নাকি দিবারাত্র নাচঘর নিয়ে ব্যস্ত। বাঈয়ের হাতে সেবা না পেলে তাঁর চলে না। বউটা রাতের পর রাত শূন্য শয্যায় একা। সুতরাং মনের জ্বালায় যদি বউটা আত্মহত্যাই করে থাকে তবে দোষটা কিসের?

বিজয়দা বললেন, 'ছয় ছটা তারিখ ক্যান্সেলের খবরে কোনো পরিচালকের মাথার ঠিক থাকে? আমি কিন্তু একেবারেই ভেঙে পড়িনি। আমারও নাম বিজয় নয় দুর্জয় মিত্তির। আমার সঙ্গে চালাকি? বউ মরেছে বলে যাত্রা বন্ধ হবে কেন র‍্যা।'

দুর্ধর্ষ পরিচালক খবরটা শোনার পর থেকেই কায়দা ভেজে নিচ্ছিলেন মনে মনে। বললেন, 'সেই রাত্রেই রওনা হলুম শালা। দলের নৌকা ছিলো ঘাটেই। হরিপদ ছিলো ম্যানেজার কাম-রানী। তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে গান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মাঝিদের বললাম লগি তুলতে। জলপথে মাইল বারো রাস্তা। হাওয়াটা ছিলো পুবমুখী। মাস্তলে বাদাম তুলে দিলে আর কতক্ষণের পথ? ব্যাস, নৌকা চললো তরতর করতে করতে।'

শোয়া দূরে থাক, আয়েস করে বসতে পর্যন্ত পারছিলেন না। টানা ছয়দিন গান বন্ধ থাকলে কোম্পানীর মালিক লাটে উঠবেন। গালাগাল করবেন পরিচালককে। এমন কি ছাটাইয়ের নোটিশও দিতে পারেন। সুতরাং দুশ্চিন্তা, দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তা। 'ছইয়ের ওপরে উঠে ঠাণ্ডা বাতাস নিচ্ছি, পাটাতনের ওপর পায়চারি করছি, কলকে পালটে পালটে টেনে যাচ্ছি তামাক। ভাবছি কোন উপায়ে রাজাবাবুকে রাজী করানো যাবে। আর একান্তই যদি গান না করান, তবে কোন জমিদার বাড়িতে তারিখগুলো খাপানো যাবে।'

ভোর ভোর সকালে জমিদার বাড়ির ঘাটে নাও ভিড়লো। রাত্রে মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে অনিচ্ছায় কয়েক-গ্রাস ভাত মুখে তুলেছিলেন বিজয় মিত্তির। তা হজম হয়ে ততক্ষণে পেটে পড়েছে টান। সূর্য ওঠা পর্যন্ত পরপর আট ছিলিম তামাক পোড়ালেন এই ঘাটেই। তারপর বগলে ছাতা, গলায় চাদর ঝুলিয়ে জমিদার-বাবুর বাড়ির দিকে বিজয়দার যাত্রা।

গল্পের আসর বসেছিলো আসানসোলের তৃপ্তি বোর্ডিং-এ। প্রতি বছরের মতন গোটা আসানসোল ভরে গেছে যাত্রার পোস্টার আর ব্যানারে। জি টি রোড ধরে যাওয়া যাত্রীরা থেমে থেমে পড়ছেন, দেখছেন। বায়নায় বায়নায় ছয়লাপ। ঝাঁকে ঝাঁকে নায়েকের দল আসছে, যাচ্ছে। যাত্রার বাজার এখানে হয়ে উঠেছে সরগরম। প্রতি বছর এই সময়টাতেই দিন কয়েকের জন্য আমি আসানসোলে আসি। বিজয়দার রান্না খাই। অতো ভালো রান্না করতে পারে না রামঠাকুরও। পদ্ম ঠাকুরও না। সেদিন রাত্রির খাওয়া খাদ্যির পাট চুকিয়ে তৃপ্তি বোর্ডিং-এর উঠোনে গুটি তিনেক খাটিয়া কাছাকাছি টেনে আমরা আসর জাঁকিয়ে বসেছি। আশুতোষ সাহা সঙ্গে আছেন। তিনি তখন নট্ট কোম্পানীর ডেপুটি ম্যানেজার। আছেন আম্বিকা নট্ট কোম্পানীর অশ্বিনী দাস, সত্যম্বরের হরিপদ বায়েনও। শম্ভু ঘোষ, কমল খাঁ, সুখেন্দু রায়, জীবন মুখার্জী এবং কোলিয়ারী লর্ড অনিল ভাণ্ডারী বসেছেন আয়েস করে। মধ্যিখানে আসর আলো করে বসেছেন বিজয় থুড়ি দুর্জয় মিত্তির। ওই আসরেই পরিচালকদের পলিসি সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছিলেন বিজয়দা।

'বার মহলে গিয়ে শুনি, বাবু সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। এক শালা গোমস্তাকে নিয়ে ঝুলে পড়লুম। গলা ভারী করে জমিদার-বধূর জন্য শোক প্রকাশ করতেই দেখি ব্যাটা গোমস্তা কেমন যেন নরম হয়ে এলো। ব্যাস আমাকে আর পায় কে ? বস্তার মুখটা হাতে পেয়ে গেছি। এবার খোলার পালা। গোমস্তা শালার নাড়িভুড়ি ধরে টান দিতে লাগলুম আস্তে আস্তে। আর ওই ব্যাটা তখন গড়গড় করে ওগড়াতে লাগলো সব কথা। ছেলের বউ শ্বশুরের অভিনয় দেখতে ভালোবাসতো বলেই রাজাবাবু প্রতি বছর নাটক করেন। নিজের লেখা নাটকে রাজা সাজেন নিজেই। গত বছর রাজাবাবু 'চন্দ্রহাস' পালা নামিয়েছিলেন। এ-বছর তোড়জোড় শুরু হবার আগেই এই দুর্ঘটনা।'

'ব্যাস', বিজয়দা খাটিয়ার ওপর আসন পিঁড়ি করে বসা নিজের হাঁটুর ওপর জব্বর গোছের একটা থাবড়া মারলেন। দু'কষ বেয়ে নামছিলো পানের রঙীন রস। গামছায় মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, 'পেয়ে গেছি শালা। ঠিক ধরে ফেলেছি ধরতাইটা। এবার ব্যাটা রাজার পুত যাত্রা না দিয়ে যায় কোথায় দেখি।'

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না বিজয় মিত্তির এমন কি কিউ পেলো যে, গন্তব্যে পৌঁছবে। আশুবাবুর গলা তখন জড়িয়ে এসেছে।

তিনি পাইট খানেক স্ট্রলার স্তান টা পান করে এসেছেন। টলা মাথাটা আমার কানের কাছে এনে বললেন, 'এবার একটা বোমা ফাটবে।' হরিপদ আশুবাবুর অবস্থা দেখে হাসছে। কমল খাঁ আশুবাবুর একটা হাত ধরে রয়েছে।

'এত্তেলা যেতেই শালা ডাক এলো। গোমস্তা ব্যাটাই সঙ্গে করে নিয়ে গেলো আমাকে। দু'তিনটা মহলের ইন্দ্রপুরী পার হয়ে ঢুকলাম খাস-মহলে। সে একখানা দেখবার মত ঘর বটে। মেঝেতে মখমলের গালচে, দেওয়ালে জাপানী মেয়েদের স্যাংটা ছবি, আঁদুল গায়ের উলঙ্গ মেম-সাহেবের স্ট্যাচু, মার্বেল পাথরে নানা কাজ করা। তার মধ্যে জমিদারবাবু তাকিয়ায় ঠেঁস দিয়ে গড়গড়া টেনে যাচ্ছেন। সামনে গিয়েই সাষ্টাঙ্গে এক পেন্নাম দিলাম ঠুঁকে। উঠে দাঁড়াতেই দেখি, গড়গড়ার নল মুখ থেকে নেমে এসেছে এক অস্ত্রের জব্বর ঘায়ে। বাঁ হাতের মুঠোয় গড়গড়ার নলের মুখটা নিয়ে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'কী নাম ?'

'বিজয় ; আপনার সন্তান।'

জমিদারবাবু গোমস্তাকে ডাকলেন। 'হ্যাঁ হে নবকান্ত, বিজয় নামে আমার কোনো সন্তান আছে ? খাতাটা দেখতো একবার।' 'আছে হুজুর, আছে।' বিজয় মিত্তির বললেন, 'অজয়, বিজয়, সুজয়, দুর্জয় - আমরা সবাই আপনার সন্তান। ভাত যে দেয় বাবু, সেই তো হোলো গিয়ে পিতা।'

'ও ', জমিদারবাবু আবার গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে টানতে শুরু করলেন। একটু পরে থামলেন, নলটা রাখলেন পাশে, 'থাকা হয় কোন মহল্লায় ?'

'কলকাতায়।'

'তা বাপু সেটা তো আমার জমিদারীর মধ্যে পড়ে না !'

'পড়ে হুজুর, পড়ে··· ।'

শেষ করতে দিলেন না কথাটা। জমিদারবাবু আবার ডাকলেন গোমস্তাকে। নায়েব মশাইকে বললেন ডেকে দিতে।

বিজয়দা বললেন, 'সে শালা জজ-ম্যাজিস্ট্রেরের চাইতেও ভয়ানক। অন্ত কোনো পরিচালক হলে কাছা খুলে মারতে হতো দৌড়। আমি বিজয় থুড়ি দুর্জয় মিত্তির ওপাটে নেই একেবারে। ধরতাই যখন পেয়েছি নম্বরটা না ছেড়ে রেহাই দিচ্ছি না।'

'নায়েব এলো ?' জীবন মুখার্জী শুধোলেন।

'আসবে না মানে ? একে জমিদার তার সামনে আবার বিজয় মিত্তির। খবর শুনেই দেখি ব্যাটা তড়িঘড়ি ছুটে এসে হাজির।'

রাজাবাবু ডাকলেন, 'নিশিকান্ত।'

'আজ্ঞে বাবু।'

'দেখতো কলকাতায় আমার কোনো মহল্লা আছে কিনা।'

'মহল্লা ?' নায়েব নিশিকান্ত চোখের পাতা এক করলেন। 'কলকাতায় ম-হ্-ল-লা'—নায়েব মাথা চুলকোতে শুরু করেছে।

'হ্যাঁ, মহল্লা—', জমিদারবাবু বললেন।

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে বাবু', হঠাৎ বেহাত হওয়া কোনো বস্তু হাতে ফিরে পাওয়ার আনন্দ নায়েবের চোখেমুখে, 'আজ্ঞে আপনার প্রপিতামহ শ্রীল শ্রীযুক্ত··· '

'আঃ !' জমিদারবাবু বিরক্ত হলেন। 'প্রপিতামহের আত্মা ধরে টানাটানি করার দরকার নেই। তুমি আমার কথা বলো, এই আমার কথা।'

নায়েব নিশিকান্ত আর থই পায় না কিছুতেই। তার হয়ে জবাব দিলেন বিজয়দা, 'প্রতি বছর রাজাবাবু আপনার পাটে একবার মাথা খুঁড়ে না গেলে আমাদের দিন-গতিক খারাপ যায়। আমি কলকাতা যাত্রাদলের বিজয়···'

'যাত্রাদল !' জমিদার ভুরু কোঁচকালেন। গড়গড়ায় ভুরুক টান দিতে লাগলেন।

বিজয় খুড়ি দুর্জয় মিত্তিরের অবস্থা তখন চরমে। এই বুঝি শোনে, যাত্রা হবে না এ-সনে।

জমিদারবাবু তাকালেন সরাসরি, 'তা এবার তো যাত্রা দিতে পারছি না আমি।'

ব্যাস, এক অস্ত্রে জব্বর দুর্জয় মিত্র একেবারে কুপোকাৎ। কিন্তু দমবার পাত্র একেবারেই নয়। হাজার হাজার নায়েককে যিনি এ-হাটে কিনে ও-হাটে বিক্রী করেন তার কি কাহিল হওয়া চলে ? সঙ্গে সঙ্গে জিভটা ঠেলে বের করে বিজয় মিত্তির মা কালীর মতো জিভ কাটলেন। 'ছিঃ ছিঃ বাবু, ছিঃ !' চট করে নিজের দু'টো কান ধরে ফেললেন, 'ও-কথা বলে অভাগা সন্তানের মনে কষ্ট দেবেন না। আপনার প্রতিমার মতো পুত্রবধূ, সেতো ধরতে গেলে আপনার সন্তানই। আদরের কন্যাতুল্য। তাকে হারিয়ে কি···'

'কমলাকে তুমি দেখেছ ?' জমিদারবাবু গম্ভীর হলেন।

'তা আর দেখিনি হুজুর ? অবশ্য সামনে থেকে দেখবোই বা কী ভাবে।

হাজার হলেও জমিদার বাড়ির বউ। শুনেছি রাজাবাবু। লোকের মুখে শুনেছি, মা আমার যাত্রা দেখতে বড়োই ভালবাসাতেন। ওই যাকে বলে যাত্রা-অন্ত প্রাণ আর কি।'

'তা বাসতেন। অভিনয়টা খুবই পছন্দ করতেন আমার কমলা মা।' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো জমিদারবাবুর বুক খালি করে। চোখ মুছলেন। তারপর কেমন ধরা গলায় বললেন, 'আর তো আমার অভিনয় করা হবে না বিজয়।' বাষ্পাকুল দৃষ্টি তুলে তাকালেন, 'দেখবে কে? ওই একটা মেয়ের জন্যই ফী বছর পুজোর সময় আমি নাটক করতাম।'

'জানি হুজুর জানি।' বিজয় মিস্তির ইন্ধন জুগিয়ে যান। করজোড়ে এগিয়েও যান খানিকটা, 'গেলো সনে গান গাই আমরা মইস্তানপুরে। পুজোর সময়েই। মনটা বড়ই ছটফট করছিলো রাজাবাবু। শুনলাম চন্দ্রহাস পালা নামাচ্ছেন আপনি। চেষ্টা করেছিলাম হুজুর আসতে। কিন্তু পারি নি। আপনার নাটক করা মানেই ইন্দ্রসভার আয়োজন। কী এ্যাকটিং, দেখলে মনপ্রাণ জল। সেজন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি হুজুর। যাত্রার বায়না নিতে নয়। গান হচ্ছে আমাদের মুক্তাগাছায়। তবু জোর করে চলে এলাম। পাটে একবার মাথা ছুঁইয়ে যাবো। আপনার এ্যাকটিং দেখার পর হুজুর কলকাতার তাবড় তাবড় অভিনেতাদের বলেছি হ্যাঁ, এ্যাকটিং যদি শিখতে হয় তো যাও মল্লিকপুরে...'

হঠাৎ পালটে গেল পরিবেশটা। তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে আধশোয়া হয়ে গড়গড়া টানছিলেন। এবার সব ফেলে উঠে বসলেন জমিদারবাবু। গলাটা সামান্য বাড়িয়ে দিলেন বিজয়দার দিকে, 'তুমি আমার অভিনয় দেখেছ?'

'তা আর দেখিনি হুজুর, একশোবার দেখেছি।'

'কলকাতার বড় আর্টিস্টদের বলেছো আমার কথা?'

'না বলে থাকতে পারে কোন শালা।' সঙ্গে সঙ্গে জিভে কামড় দিলেন বিজয় মিস্তির, নিজের দু'টো কান ধরে সবিনয়ে বললেন, 'মাপ করবেন হুজুর। আমি না হুজুর একটু, কী বলে, ইমোশনাল।'

'শুনে ওঁরা কী বলেন।'

'আমাকে বলেছে হুজুর আপনাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যেতে। স্টার থিয়েটারে একবার নামাতে। তা হুজুর আমি হলেম গরীব, ছা-পোষা মানুষ। ক্ষ্যামতা কী আমার।'

'আর কিছু বলে না ?'

'বলে হুজুর, দেখা হলেই বলে। বলে, কই হে বিজয়, তোমার মল্লিকপুরের জমিদার এ্যাকটর ? তাঁকে আনো একবার, দেখি।'

'তুমি কিছু বলো না ?'

'বলি হুজুর ; বলে যাই : জমিদার মানুষ, রাজা লোক, তার কি ঝট করে সব ফেলে চলে আসা সম্ভব ?'

জমিদারবাবু আবার গড়গড়ার নল মুখে তুলে নেন। দু' কি তিনটি টান দিয়ে নলটা ছুঁড়ে দেন। বলে 'ওই রকম একটা বাসনা আমার কমলা-মায়ের ছিলো।' নাকে ফৎ ফৎ শব্দ তোলেন রাজাবাবু। গলায় কান্না। 'কিন্তু আজ তো সে নেই। কার জন্য করবো, কে দেখবে ?'

'কেন রাজাবাবু, জগৎ দেখবে।' বিজয় মিত্তির উৎসাহের গলায় বলেন, 'মাতো চলে যান নি, নশ্বর দেহটাই গেছে কিন্তু তাঁর আত্মা তো হুজুর আপনাকে ত্যাগ করতে পারে না। লক্ষ্মীমন্ত মা আমার জগতের সকল মানুষের মধ্যেই বিচরণ করছেন। তিনি এখানেই আছেন হুজুর। আপনার চারপাশে। মায়ার বন্ধন থেকে হুজুর আত্মারও নিষ্কৃতি নেই।'

জমিদারবাবু কেমন আনমনা হলেন, বললেন, 'তুমি বলছো বিজয়, মা আমাকে ছেড়ে চলে যান নি ?'

'তাই কি যাওয়া সম্ভব হুজুর ?'

জমিদারবাবু আবার সোজা হয়ে বসলেন। ডাকলেন নায়েবকে।

নায়েব নিশিকান্ত দরজার ও-পাশেই ছিলেন। ডাক শুনে ত্রস্তে সামনে এগিয়ে এলেন, 'হুজুর।'

বিজয় মিত্র ততক্ষণে ভগবানকে ডাকতে শুরু করেছেন।

'বায়না করে নাও নিশিকান্ত। যাত্রা না হলে মায়ের আত্মা আমার চারপাশে কেঁদে কেঁদে ফিরবে ; আমি থাকতে তা হতে পারে না। বায়না করে নাও।'

'বায়না করাই আছে হুজুর।' বিজয় মিত্র সোৎসাহে বললেন।

'করা আছে !' জমিদারবাবু অবাক।

'হ্যাঁ হুজুর।' বিজয় মিত্র বললেন, 'মাতৃ বিয়োগের খবর শুনেই তো দৌড়ে এলুম। এই দুঃখের দিনে গান করাটা ঠিক হবে না। তাই ক্যান্সেল করতে এসেছিলাম হুজুর।'

'না না,' জমিদারবাবু মাথা নেড়ে গেলেন। 'যাত্রা হবেই। আমরা দুঃখ পেয়েছি ঠিকই, তাই বলে মায়ের আত্মাকে কষ্ট দেবো; না তা হয় না। যাত্রা হবে।' জমিদারবাবু নিশিকান্তকে ডেকে বললেন, 'বিজয়কে পাঁচটা টাকা দিয়ে দাও, বকশিস।'

নায়েব নিশিকান্তর পেছন পেছন যাচ্ছিলেন বিজয় মিত্র। রাজাবাবু পেছন থেকে ডাকলেন, 'হ্যাঁ, শোনো বিজয়, মায়ের শেষ ইচ্ছাটা আমি পূরণ করবো। স্টারে একবার নামবো। তুমি ব্যবস্থা করে দিও। যাও—'

পাঁচটা টাকা হাতে দিলেন নায়েববাবু। বললেন, 'ছয় দিনের ফুরণ ছিলো, খাওয়া থাকা বাদে একশো পাঁচ টাকা। ওটা দুই শো পাঁচ করে দিচ্ছি। আমাকে পঁচিশ দিও।'

'দেব', বিজয় মিত্র খুশীতে উপচে পড়ে বললেন, 'আরও পঁচিশটা টাকা নিতে হবে হুজুর। ওটা আমার আব্দার। পঞ্চাশটা টাকা হাতে না দিলে কি নায়েবের সম্মান রাখা যায়?'



'জাস্ট দ্যাট!' বড় ফণিবাবু বললেন, 'দিজ ইজ দি ক্যারেকটার অফ আওয়ার যাত্রা পরিচালক। সার্কাস পার্টির ক্লাউন আর যাত্রা-পার্টির পরিচালক—দুই-ই এক। ওরা অভিনেতার বড়ো অভিনেতা। জানেন তো, কথিত আছে, একশোটা দাঁড়কাক মরলে একজন পরিচালক হয়।'

বড় ফণিবাবু হেসে উঠলেন। আমিও।

'তবে শুনুন', বড় ফণিবাবু খুব মেজাজে বললেন, 'সারাজীবন কত মানুষের কত কথাই না শুনেছি। একবার অমনি এক জমিদার বাড়িতে গান। পাঁচদিনের বায়না ছিলো। শেষ দিন যাত্রা ভাঙতে শেষ রাত। চাকরেরা নৌকোয় মাল তুলছে। আমরা খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে রাজবাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে গল্প

করতে করতে যাচ্ছি। হঠাৎ ভেতরে থেকে গম্ভীর গলা ভেসে এলো, 'কে যায় ?'

'আমরা যাত্রা অলা।'

ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, 'আমি ভেবেছিলাম মানুষ বুঝি।'

বিকেলের চা এলো ঘরে। আমরা চা খেলাম। বড় ফণিবাবু বললেন, 'দিন তো আর একটা ধোঁয়া। বহুকাল বাদে মনটা আজ বেশ ফুরফুরে লাগছে।' বলে নিজের প্যাকেটটা টেনে নিলেন, একটা আমাকে দিলেন, আর একটা নিলেন নিজে। বললেন, 'মকারান্তে দোষ থাকে, চকারান্ত নির্দোষ।'

বললাম চকারান্তটা কী মাস্টারমশাই ?'

বললেন, 'চা, চারমিনার, চরিত্র।'

চা-সিগ্রেট শেষ হবার পর বড় ফণিবাবু তাঁর হাতের খাতাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, বললেন, 'মাস দুই হলো লিখছি। আপনাকে শোনাবার বড়ো বাসনা। কলকাতায় তো সময় হয় না, ভাবলাম, দিললিতে তো একটু নিরবিলি পাবো। ওখানে নিজে পড়ে আপনাকে শোনাবো।'

খাতার পাতা ওল্টালাম। যাত্রাশিল্পের আধুনিক পর্ব নিয়ে রচিত কিছু ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা, যাত্রাশিল্পের উন্নয়নে নেপথ্য-নায়কের ভূমিকা। শোভাবাজার রাজবাড়ির আলোচনার আসর থেকে যাত্রাগানের পট-পরিবর্তন ইত্যাদি ইত্যাদি।

'আমি পড়ি, আপনি একটু শুনুন।' বড় ফণিবাবু পড়তে লাগলেন 'ব্যক্তি কি জীবাত্মার মতো শিল্পেরও ভাগ্য বলে একটা কথা আছে। ফুল যেমন নির্দিষ্ট সময়ে ফোটে, দশা অন্তর্দশা মিলিয়ে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন যেমন নির্দিষ্ট সময়েই হয়ে থাকে, শিল্পের ক্ষেত্রেও ঘটে একই ঘটনা। পরম করুণাময় ঈশ্বর নিজে হাত বাড়িয়ে কাউকেই দান করেন না, এ জন্য মাধ্যম নির্বাচিত হয়, আমাদের মৃতকল্প যাত্রাকে পুনরুজ্জীবিত করতে তেমনি… …'

লেখা পড়ে শোনানো যে কতবড়ো আর্ট, বড় ফণিবাবুর পড়া না শুনলে তা বোঝা খুবই কঠিন। এ্যালেক গিনেস তাঁর একটি রচনাতে লিখেছিলেন, নাটক কখনও পাঠ করে শোনানো যায় না। কারণ নাট্য কেবল রচনা নয়, তাকে দৃশ্যবস্তুতে পরিণত করলেই তা সার্থক। মহলায় দেখা ও শোনাতে কিছু বোঝা যেতে পারে নাটক। যদি অবশ্য তা হয় চূড়ান্ত মহলা। অর্থাৎ আলো, আবহ, দৃশ্য, এফেক্ট

মিউজিক সব কিছুর সমন্বয়ে যা প্রদাশতব্য। বড় ফণিবাবু অবশ্যই নাটক লেখেন নি। ওঁর পাঠ শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিলো, পড়া এক ধরনের আবৃত্তি। ভালো কণ্ঠ, স্পষ্ট উচ্চারণ, গতি ও ছন্দের ব্যবহার, গতি বজায় রাখা, মাত্রাজ্ঞান, সংলাপ বিশেষের ওপর জোর দেওয়া এবং সব মিলিয়ে একটা নিটোল সুর বজায় রাখা। সকল পাঠকের কাছে এমন পাঠ প্রত্যাশা করা যায় কী ?

বেলা পড়ে আসছে তবু ঘরে জুন মাসের দিললির গরম। বাইরে চামড়া ঝলসানো রোদ। জানলার দিকে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া নির্মেঘ আকাশ এখন স্টীলের পাতের মতো ঝকঝকে। জানলা দিয়ে মন্দির মার্গ দেখা যাচ্ছে। প্রায় লোকশূন্য পথ। মাঝে মধ্যে দু' একটা স্কুটার, ট্যাক্সি কি কা-র নৈশঃব্দ ভঙ্গ করে সরবে ছুটছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় ধরে বড় ফণিবাবু লেখাটা পড়লেন। ততক্ষণে দিললির তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে। রাস্তার ওপরের বিশাল বিশাল অশ্বত্থ গাছের পাতায় দোল দিয়ে বইতে শুরু করেছে আসন্ন সায়াহ্নের শরীর জুড়নো হাওয়া। হঠাৎ দেখলাম, রাস্তায় একটা কাণ্ড। কালীবাড়ির ফটক ছাড়িয়ে বেশ কিছু দূরে একটা স্কুটার-ট্যাক্সি থামলো উল্টোদিকের ফুটে। এ-দলের একজন কচি অভিনেত্রী একগাদা সদ্য কেনা জিনিসপত্র নিয়ে নামলো। রাস্তা পার হয়ে ফটকের দিকে এলো। প্রবেশ করলো কালীবাড়িতে। স্কুটার-ট্যাক্সিটা আরও উজানে গিয়ে ঘুরে এসে খানিক পরেই থামলো কালীবাড়ির সদরে। যিনি নামলেন, তাঁর বয়সের গাছে পৌষের হাওয়া লেগেছে। বিশিষ্ট চরিত্রবান ব্যক্তি। কিন্তু একি! একে কি বলে অপত্যস্নেহ ?

মেয়েটির নাম ইন্দু। বয়স বড়জোর পনেরো। রঙ ফর্সা, মুখ মিষ্টি, গায়ে বাড়ন্ত যৌবন।

'লেখাটা ভালো লাগলো আপনার ?' বড় ফণিবাবু শুধোলেন। 'নাম দিয়েছি ছেঁড়া খাতার পাতা।' বললাম 'যত্ন করে রেখে দিন, যদি কিছু গতি করা যায়।'

'কাগজে ছাপবেন ?'

'দেখবো।'

'যাত্রা নিয়ে লেখা কাগজে বড় একটা ছাপে না। ওঁরা যাত্রাকে চিরকাল অন্ত্যজের আসনেই বসিয়ে রেখেছে। একমাত্র আনন্দবাজার ভরসা।'

বড় ফণিবাবুর আশা পূরণ করতে পারি নি। তাঁর মৃত্যুর পর সেই খাতাটার

অনেক সন্ধান আমি করেছি। পাই নি। ওঁর নাম উল্লেখ করে ওই লেখাটার প্রসঙ্গ নিয়ে আমি দেশ পত্রিকায় একটি রচনা লিখেছিলাম।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বড় ফণিবাবু চলে গেলেন। আজকের পালা 'বাঁশের কেল্লা।' বড ফ ণবাবুর এখানে মেজর্ রোল। দাত্থর ভূমিকা। উল্টোডাঙার আসরে যে-রোল করতে করতে ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ আসরেই অজ্ঞান হয়ে যান। এবং এক গৌরবময় মৃত্যুর স্বাক্ষর রেখে যান দৃশ্যকাব্যের জগতে। নাতির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তাঁর আসরে প্রবেশ। ডাকতে ডাকতেই বুকে ব্যথা। দীপ্তোজ্জ্বল সূর্য বসে পডলেন আসরে। ডান হাতে চেপে ধরলেন বামবক্ষ। গলার স্বর, ডাক এলোমেলো হয়ে এলো। নাতি প্রবেশ করলো আসরে। দাত্থ, দাত্থ, দাত্থ– নাতি জড়িয়ে ধরতে গেলো দাত্থকে। অজ্ঞান অচৈতন্য দাত্থর দেহ কাৎ হয়ে পড়ে গেলো আসরে। নাতি বলে আর ডাকলেন না দাত্থ। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদর কণ্ঠে তারপর আর কোনো কথা উচ্চারিত হয় নি। চিৎপুরের আকাশে 'মধ্যাহ্নে সূর্যাস্ত' হলো। এই নামের পালাই তিনি প্রথম রচনা করেছিলেন।

চওয়নজী অর্থাৎ ওয়াই বি চওয়ন এবং নন্দিনী শতপথী এলেন পরদিন দুপুরে। আমার শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে মুখোমুখি বসলাম পাঁচজন। চওয়নজী, নন্দিনী, ফণিবাবু, কিষাণ দাশগুপ্ত এবং আমি। ঘণ্টা দুয়েক ধবে ওঁদের বোঝানো হলো যাত্রার গুরুত্ব, জন-জীবনে যাত্রার প্রভাব ও দান, যাত্রার ঐতিহ্য। ওঁরা প্রশ্ন করলেন। জবাব দিলাম। তারপর উঠবার সময় দু'জনেই বললেন, 'চেষ্টা কববো।'

আমি হাতে হাত মিলিয়ে বললাম, 'চেষ্টা নয়, আকাদেমি আমার চাইই চাই।'

সেদিন ওঁরা দু'জনেই বসে যাত্রা শুনলেন। বড় ফণিবাবুর অভিনয় দেখলেন

কথা দিলেও, আমি ভেবেছিলাম, ওঁরা সম্ভবত যাত্রার কথা ভুলেই যাবেন। মন্ত্রীমশাইদের সঙ্গে অনেক মেলা-মেশার অভিজ্ঞতাই এই বিশ্বাসে আমাকে পৌঁছে দিয়েছিলো। কিন্তু দেখলাম ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ আকাদেমি পেলেন। দিল্লির অফিস থেকে টেলেক্স এলো গোধূলি লগ্নে। সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠালাম রামরাজাতলায়। গাড়িতে আনা হলো বড় ফণিবাবুকে আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে। আমার টেবিলের সামনে বসে কেঁদে ফেললেন, বললেন, 'দীপ

নেভার সময়ে হঠাৎ তেলের বন্যা। পলতে যে আর নেই; জ্বলবে কী? এ গৌরব প্রবোধবাবু, বেশিদিন আমি বইতে পারবো না।'

ফটোগ্রাফী ডিপার্টমেণ্ট থেকে বড় ফণিবাবুর শেষ ছবি নেওয়া হলো। আমি লিখলাম সাক্ষাৎকার। বললাম 'খবর পাওয়ার পর আপনার মানসিক প্রতিক্রিয়া কী?'

বড় ফণিবাবু বললেন, 'সত্যি কথা বলবো, লিখবেন না যেন। বেঁচে থাকতে পোছে না', মরলে সাজায় খাট। এটাই আমাদের জাতির, দেশের সারকথা'

পাঁচ

শম্ভুদা, শম্ভুনাথ ঘোষ তখন নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার। মালিক দু'জন। নারায়ণ ভট্টাচার্য এবং কালীপদ সরকার। সময়টা ঠিক কালীপুজোর আগে। হঠাৎ নারাণ, যাকে আমি নরনারায়ণ বলি, তার একটি চিরকুট নিয়ে একটি লোক হাজির। নারাণ লিখেছে, সে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ, একবার গেলেই ও বাঁচবে। লোকটি ট্যাক্সি নিয়েই হাজির। সুতরাং সাত-সকালে রওনা হতেই হলো। নারায়ণ ভট্টাচার্য তখন থাকতো একটা পুরনো ভাড়া বাসার দ্বিতলে। শোভাবাজার চিৎপুর মোড় থেকে ট্রামলাইন ধরে বাগবাজার যাওয়ার পথে, কুমোরটুলির আগে, ডান দিকের গলি।

'কী ব্যাপার?'

লোকটি বলতে পারলো না কিছু।

আমি অবশ্য মনে মনে একটা আঁচ করতে পারছিলাম। জানতাম দল-পরিচালক শম্ভু ঘোষ তখন কোলিয়ারি ফিলডে বসে আছেন। আসানসোলে। গদীতে আছেন সরকার। হয়তো এমনও হতে পারে, নারাণ তাঁর দলের গান শোনার কথা বলতে পারে। ট্যাক্সি ছোট গলিতে ঢোকে না। লোকটি ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে গলিপথে ঢুকলো।

দরজাতেই দাঁড়িয়েছিলো নারাণ। আমাকে নিয়ে শোবার ঘরে গেলো। বললাম, 'সাত-সকালে জরুরী তলব?'

আমার দিকে তাকিয়ে নারাণ হাসছিলো। হাসিটা সোজা ধরনের সরল হাসি নয়। যেন অপরাধীকে ধরে ফেলেছে এমন একটি ভাব। খানিক পরে বললো 'শম্ভুবাবুকে আমি রাখবো না।'

'কেন?'

'রাখতে পারছি না বলে।' নারাণ বললো, 'আপনার সঙ্গে কিছু গোলমাল আছে নাকি ওঁর?'

'না।' বললাম আমি।

'কিন্তু আপনার লেখার জন্যে পটাপট আমার বায়না ক্যানসেল হচ্ছে।' বলেই গত সপ্তাহের একটি কাগজ মেলে দিলো সামনে। 'এই দেখুন, ভাঙাগড়ায় আপনি লিখেছেন। আমার দল থেকে যাঁরা অন্য দলে গিয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের নামের আগে আপনি একটা করে বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। আর যাঁরা এসেছেন সবাই শুকনো। নায়েক মহলে এই নিয়ে দারুণ আলোচনা। ওঁরা ভাবছেন গঠনের দিক থেকে আমার দল উইক। অথচ আমার মনে পড়ে না, আমি কিছু অপরাধ করেছি আপনার কাছে। তা হ'লে করলো কে?'

আমি হাসছিলাম।

'আমি কি খুব অযৌক্তিক কথা বললাম?' নারাণ বললো।

বললাম 'তাতে শম্ভুদার চাকরী যাওয়ার ব্যাপার আসছে কেন?'

নারাণ এবার হেসে ফেললো, 'দেখুন, আমি ব্যবসায়ী। জলে নেমে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করতে আমি নারাজ। আমি চাই না, মাঝের একটি মানুষের জন্য আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হোক।'

নারায়ণ ভট্টাচার্য খুবই যুক্তিবাদী, ঝানু ব্যবসায়ী এবং বিবেচক। উপস্থিত বুদ্ধিটাও খুবই প্রখর। এবং কৌশলী। ইংরেজিতে যাকে ট্যাক্টফুল বললে মানায়। এ সব গুণগুলো না থাকলে নারাণ সম্ভবত জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে পারতো না। যাত্রায় আসার আগে, পুব বাঙলা থেকে আসা এই শিক্ষিত বেকার কী না করেছে! শিক্ষকতা, মাছের ব্যবসায়, ব্রোকারী এবং আরও অনেক। হঠাৎ এসে পড়লো যাত্রায়। অভিনয়-জ্ঞানটা ছিলো টনটনে। দেহসৌষ্টব চমৎকার। নাকমুখ প্রখর। গায়ের রঙ কাঁচা হলুদ বর্ণ। নারাণের নামকরণ করা হলো রূপকুমার। নিউ রয়েল বীণাপানি অপেরা তখন ঠিকে দল। অর্থাৎ দলে মাসিক বেতন চালু নেই। দল চলে 'নো-ওয়ার্ক নো-পে' সিস্টেমে। এই দলটিকে নারাণ যে কেবল সুপ্রতিষ্ঠিত করলো তাই না, বছর কয়েকের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর দলে পরিণত করলো।

'সে-জন্যই আপনার শরণাপন্ন।' নারাণ বললো, 'ক্ষতি যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এখন যদি কিছু প্রশংসা করার মতো পান, লিখলে আমার উপকার হয়।'

'কিন্তু একটা শর্ত আছে।' আমি নারাণকে বললাম, 'ক্ষতিপূরণ হলে শম্ভুদার চাকরী যাওয়ার সিদ্ধান্ত কিন্তু তুলে নিতে হবে।'

নারাণ বললো, 'শম্ভুদাকে আমি রাখবো না কিছুতেই। তবে, হ্যাঁ আপনার অনুরোধে আমি মাস দুই দেখতে পারি। তারপর এ-ব্যাপারে আপনি একদম নাক গলাবেন না, তাতে আমি বিপদে পড়বো।' জানা ছিলো, নারাণের কথা মানেই কাজ।

নারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পর্কে অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন আমাকে করেছে। শিল্পী, পরিচালক কি মিউজিক স্টাফ অনেকে ও-দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আমার কাছে এসেছে। প্রশ্ন করেছে, রয়েলে যাওয়া সঙ্গত হবে কিনা এবং মালিক হিসাবে নারাণ কেমন লোক। ঘটনাগুলো ঠিক সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ এর মতন। 'প্রাফেশ্যনাল আর্টিস্ট, যাত্রার সঙ্গে যাঁরা দীর্ঘকাল জড়িত, তাঁরা সব জেনেশুনেও কেন একজন প্রতিষ্ঠিত দল-মালিক সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করে! আমি বলি, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজটি হচ্ছে মানুষ চেনা। এই পরীক্ষায় কেউ উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। সুতরাং আমি কী করে নারাণ সম্বন্ধে মন্তব্য করবো?'

তবে এই মানুষটি সম্বন্ধে চিৎপুরে নানা ধরনের গুজব প্রচলিত ছিলো। এক শ্রেণীর মানুষ ওঁকে দানব আখ্যায় ভূষিত করতো। মস্তানের মস্তান, ভালোর ভালো। ওঁ যা বলে তা করে। যদি মনে করে কাউকে নারাণ বিপদে ফেলবে তবে তাকে রক্ষা করার শক্তি কারও ছিলো না।

নারাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তখন মাত্র কয়েক বছরের। এইটুকু অভিজ্ঞতা থেকে সকলকেই আমি বলতাম, 'নারাণ যদি মদ্যপান করে তবে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু হতে পারে না, কিন্তু ও যদি সুস্থ থাকে তবে ওঁর মতো বন্ধু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।'

সেই বছর তপন, তপনকুমার চুক্তি করলো নিউ রয়েল বীণাপানি অপেরার সঙ্গে। গোড়া থেকেই দলের যাত্রায় খুব যশ। বায়না ভালো, আদায়ও; কয়েকটা মাস বেশ নির্বিঘ্নে কেটেও গেলো। ফাল্গুনের আধাআধি হঠাৎ একদিন সকালে ভয়ানক উত্তেজিত অবস্থায় তপনকুমার এলো আমার বাসায়। বললো, জান গেলেও তাকে কেউ আর রয়েলে কাজ করাতে পারবে না।

বললাম, 'তাই নাকি?' তপন বললো, 'হ্যাঁ।'

তপনকুমার খুব টিপটাপ থাকতে ভালোবাসে। যেমন সুন্দর দেহসৌষ্ঠব তেমনি প্রাণ-জুড়নো মুখাবয়ব। ফর্সা রঙ, দৈর্ঘ্য মাঝারি, একমাথা ঝাকড়া কোঁকড়ানো চুল এবং একজোড়া কালো আয়ত নেত্র। এককথায় রমনীমোহন। তপনকুমারের

জীবনে অযাচিত প্রেম এসেছে বহুবার। সে-কথা পরে বলবো। আপাততঃ নারাণের সঙ্গে তার বিরোধের প্রসঙ্গটা বলে নি।

দেখলাম ওর ফর্সা মুখ রক্তজবার মতো টকটকে লাল। মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো, রুক্ষ। এসেই ফেটে পড়লো। আমি যেন এ-ব্যাপারে একেবারেই কোনো কথা না বলি। বললে আমাকেই দুঃখ পেতে হবে। অর্থাৎ নো কম্প্রোমাইজ।

বললাম, 'হয়েছেটা কী বলবে তো ?'

'হতে আর বাকিটা কী রেখেছেন নারাণদা ?' বলতে বলতে দুঃখে অপমানে ফেটে পড়লো তপন, 'যাত্রার ইতিহাসে এতোবড় অসম্মানের নজীর নেই। শুধু কি অসম্মান, এ যে কতখানি যন্ত্রণাদায়ক আপনি ভাবতে পারবেন না।'

আমি বিরক্ত 'তখন থেকে অপমান, অসম্মান বলে বলে যাচ্ছো। ঘটনাটা বলবে তো ?' তপন বললো, 'আমি শুধু ছেড়েই দিচ্ছি না, তপনকুমার জীবিত থাকতে কখনও রয়েলে সে কাজ করবে না'

বললাম, 'রয়েল যদি অন্যের হাতে যায় ?'

তপন একটুক্ষণ ভাবলো। 'তা হলে যাবো। কিন্তু নারাণদার দলে কস্মিনকালেও নয়।'

'বেশ তো, ঘটনাটা আগে শুনি।'

তপন বললো, 'কুলটিতে দু'পালা যাত্রা গেয়ে কলকাতা ফেরার কথা। কোম্পানী তপনকে আলাদা গাড়ি দিয়েছে। তাতে তপন একলাই যাতায়াত করে থাকে। সেদিন জনাকয় শিল্পী সময় মতো বাস এ্যাটেণ্ড করতে না পারায় পড়ে রয়েছে। কলকাতা থেকে নারাণ ভট্টাচার্যও এসেছে দলে। এবার যাওয়া নিয়ে বাঁধলো বিপত্তি।'

তপন তার গাড়িতে অত লোক নিতে সম্মত নয় কিন্তু নারাণের যুক্তি বিপদ-আপদে এক-আধটু নিয়ম লঙ্ঘন হতেই পারে। দু'পক্ষের প্রবল জেদাজেদির ফল দাঁড়ালো এই যে, নারাণ পেছনের সীটে জনাকয়েক লোক বসালো। সামনে ড্রাইভারের পাশে তপনকুমার, পাশে নারাণ নিজে। এতে আবার শাস্তি কোথায় ? তপন বললো, 'একজন যুবতী মেয়েকে আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে নারাণদা একটা ভুজালী খুলে বসে রইলো। বললো, আপত্তি করেছ কি শির নিয়ে নেবো।'

আমি হেসে উঠলাম।

তপন রেগেই আগুন। 'বীভৎস, এটা কি কোন ভদ্রলোক করতে পারে!' বলতে বলতে কেঁদে ফেললো তপনকুমার, 'আমি একটা রক্তমাংসের মানুষ তো? আমার তো একটা শরীর বলে কিছু আছে। দেবতা নয় যে রিপু সংহারক হবো। এটা কী, এ্যাঁ—' আমার দিকে রোষ কষায়িত চোখে তাকালো তপনকুমার, 'আপনি পারবেন ওইভাবে আসতে?'

'তুমি পেরেছো?'

'তবে আর আপনার সঙ্গে কথা বলছে কে?'

'প্রতিবাদ করেছিলে?'

'করলেই বা শুনছে কে?'

'তবে তো ভালোই হয়েছে।' আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'জয়টা তো হলো তোমারই।'

'আমার!' তপন অবাক হলো।

'তবে কার? ঘটনা প্রমাণ করলো, তুমি বিবেকানন্দের পরেই ভারতীয় সংযমী পুরুষ।'

তপন হেসে ফেললো। বললো, 'আমাকে হাসিয়ে রাগটা জল করে দেবেন না, দাদা।'

একটা সময় ছিলো যখন রয়েলের গদীতে রেগুলার আড্ডা বসতো। রাত্রের দিকে। মধ্যমনি নারাণ নিজে। ওঁর চারপাশে থাকতো শিল্পী, পরিচালক, বাজিয়ে, মালিক প্রভৃতি। ঠিক গদীঘরে নয়, গদীর ঠিক মুখোমুখি আর একটি ঘরে জমজমাট মহফিল চলতো। আমি নিজে স্বচোখে কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। লোকমুখে শুনতাম। হঠাৎ কোনো সময় চিৎপুরে ঢুকলে, সেটা যদি সন্ধ্যাবেলা কি রাত্রি হতো তবে ঝড়ের বেগে খবর ছড়িয়ে পড়তো। গিয়ে দেখতাম দিব্যি সব টিপটাপ আছে। কিন্তু গন্ধটা যাবে কোথায়। সুতরাং ধরে নিতে অসুবিধে হতো না, চটপট বোতল গ্লাশ ওরা সরিয়ে ফেলেছে। দেখলাম, নারাণ বেশ ঠাণ্ডা ছেলের মতো তাকিয়া বুকে নিয়ে হেসে কথাটথা বলছে।

একদিন গণেশ অপেরায় ঢুকছি এমন সময় কে যেন খবরটা দিলো আমাকে। বললো, রয়েলের গদীতে জব্বর মহফিল বসেছে। সংবাদ-পত্রের একজন লোকও রয়েছেন ওই আড্ডায়। খুব খানাপিনা হচ্ছে।

বললাম, 'চলো তো দেখি একবার।' বেরুতে যাবো গোষ্ঠদা বাধা দিলেন, 'তারা যা খুশি খাচ্ছে খাক, তা নিয়ে তোমার মাথাব্যাথা কেন বাপু? যারা খাবার, খাবেই। সে গোল্লায় যাবে। আমি যে বলি, যে যত পারো দুধ খাও, খায় কেউ? ওই চায়ের সঙ্গে যতটুকু পেটে গেল ব্যাস। শালারা বোঝে না শরীরে তাগদ আসবে কোত্থেকে?'

গোষ্ঠদা, গোষ্ঠবিহারী ঘোষ, নিউ গণেশ অপেরার প্রোপ্রাইটর মহাশয়ের ওরিজিন্যাল বিজনেসটা দুধের। যাত্রাদল সেকেণ্ডারি। শখের। তাই প্রতি বছর দিব্যি ঢাকঢোল বাজিয়ে গোষ্ঠ ঘোষ জাঁকজমক করে দল গঠন করেন। সে দলের পুরোভাগে সব সময়েই থাকেন নাট্যাচার্য গোপাল চ্যাটার্জী, গোষ্ঠদা যে-গোপলার নামে অজ্ঞান। দল করে যত না লাভ করেছেন, ক্ষতির পরিমান তার চেয়ে অনেক বেশি। খেয়াল হলে যখন তখন দল বন্ধ করে দিতেন গোষ্ঠদা।

একবার একদল নায়েক এসেছেন দক্ষিণবঙ্গ থেকে। মাসটা মাঘের শেষ। দল গেছে আসামে। পরদিনই ফিরবার কথা। নায়েকরা গদীতে ঢুকে সরকারকে শুধোলেন, 'গোপালবাবু আছেন?'

গোষ্ঠদা তখন গদীতেই আছেন। মাথায় মাফলার বাঁধা, গায়ে ফ্ল্যানেলের ফুল-সার্ট, মুখময় দাড়ি; প্রশ্ন শুনে তাকালেন, 'কে-গোপাল!'

'আজ্ঞে, গোপাল চাটুজ্যে, এ্যাকটর।'

গোষ্ঠ ঘোষ অনেকক্ষণ নায়েকদের আপাদমস্তক দেখলেন। 'ছে বায়না করার বাসনায় নাকি?'

'হ্যাঁ।' নায়েকরা বললেন।

'বায়না হবে না।'

'কেন, তারিখ নেই?'

'বললাম তো বায়না হবে না।'

'আমরা গোপালবাবুর সঙ্গে কথা বলবো।'

'পারফরেন্স দিলুম নি।'

নায়েকরা অবাক। বললেন, 'পারফরেন্স দেন বা না-দেন, দেখা করতেও দেবেন না?'

'আমি মালিক। আমি দেখা করার পারফরেন্স দিলুম নি।'

'এতক্ষণে নায়েকরা পারফরেন্স কথাটার আসল অর্থ ধরতে পারলেন। 'কেন, কেন আপনি পারমিশন দেবেন না, শুনি ?'
'ছে আমার ডিসিডেণ্ট।'
'ডিসিডেণ্ট !'
'আমার খুশী।'
জেনারেল ম্যানেজার সুখেন্দুবাবু ছিলেন গদীতেই। সুখেন্দুবিকাশ রায়। তিনি চোখের ইশারা করে যতো নায়েকদের চলে যেতে বলেন, নায়েকরা ততো তককো করে। শেষ পর্যন্ত ওঁরা বললেন, ভদ্রলোক কেন আমাদের অপমান করবেন ? বলে দিলেই তো হয় গোপালবাবু নেই।
গোষ্ঠদা ততক্ষণে চটে আগুন। বললেন, 'দল করি আমি আর বায়না হয় গোপলার নামে। ছে দলে আমি পেচ্ছাপ করি।'
শেষ পর্যন্ত জয় হলো গোষ্ঠদারই। নায়েকরা চলে গেলো, গোষ্ঠবিহারী ঘোষ ডাকলেন, 'সুখেন্দু।'
'আজ্ঞে কত্তা।'
'ছে আমি কথা বলছি।'
ব্যাস, সুখেন্দুবাবু কাঠ। গোষ্ঠবিহারী ঘোষ সহজে কথা বলেন না। কিন্তু যখন তিনি নিজে ঘোষণা করবেন যে, তিনি কথা বলছেন, তখন ধরেই নিতে হবে তাঁর ওপর কারও কোনো কথা বলা চলবে না। অর্থাৎ গোষ্ঠদা চরম 'ডিসিডেণ্ট' নিলেন। এখানে ডিসিডেণ্ট কথাটাকে ডিসিসন বলে ধরে নিতে হবে।
'দল বন্ধ।' গোষ্ঠদা উঠলেন, লাঠিটা টেনে নিলেন হাতে, 'ছে লোটিশ টাঙিয়ে দাও। কাল থেকে দল জয়েণ্ট হবে নাকো।'
পেট মোটা ট্যাপা মাছের মতন গোষ্ঠদার সব কয়টি পকেট ফোলা ফোলা। হাতে লাঠি, পরনের ধুতিটা কাঁচিয়ে হাঁটুর ওপর তোলা। কিন্তু কোঁচাটা পুরোই থাকবে। সে লৎপৎ করবে মাটির সঙ্গে। কী আছে পকেটে ? টাকার নোট। মুঠো মুঠো টাকা। ইচ্ছে হলে কাউকে দেবেন, শস্তায় কিছু পেলে কিনে ফেলবেন। এবং যথারীতি তা রাস্তার কাউকে দান করে ঘরে ফিরবেন।
পরদিন সকাল নটা নাগাদ যাত্রার রাজা, গোষ্ঠদার পরম স্নেহের গোপলা সুখেন্দু-বাবুকে নিয়ে সটান আমার বাসায় উপস্থিত। গোপালবাবু বললেন, 'এই চলতি মরশুমে কর্তা নোটিশ দিয়েছেন দল বন্ধ।'

'কেন ?'

গোপাল চাটুজ্যে তখন সমস্ত ঘটনাটা আমাকে খুলে বললেন। তার সঙ্গে সায় দিয়ে গেলেন সুখেন্দুবাবু। সুতরাং আমাকে যেতে হবে।

বললাম, 'এখনই আমার পক্ষে যাওয়া কঠিন। বরং সন্ধ্যেবেলার দিকে যেতে পারি।'

গোপালবাবু বললেন, 'দলের সকলেই বসে আছে গদীতে। মদনপুরে গান আছে আজ সাতটায়। সুতরাং দল যদি গানে জয়েন করাতে হয় তো এখনই রওনা হবার আয়োজন করা দরকার। আর দল যদি ছুটি দিতেই হয়, তবে সকলের পাওনা-গণ্ডা এখনই মিটিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ লোকগুলো বাড়ি ফিরবে তো।'

চিৎপুর থেকে নতুন বাজারে ঢোকার পথে যে বিশাল অট্টালিকা, তারই দোতলায় নিউ গণেশ অপেরার গদী। গিয়ে দেখি গোষ্ঠদা যথারীতি মালিকের চেয়ার আগলে বসে আছেন। গম্ভীর হয়ে। টানা বারান্দায় ষাট পয়ষট্টি জন লোক। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। কেউবা স্তূপাকার বিছানার মধ্যে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। আমাকে দেখে যে গোষ্ঠদা খুব অবাক হলেন, তা নয়। নিজের চেয়ারটা খালি করে দিয়ে তক্তপোষের ওপর বসলেন। চেয়ারে বসতে বললেন আমাকে। ওদিকে, তক্তপোষের কোণের দিকে, দলের সরকার খাতা খুলে চুপচাপ বসে আছেন। সব নিশ্চুপ। যেন পিন পড়লে শব্দ হয়।

চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমি গোষ্ঠদার মুখোমুখি বসলাম। গোষ্ঠদা তাকিয়ে আছেন গোপালবাবুর দিকে। একদৃষ্টে। গোপাল চাটুজ্জেমশাই, যাকে বলা হয় চিৎপুরের বাঘা এ্যাকটর, তিনি কাঠগড়ায় আসামীর দাঁড়িয়ে থাকার মতো নত-মস্তকে দণ্ডায়মান। সুখেন্দুবাবুও স্থানুর মতন দাঁড়িয়ে।

'দল ছুটি।' গোষ্ঠবিহারী ঘোষ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। একটুক্ষণ সময় নিঃশব্দে কাটলো। পরে আবার গলা শোনা গেলো গোষ্ঠদার, 'আমি গোষ্ঠ ঘোষ, আমার উপরে কথা? বলে কিনা গোপলা শালা এ্যাকটোরের সঙ্গে কথা বলবে? গাদা গাদা টাকা খরচা করে গোষ্ঠ ঘোষ ফালতু বনে গেল? দল বন্ধ।' এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে লাগলেন গোষ্ঠদা। তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। আমি দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে দরজায় তাকালাম। নিশ্চুপে বসে সিগ্রেট টেনে যাচ্ছিলাম।

'সুখা!' গোষ্ঠদা ডাকলেন। বারান্দা থেকে ছিটকে আসা একটা বস্তুর মতন একজন চাকর সামনে এসে দাঁড়ালো। গোষ্ঠদা বললেন, 'চা মিষ্টি নিয়ে আয়।'

বাধা দিলাম, 'আমি কিছু খাবো না।'

গোষ্ঠদা বললেন, 'রাজভোগ নিয়ে আয় সুখা।'

'বললাম তো, আমি কিছু খাবো না।'

'তবে ডাব নিয়ে আয়। আনন্দবাজারের পেট খারাপ।'

আনন্দবাজার এবং আনন্দবাবু দু'নামেই আমাকে ডাকতেন গোষ্ঠদা। যখন আনন্দবাজার সম্বোধন বেরোবে ওঁর মুখ থেকে, ধরে নিতে হবে তিনি বিলক্ষণ চটে আছেন। আর যখন বলবেন আনন্দবাবু তখন বুঝে নিতে হবে ওঁর মেজাজ বেশ শরীফ আছে।

অগত্যা বিরক্তি প্রকাশ করতে হয়, 'আমি তো আগেই বলেছি, আমি কিছু খাবো না।'

গোষ্ঠদা আমার দিকে পেছন দিয়ে বললেন, তা হ'লে ছে তোমার কথাও আমি শুনছি না।'

আমি সিগ্রেট ধরালাম। 'দল বন্ধ করে দিচ্ছেন?'

'দিলুম।' গোষ্ঠদা গোঁজ হয়ে বসেই বললেন।

'কেন?'

'ছে আমার খুশী।' হঠাৎ ঘুরে মুখোমুখি হলেন আমার। 'আমার দল, ছে আমি বন্ধ করি না-করি তার জন্যে কাউকে কৈফিয়ৎ দেবো না।'

'কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে হবেই।' জোর গলায় আমি বললাম। 'ষাটজন লোকের মুখের অন্ন নিয়ে আমি আপনাকে ছেলেখেলা করতে দেবো না।'

'কী করবে আমার?'

'সেটা পরে বলছি।'

'কাগজে আমার গুষ্টি উদ্ধার করবে তো? করো, করো—গোষ্ঠ ঘোষ আনন্দবাজারকে ভয় পায় না।'

'দেখবো পান কি না-পান।' চেয়ার ছেড়ে আমি উঠলাম।

'যাও...যাও...', গোষ্ঠদা দু'হাতের বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে, 'তুমি আমার এইটে করবে। ছে কাল থেকে আমি দুধে জল মেশাতে বারণ করে দেবো, তখন তুমি আমার করবেটা কী শুনি?'

এরপর হাসি সংবরণ করা কঠিন। রুমালে মুখ চেপে আমি বললাম, 'কেস করবো আপনার নামে।'

তক্তপোষ থেকে নেমে এলেন গোষ্ঠ ঘোষ। 'কিসের উপ্রে কেসটা সাজাবে তুমি, এঁ্যা।'

'সম্প্রদায়ের চাকরি ছাঁটাই করার উপরে।'

'আমি মাইনে দিয়ে দেব। ছে পুরা মরশুমের পাওনা দিয়ে দল ছুটি দেব। তখন?'

'মানহানির মোকদ্দমা করবো।'

'মানহানি!' গোষ্ঠদা কেমন মিইয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'কাগজের লোককে গদীতে ডেকে অপমান করার ঠ্যালা বুঝবেন।' দরজার দিকে এগোলাম, 'আমি যাচ্ছি।'

'যাচ্ছ যাও, আমি তোমার মুখ দেখবো না সাফ বলে দিলুম।'

'আমিই কি আপনার মুখ দেখবো ভেবেছেন।'

হনহন করে চৌকাঠের দিকে এগোলাম। যেন চলেই যাচ্ছি এই ভান করি। হঠাৎ পেছন থেকে ডাকলেন গোষ্ঠদা, 'শোনো।'

'বলুন।' পেছন না ফিরে বললাম।

গোষ্ঠদা এগিয়ে এসে হাত ধরলেন আমার। 'ছে ঠিক আছে বাবা, ঘাট হয়েছে আমার।' টানতে টানতে এনে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। 'বিচারটা তুমিই করো।'

'কিসের বিচার?'

সুখা কখন যে তার কর্তব্য সম্পাদন করেছে জানি না। হঠাৎ দেখি টেবিলে এক হাঁড়ি রাজভোগ।

'খাও, খেয়ে আগে মেজাজটা ঠিক করে নাও তো। ছে বিচারের কথা পরে বলছি।' ঘরের সকলকে মিষ্টি বিলি করলাম। গোষ্ঠদা ডায়বেটিসের রোগী। মিষ্টি খাওয়া বারণ। তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে আমার খাওয়া দেখলেন। জল খেয়ে গ্লাসটা আমি টেবিলে রাখলাম। গোষ্ঠদা বেশ বড গোছের একটা উদ্গার ছাড়লেন। পরম তৃপ্তির ঢেঁকুর। 'তুমিই বলো, দলটা কার? গোপলার না আমার?'

'আপনার।' আমি বললাম।

'তবে দল বন্ধ করার রাইটার আমার আছে কি নেই ?'

'রাইট আছে।'

'তবে তক্কো করছিলে কেন ?'

জবাব দিতে গিয়েছিলাম, গোষ্ঠদা আমার মুখ চেপে ধরলেন। ডাকলেন সুখেন্দুবাবুকে, 'ছে সবাইকে কুড়ি টাকা করে বখসিশ দিয়ে দাও। গান হবে। ছে আনন্দবাবুর হনারে আমি অডাসিটি দিলুম।'

অবাক হবেন না। গোষ্ঠদার ইংরেজি ওইরকমই। অনার কথাটার আগের এইচটা হয়তো মনে বিঁধে থাকবে গোষ্ঠদার, তাই অনারটা অনায়াসে হনার হয়। আর অর্ডার কথাটা যে কেন অডাসিটি হয় তাও কি বুঝিয়ে দিতে হবে ?

খবর পাওয়া সত্বেও নিউ রয়েলের মহফিল ভাঙতে যাওয়া হলো না। গোষ্ঠদার নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করা যায় নি। গোষ্ঠ ঘোষ ওই সময়টুকু আমাকে আটকে রাখলেন। যাত্রাশিল্পে গোষ্ঠবিহারী ঘোষের দান, তার কাঁধে পা রেখে কোন কোন আর্টিস্ট পটাপট সিঁড়ির ধাপ পেরুলো তার কাহিনী, মায় গোষ্ঠদার দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে প্রসঙ্গটাও বাদ গেলো না। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়, সকালের গোষ্ঠ ঘোষ এবং বিকেলের গোষ্ঠবিহারী ঘোষের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। সকালের হাঁটুর ওপর তুলে কাপড়-পরা লোকটা বিকেলে কেমন ফুলবাবুটি সাজতে পারেন গোষ্ঠ ঘোষকে না দেখলে তা অনুমান করাই শক্ত। তাঁর পরণে ফরাসডাঙা ধুতি, গায়ে গিলে-করা চুড়িদার পাঞ্জাবী, চওড়া পাড়ের দামী শাল আলতো করে গায়ে জড়ানো, গলায় সোনার চেন, গায়ে আতরের উগ্র গন্ধ।

কিছুতেই ছাড়তে চাইছেন না গোষ্ঠদা। তখন আমাকে চালাকির আশ্রয় নিতেই হলো। লোকমুখে কিছু যে শুনি নি তা নয়, বাকিটা বানিয়ে দিলাম। বললাম 'রাত নটা বাজতে চললো গোষ্ঠদা, ওদিকের কথাটা ভাবছেন ?'

'ছে কোন দিকের ?' প্রথমটা চমকে উঠলেন। মুহূর্তে দেখলাম স্বাভাবিক। হাসছিলেন, 'বললেন গোপলা শালা সে কথাটাও কানে তুলে দিয়েছে তোমার ?'

বললাম, 'কানে তুলবে কেন ? বুঝি না ?'

হেসে যাচ্ছিলেন তখনও। বললেন 'চিৎপুরটা শালা একটা আস্তাকুঁড় হয়ে গেছে। যত আকথা-কুকথা নিয়ে কারবার।' দু' মুহূর্ত থেমে কি ভাবলেন, 'তুমি

লুকোলে কী হবে, ঠিক ধরেছি, এ-শালা গোপলার কাজ।' হঠাৎ মাথাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'হারামী শালা নামটাও তোমাকে বলে দিয়েছে নাকি ?'

মিথ্যে করেই বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তবেই বোঝো শালা, ঘরের শত্রু বিভীষণ নিয়ে আমার কারবার। আমি গোষ্ঠ ঘোষ, নগদা পয়সার কারবার করি। হাজারবার যাবো, হাজারটা রাখবো ; তা গোপলা শালার বাপের কী ?'

'কিছু না।' বললাম আমি, 'গোষ্ঠদা, এ-দিকে সোয়া নটা বাজলো।'

আমার হাঁটুর ওপর একটা জব্বর থাবড়া মেরে গোষ্ঠদা হাসিতে ফেটে পড়লেন। 'ঠিক বলেছ। সাড়ে নটার মধ্যে না গেলে মেজাদ একেবারে কামরাঙা হয়ে যায়। এটাও নিশ্চয় বলেছে গোপলা শালা ?'

হাসতে হাসতে বেড়িয়ে গেলেন নিউ গণেশ অপেরার মালিক গোষ্ঠ ঘোষ। চিৎপুরের মানুষরা বলে : সাপের হাঁচি আর গোষ্ঠ ঘোষের হাসি। কিন্তু গোষ্ঠ ঘোষ হাসেন। সে-খবর রাখেন গদীর বৃদ্ধ সরকার। এবার দেখলাম আমি। শুধু হাসিই নয়। গোষ্ঠদা মনের আনন্দে সরু শিস দিতে দিতে, হাতের লাঠি দুলিয়ে বেড়িয়ে গেলেন। অবাক হয়ে আমি সরকার মশাইয়ের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালাম। সরকার হাসতে হাসতে ঘাড় নামালেন। অর্থাৎ আমার অনুমান সত্য। গোষ্ঠবিহারী ঘোষ সত্যিই হাসেন।

নিউ গণেশ থেকে সরাসরি নিউ রয়েলের গদীর দিকে আসছিলাম। ট্রাম-লাইন থেকে ডানদিকে উঠে গিয়ে, একজন ঢোকার মতন সরু একফালি পথ। একদম শেষপ্রান্তে রয়েলের গদীঘর। গলিতে ঢুকতে যাবো, দেখি কে একজন ঝড়ের বেগে ছুটে ভেতরে গেলো। বুঝলাম। দাঁড়ালাম অল্পক্ষণ। তৈরি হতে সময় দিলাম ওঁদের।

ঢুকে দেখি সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আড্ডা ঘরের দু'টো দরজাই বন্ধ। গদীঘরে জনাকয়েক লোক। মালিকের চেয়ারটা খালি। পাশের তক্তপোশের ওপর বালিশ বুকে দিয়ে শুয়ে আছে নারাণ। একজন প্রবীন অভিনেতা তার পা টিপছে। 'বসুন,' নারাণ বললো। ওর গলা বেশ স্বাভাবিক। একটুও দুলছে না, জড়াচ্ছে না। অথচ চোখেমুখে লেগে রয়েছে নেশার ঘোর, 'এই অসময়ে হঠাৎ !'

বললাম, 'চিৎপুরে এসেছিলাম, ভাবলাম একবার দেখে যাই।'

'সরবৎ বলি ?'

'এত রাত্রে সরবৎ !'

'মালাই সরবৎ', নারাণ বললো। 'এ-সরবৎ আপনি পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাবেন না। স্পেশালি মেড ফর গ্রেট ক্রিটিক।'

'আমি তেল খাই না।' হাসতে হাসতে বললাম।

'কিন্তু আমরা দিই।' নারাণ হাসছিলো, 'জায়গার মতন জায়গা পেলে সিঁদুরও চাপাই।'

বললাম, 'চোখ দেখেই বুঝতে পারছি।'

একটু সন্ত্রস্ত হলো নারাণ। নড়েচড়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলো, 'এতক্ষণে বুঝলাম, সিঁদুরে চোখের সন্ধানেই আপনার আগমন।'

কথা বলছি আর আড়চোখে আড্ডার ঘরটা লক্ষ্য করে যাচ্ছি। খবর পেয়েছিলাম, মৌচাকে মাছি বসেছে। বেচারী ! মনে মনে আমি হাসলাম। বেরুলেই চোখে পড়বে এবং তখন লজ্জায় মুখ লুকোবে কোথায় বাছাধন ? ভদ্রলোককে আমি বিলক্ষণ চিনি। ওকে একটু জব্দ করার দুষ্টু খেয়াল আমাকে পেয়ে বসলো। উঠবার নাম করছি না একেবারেই।

নারাণ জানতো, বড় জোর দশ কি পনেরো মিনিট আমি থাকবো। সরবৎ পান করিনি। জানি, নারাণ হয়তো ইশারায় ওতে মাদক দ্রব্য মিশিয়ে দেওয়ার কথা বলতে পারে। চা খেলাম পরপর তিন কাপ। সিগ্রেট পুড়িয়েছি গোটা আষ্টেক। ঘড়িতে তখন সাড়ে দশটা বাজে।

নারাণ বিরক্ত হচ্ছিলো না ঠিক, কিন্তু উসখুস অস্বস্তি ভোগ করছিলো এবং থেকে থেকেই বেচারী অত্যন্ত অসহায়ের মতো আমাকে দেখছিলো, আর চোখ রাখছিলো বাইরের ঘরের বন্ধ দরজায়। অবশেষে নারাণ আমাকে বাড়ির বাইরে দীর্ঘ রজনী অতিক্রান্ত করার কুফল বোঝাতে লাগলো। যেহেতু আমি গেরস্থ, ছা পোষা মানুষ।

ওঁর কোনো অস্ত্রেই আমি ঘায়েল হইনি। বলা চলে, আমাকে ঘায়েল করতে পারে নি। অগত্যা তখন আমার স্ত্রী এবং কন্যার দোহাই পাড়তে শুরু করলো। বোঝাতে চাইলো, আমি যতক্ষণ বাসায় না ফিরবো ততক্ষণ আমার সহধর্মিনী পথ চেয়ে বসে থাকবেন। কচি মেয়েটা ক্ষিদেয় কষ্ট পাবে। সৎ স্বামী এবং দায়িত্বশীল পিতার কি উচিত তাদের কষ্ট দেওয়া ?

তূণের সবগুলো অস্ত্র ব্যর্থ হলে, নারাণ তার গাণ্ডীবে শেষ শর-যোজনা করতে বাধ্য হলো। রাত্রি এগারোটার পর ট্যাক্সিআলারা তাঁদের ট্যাক্সি মালিকের ঘরে জমা দিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। সুতরাং এখান থেকে বরানগর যাওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। আর বাড়ি ফিরতে না পারলে গৃহিনী নিশ্চয় সন্দেহের দৃষ্টিতে স্বামীকে দেখতে পারেন। সন্দেহটা যদিও মিথ্যে কিন্তু এই নিয়ে পারিবারিক অশান্তি জমে ওঠাটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং অপবাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এবং গৃহশান্তি বজায় রাখার কারণে এখনই আমার এই স্থান ত্যাগ করা উচিত। রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ নারাণ একটা ট্যাক্সি ডেকেও আনলো।

আমি কিন্তু দিব্যি গল্পের আসর জমিয়ে বসেছি। ও-ঘরে কী হচ্ছে তা শোনবার জন্যে কানও খাড়া করে রেখেছি। বুঝতে পারছি ভেতরের মানুষটি রাগে ক্ষোভে আক্রোশে আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়ছেন। দরজা খুলে যে বেরিয়ে যাবেন, তারও উপায় নেই। কারণ বেরুলেই আমার দৃষ্টিবাণ ওঁর ওপর আছড়ে পড়বে।

রাত পৌনে একটায় বাধ্য হয়ে আমাকেই উঠতে হলো। বন্ধ ঘরের বেচারী প্রতিজ্ঞা করেছে, সে কিছুতেই ধরা দেবে না আমার কাছে।

পরদিন সন্ধ্যেয় নারাণই ফোন করলো আমাকে। বললো, গত রাত্রের সেই ভদ্রলোক আমার ওপর রেগে গিয়ে খেতে খেতে আউট হয়ে যান। অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছিলো। ওঁর স্ত্রী শুধিয়েছিলেন, তার কর্তাকে আনা হলো কোথা থেকে। লোকজনেরা বলেছে চিৎপুর থেকে। আজ দুপুরে খবর এসেছে ভদ্রলোক এখন হাসপাতালে। তার স্ত্রী অনুগত স্বামীকে শাস্তি দিতে গিয়ে যষ্টির আঘাতে ধরাশায়ী করেন, যার নীটফল হাসপাতাল।

ফোনেই হাঃ হাঃ করে হাসছিলো নারাণ। বললো, 'জান থাকতে আর ও-বেচারী চিৎপুর মাড়াবে না কোনোদিন।'

বললাম, 'যিনি পা টিপছিলেন ?'

'দশটা টাকা না নিয়েই ছাড়লো না। বললো, ওঁদের দলের গান বন্ধ। বাড়িতে মেয়েটার ভীষণ অসুখ। তাই আমি ওঁকে মাতাল করে দশটা টাকা দিলাম। আবার সেই টাকাতেই আনা হলো ছোট একটা পাইট। ভদ্রলোক কথা দিয়েছেন, আগামী মরশুমে আমার দলে কাজ করবেন। সইসাবুদ করিয়ে নিয়েছি।'

পরের মরশুম শুরু হবার অনেক আগে, শ্রাবন মাসে, যাত্রাদলের মহলার সময় ভদ্রলোককে দেখলাম অন্য দলের গদীতে। মালিক বললেন, 'এঁকে রাখলাম দাদা। মাইনে একুশ শো, অ্যাডভান্স পাঁচ।'

আমি অবাক। কারণ নারাণ আমাকে বলেছিলো, ভদ্রলোক নাকি আরও তিন দফে টাকা নিয়েছেন। মোট দাদনের পরিমাণ হয়েছে তেত্রিশ শো টাকা।

আমি ভদ্রলোককে শুধোলাম, 'রয়েলে থাকছেন না আপনি?'

মুখটা যতদূর সম্ভব বিকৃত করে অভিনেতা বললেন, 'নারাণ ভট্টাচার্যের দলে কি কোনো ভদ্রলোক চাকরী করে?'

'কেন আপনি তো থাকবেন বলে দাদনও নিয়েছেন।'

'না নিয়ে কী করি বলুন?' ভদ্রলোক জানালেন, তিনি যে দলে কাজ করছিলেন, হঠাৎ সে-দল ছুটি হয়ে যাওয়ায় বিপদে পড়েন। বাড়িতে অসুখ বিসুখ লেগেই আছে। টাকারও প্রয়োজন। সুতরাং মাইনে কম করার কথা বললেই নারাণ ভট্টাচার্য টাকা দেবেন, এই সার-সত্যটা তাঁর নাকি জানা। সুতরাং তখন চলবার মতন টাকা এ্যাডভান্স নিয়েছেন বটে, আসলে তিনি তখনই স্থির করে নিয়েছিলেন যে, রয়েলে তিনি কাজ করবেন না কিছুতেই।

'নারণের দলে কাজ করার অসুবিধেটা কী?' আমি শুধোই ভদ্রলোককে।

'পুরো সিজনের মাইনে পাওয়াই কঠিন ওখানে।'

'তাই বুঝি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'তাই নয় তো, তাই নয়। মাইনে কম, এ্যাডভান্স নীল। তার ওপর এক-আধটু বিপদআপদ হলো কি অমনি সিকিটা আধুলিটা বাদ। আরও যা আছে শুনলে আপনার চক্ষু চড়কগাছ না হোক ছানাবড়া হবেই।'

কথাগুলো শুনতে মজাদার কিন্তু বিশ্বাস করা কঠিন। নারাণ মালিক হিসাবে শ্রেষ্ঠ এ-সাফ'ই নাইবা গাইলাম। কিন্তু এ-দলে কাজ করেন নি এমন শিল্পী যাত্রায় খুব কমই আছেন। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ থেকে শুরু করে শান্তিগোপাল এবং শান্তিগোপাল থেকে শুরু করে তপনকুমার পর্যন্ত শিল্পীরা সকলেই এখানে সুখেই মরশুম কাবার করেছেন। থিয়েটার থেকে এ-দলে এসেছেন মহেন্দ্র গুপ্ত, নীতিশ মুখার্জী, দীপক মুখার্জী, মিহির ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। দক্ষ পরিচালকরাই কি এখানে কম ছিলেন?

সে বছরের ফাল্গুন মাসেই আবার ওই অভিনেতার সঙ্গে রয়েলে দেখা। আমাকে

দেখেই আৎকে উঠলেন ভদ্রলোক। মুখ নিচু করে বসে রইলেন। নারাণ বললো, 'এঁকে আগামী মরশুমের জন্য রাখলাম দাদা।'

শোভাবাজার রাজবাড়ির যাত্রা উৎসব করার আগ থেকেই নারাণের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট পরিচয়। গত কুড়ি বছর ধরে যা দেখছি, তাতে নারায়ণ ভট্টাচার্য সম্বন্ধে বলা যায়, ও একটু জেদি, চরমপন্থী, আন-কম্প্রোমাইজিং এবং এ্যাগ্রেসিভ। হৃদয় বলতে যা বোঝায়, ক্ষেত্র-বিশেষে তা খুবই বড়ো। ট্যাকটফুল ব্যবসায়ী বলে এ-ক্ষেত্রে কোনোরকম ক্ষতি সহ্য করতে সে নারাজ। এই বাণিজ্য-সচেতন মানুষটিকে ঘিরে চিৎপুরের গুজবের অন্ত নেই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি ওঁর গুণের স্তূপটাও হিমালয়ের মতো উঁচু, খাড়া ; যা দেখতে গেলে একটু কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। যাত্রার একজন অভিজ্ঞ প্রযোজক—বাংলায় যে-অর্থে প্রযোজককে আমরা লগ্নীকার বলি, সেটা ভুলে গিয়েই যদি ধরি প্রযোজক আসলে প্রোডাকশন এক্সিকিউটিভ—অর্থাৎ তাঁকে শিল্পের সবটাই বুঝতে হবে ; সকল বিষয়ে তার দক্ষতা থাকাও প্রয়োজন—এই অর্থে নারাণ একজন সেরা প্রযোজকও। অভিনয়শিল্পের সকল কোণ এবং কেন্দ্র সম্বন্ধে নারাণের জ্ঞানভাণ্ড টনটনে।

সে মরশুমে রয়েলের ঘরে তিনখানি পালা। সুপারহিট প্রোডাকশন 'মূর্খের পাঁচালী'। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে আমাদের শাসনযন্ত্র, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবক্ষয়কে ব্যঙ্গ করে রচনা করেছিলেন পালাটি। সর্বত্র যশ। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ নারাণ গাড়ি নিয়ে আমার অফিসে উপস্থিত। শুভাগমনের হেতু শুধোলাম। জবাব দিলো না। বললো, তার সঙ্গে আমাকে বেরোতে হবেই।

'কোথায় ?'

'অমুক থানায়।'

'কিছু গোলমাল হ'লে না হয় ফোনেই সমাধান করা যাক।'

নারাণ বললো, কোনো গোলমাল নেই। তবে আজ ওই থানায় একটা মজা হবে। সেটা দেখানোই নারাণের উদ্দেশ্য।

'মূর্খের পাচালী' পালাটি আমার দেখা। তবু কী মজা হয় দেখতে গেলাম। অবশ্য না গিয়েও উপায় ছিলো না। নারাণ একবার যখন হাজির হয়েছে, না নিয়েই ছাড়বে না।

যেতে যেতে গাড়িতেই শুনলাম, নায়েকপার্টি নাকি টাকা না-দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। খবর এসেছে গদীতে। সুতরাং কালবিলম্ব না করে নারাণের যাত্রা।

থানায় যখন পৌঁছলাম তখন রাত আটটা। যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। পুলিশ-কোয়ার্টারেই গান। নারাণ নামবার সময় গাড়ির ব্যাক থেকে একটা ব্যাগ নিয়ে নামলো। সাজঘরে ঢুকে, একটা টেবিলের ওপর বিদেশী মদের একটা বড়ো বোতল এবং তার পাশে একটা নেপালী ভূজালী রেখে চেয়ার টেনে আমাকে পাশে বসালো।

ততক্ষণে আমি আধমরা। নারাণ যদি বোতল খোলে, ও আমাকে রেহাই দেবে না কিছুতেই। জোর করে আমাকে নেশাগ্রস্ত করার একটা পৈশাচিক আনন্দ ওঁর মধ্যে বহুবার দেখেছি। আমার ওপর জোর করে, সারারাত ধরে কলকাতা শহরময় গাড়িতে টহল দিয়ে ভোর-রাত্রে ও আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছে একাধিকবার। সুতরাং আমি আতঙ্কিত হোলাম। আজই যে নারাণ আমাকে রেহাই দেবে এটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি কাঠ হয়ে আছি।

নারাণ দল-ম্যানেজারকে ডাকলো, বললো নায়েকদের ডেকে দিতে।

নায়েক মানে পুলিশের কর্তারা। তাঁদের একজন এলেন। ঢুকতে গিয়ে টেবিলের ওপর চোখ পড়তেই ভয়ানক চমকে উঠলেন তিনি।

নারাণ বললো, 'ফুরনের টাকাটা ?'

ভদ্রলোক ঢোঁক গিললেন, যেন গলা শুকিয়ে কাঠ।

লোকটি চলে যাচ্ছিলো। পেছন ডাকলো নারাণ, 'শুনুন, আমার নাম নারায়ণ ভট্টাচার্য। সঙ্গে করে আমি দু'টোই এনেছি···' নারাণ আঙুল দিয়ে টেবিল দেখালো, 'যে কোনো একটা আপনারা বেছে নিতে পারেন।'

'মূর্খের পাঁচালী' পালায় স্বরাষ্ট্র বিভাগ, অর্থাৎ পুলিশকে খুবই সমালোচনা করা হয়েছিলো। পুলিশের লোকরা যে আপত্তির গুঞ্জরণ তোলে নি, তা নয়, কিন্তু তা প্রতিবাদ হয়ে নারাণের কাছ পর্যন্ত আসে নি। ফুরনের পুরো টাকাটাও ওঁরা দিয়ে দিয়েছিলেন।

শম্ভুদা, শম্ভুনাথ ঘোষ কিন্তু জানতেনই না যে, তাঁর বিরুদ্ধে নেওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থাটার চেহারা হয়েছে চরম। নারাণের শরীর খারাপ ; সে যেতে পারে নি সঙ্গে। তবে লোক দিয়েছিলো। সেই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো আসানসোলে।

ফটোগ্রাফার হিসাবে সঙ্গে গিয়েছিলো রুমু, রণজিৎ সরকার। শিক্ষাবিদ ভবতারণ সরকারের নাতি রুমু কেমন করে আমার কাছে এলো, কেনই বা তাকে আমি বর্জন করলাম সে এক ইতিহাস। ছবি তুলে রণজিতের আয় হতো সামান্যই ; কিন্তু খরচ ছিলো ওর পর্বতপ্রমাণ।

আসানসোলে পৌছলাম আমরা সূর্য প্রায় পাটে বসা বিকেলে। স্টেশনে লোক ছিলো। আমরা যখন রিক্সা করে এসে অবন্তিকা হোটেলের সামনে পৌছলাম, দেখি শম্ভুদা সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে। ওঁর সারা মুখে খুশীর বন্যা থইথই করছে। 'খবর পেয়ে গেছি দাদা, ঘণ্টাখানেক আগেই নারাণ ফোন করেছিলো।'

আমি চমকে উঠলাম। নারাণ কি তবে ট্রাংকে তার সিদ্ধান্তের কথাও জানিয়ে দিয়েছে নাকি ! শম্ভুদার মুখের উজ্জ্বল হাসি দেখে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করলাম। নারাণ যদি ফোনে শম্ভুদাকে বরখাস্ত করার কথা জানাতো, তবে কি ওই মুখে এই হাসির উদ্ভাস সম্ভব হতো।

'আমি কিন্তু আপনার ঘরেই থাকবো।' আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করি।

'নিশ্চয়', শম্ভুদা নিজেই আমার ট্যুর-ব্যাগটা টেনে নেন রিক্সা থেকে। 'আলাদা থাকতে চাইলে, তারও ব্যবস্থা আমি করেই রেখেছি। দু'নম্বর রুমটা বুক করে রাখা হয়েছে। টু সীটেড রুম।'

'ওটায় বরং রুমু থাক।' আমি একটা সিগ্রেট ধরালাম। 'আমরা দু'জনে একঘরে থাকবো।'

শম্ভুদার ঘরে অধিষ্ঠান হওয়ার অনেকগুলো কারণ ছিলো। ভদ্রলোক দারুণ শৌখিন লোক। মাস, দেড় মাসের জন্য থাকবেন বলে হোটেলের ঘরটাকে নিজের মতো ছিমছাম করে গুছিয়ে নেন। পরিপাটি গোছানো ঘরে থাকতে ভালোবাসেন। জানলার পর্দা, দরজার পর্দা, টেবল-ক্লথ নিজের পছন্দসই। প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটা বস্তু হাতের কাছেই। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও শম্ভুদার একটা স্বতন্ত্র রুচি আছে, যা আমার সঙ্গে মেলে। দ্বিতীয়তঃ নারায়ণচন্দ্রের ওই সিদ্ধান্ত শুনে আসার পর দুঃখকে মনের আড়াল করতে পারছিলাম না কিছুতেই। এই মরশুমেই যদি শম্ভুদা বেকার হয়ে পড়েন তবে তার চেয়ে বড়ো লজ্জা আর আমার কিছু হবে না। এই সহানুভূতি এবং টানই শম্ভুদার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে আমায় উৎসাহিত করেছিলো।

সেদিন রাত্রেই রাণীগঞ্জ পেপার মিলে নিউ রয়েলের গান। পালা 'কবি চন্দ্রাবতী'। রচনা পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র। নামভূমিকায় ছিলো পুতুলরাণী, যার আসল পরিচয় হি-উওম্যান ; যাত্রার ট্রাডিশন অনুযায়ী পুরুষ রাণী। ওঁর স্বামী সেজেছিল শান্তিগোপাল।

চা জলপান শেষ করে শম্ভুদার ঘরের দু'নম্বর বেডের মখমলের মতন শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। ঠিক সন্ধ্যে ছটার সময় শম্ভুদা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। তার মুখচোখ বিষণ্ণ। বলছিলেন কী এক সর্বনাশ নাকি হয়ে গেছে।

সর্বনাশ! আমি আবার চমকে উঠলাম। তা হ'লে কি এইমাত্র আবার নারাণের ফোন পেয়েছেন যে, ওঁর চাকরী আর রয়েলে নেই! ভয় পাওয়া এবং সিঁটিয়ে যাওয়া যাকে বলে আমার মধ্যে তারই যুগপৎ ক্রিয়া। মনে মনে আমি নারাণকে গালাগাল দেবার চেষ্টা করেছিলাম : তোমার একটু তর সইলো না বাপু! এত আগে থেকে জানিয়ে দিয়ে একটা মানুষকে কেন অসহায় ব্যক্তির মতো নীল জলধিতে ছুঁড়ে দেওয়ার ফন্দি।

না, শম্ভুদার কথাই শেষ পর্যন্ত আমাকে আশ্বস্ত করলো, কলকাতার ফোন নয়। আসলে রাণীগঞ্জে যাওয়ার জন্য যে-গাড়িটি ঠিক করা হয়েছিলো, তার ব্রেক ঢিলে, এ্যাকসিলেটর আউট-অভ-অর্ডার। গাড়িটাকে সারিয়ে টিপটপ কণ্ডিশানে আনতে আরও ঘণ্টা দু'য়েক সময় নেবে। গোটা আসানসোল চষে আর কোনো গাড়ি পাওয়া যায় নি। অথচ দল দিন চারেক এ-দিকে থাকবে না কাল থেকে। তা ছাড়া পরবর্তী চারদিনের প্রোগ্রাম আমি ঠিক করেই চলে এসেছি। দল-মালিকদের বলেই দেওয়া আছে, কোনদিন কার পালা দেখবো আসানসোল এলাকায়।

কী করা যায়? কেবলমাত্র মুস্কিলআসানই ভরসা। শম্ভুদা বললেন, 'প্রোগ্রাম ক্যানসেল। অতো কষ্ট করে আপনাকে আমি যেতে দিচ্ছি না।'

'তার মানে যাওয়ার রাস্তা আছে?'

'হ্যাঁ', শম্ভুদা বললেন, 'গাড়ি একটা আছে কিন্তু তার সামনের কাচ নেই।'

বললাম, 'কুছ পরোয়া নেই। ওতেই যাবো।'

শম্ভুদা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'দূর, ওই গাড়িতে গেলে ঠাণ্ডায় মরে যাবেন।'

'মরলে মরবো।' আমি বললাম, 'এখন না দেখে নিলে, আবার কবে দেখবো জানি না। তা ছাড়া নারাণও অসন্তুষ্ট হবে।'

আমি এক ধরনের আতঙ্কে ভুগছিলাম। রয়েলের গান না শুনে যদি ফিরে যাই তবে নারাণের হাতের শম্ভু বধের খড়্গটা তক্ষুনি নেমে আসবে। 'আপনি, শম্ভুদা, ওই গাড়িটাই ঠিক করুন।'

শম্ভুদা বললেন, 'খেলবাজি ওই গাড়িতে যাওয়া যা-য় ?'

'যাবে।' আমি বললাম। 'যেতেই হবে। না হলে আমার আসানসোল-প্রোগ্রামটাই হবে মাটি।'

অগত্যা আমার জেদই বজায় থাকলো। গাড়িতে উঠলাম। শম্ভুদা তাঁর গায়ের শালটা খুলে আমার মাথায় ঢাউস এক পাঞ্জাবী পাগড়ি বেঁধে দিলেন। গোটা তিনেক কম্ফর্টার একত্র করে বেঁধে দিলেন গলা। গলা-বন্ধ কোটের বোতামগুলো সব লাগিয়ে একখানা অস্ট্রেলিয়ান কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দিলেন আমাকে। কল্লু এবং সঙ্গের লোকটিকে বলে দিলেন, ফেরবার সময় যদি ঠিক একইভাবে আমাকে না সাজানো হয় তবে তিনি রাত্রিতেই রাবণ-বধ পালা শুরু করে ছাড়বেন।

বুঝুন আমার অবস্থা!

ওমা গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো বরফ শীতল হাওয়া যেন চাকভাঙা অজস্র ভীমরুলকে ডেকে এনেছে। প্রায় ক্রেট করা, গানি-প্যাকড মালের মতো আমি বস্তুর বিশাল প্রাচীর ভেদ করে ওরা হুল চালিয়ে দিচ্ছে ভেতরে। আ-ঢাকা চোখ মুখের চামড়ায় জলাতঙ্ক রোগের মোটা মোটা সিরিঞ্জ আথালি পাথালি ঠুকরে যাচ্ছে আমাকে। কিন্তু মাভৈ। শীতের রণদামামাকে চাকায় পিষে আমার হুড বিহীন অ্যাম্বাসাডার ঝড়ের বেগে এগিয়ে চললো রাণীগঞ্জ পেপার মিলের দিকে।

শম্ভু ঘোষ মানেই এলাহি আয়োজন। রাত দেড়টা নাগাদ আর এক যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্ত করে হোটেলে ফিরে দেখি গরম গরম খাবার রেডি। পাশেই ধোপ-দুরস্ত দুধ-সাদা বিছানার আরাম আমাকে প্রচণ্ডভাবে টানছিলো। চটপট কার্য শেষ। শয্যায় ডুবে যাওয়া। কিন্তু সুখ-শয্যাও যে কতখানি কণ্টকশয্যা হয়ে উঠতে পারে সেদিন বুঝলাম। সারাটা রাত তেত্রিশ কোটি দেবতাকে বারংবার দৃষ্টির আসনে টেনে এনে, শ'খানেক বার উলটো করে শতকিয়া স্মরণ করেও নিদ্রাদেবীর করুণা আকর্ষণ করতে পারলাম না। শম্ভুদার সম্ভাব্য বেকার-ভবিষ্যতের চিন্তা কিলবিলে জোঁকের মতো আমার মগজকে তোলপাড় করে ছাড়ছে।

শেষ পর্যন্ত, ভোর ভোর সকালে একটা রাস্তার কথা ভেবে নিতেই হলো আমাকে। সাত-সকালে বেড-টি সহ বেয়ারাকে নিয়ে শম্ভুদা সামনে এসে দাঁড়ালেন। রাত্রি জাগরুকের কাছে এ-এক ভীষণ লোভনীয় পানীয়। আমি শম্ভুদার চোখে তাকালাম। রুক্ষ শুষ্কতা ওঁর চোখে মুখে। আতেলা একরাশ ধূসর চুল অবিন্যস্ত। বুকের ভেতরটা আমার হঠাৎ দারুণ তোলপাড় করে উঠলো। তবে কি আমি রাণীগঞ্জে প্রস্থান করার অবকাশে খবরটা পৌঁছে গেছে? কিন্তু রাত্রে খাবার টেবিলে তো এ-কথা আলোচনা করেন নি শম্ভুদা। তবে কি ইচ্ছে করেই চেপে গিয়েছিলেন আসল সত্য?

'রাত্রে ঘুম হয় নি দাদার?' চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে শম্ভুদা তাকালেন আমার চোখে।

'এঁ্যা!' ভয়ানক চমকে উঠলাম। শম্ভুদা কি ধরে ফেলেছে আমাকে?

'না', আমি আমতা-আমতা করি। 'মানে অত রাত্রিতে শোওয়া কিনা।'

'দেখলাম, এ-পাশ ওপাশ করছেন।'

'জেগে ছিলেন আপনিও?'

'মনটা খারাপ।' শম্ভুদা বললেন, 'প্রেসারটা হাইহাই লাগছিলো।'

'আচ্ছা—' চা খেতে খেতে তাকালাম। 'জীবনবাবু কি আছেন?'

'এসেছেন।' শম্ভু ঘোষ বললেন, 'অবন্তিকাতেই আছেন, রুম নম্বর তেরো।'

'একলা?'

'একলাই। একটু বেশিমাত্রায় খান কিনা।'

আমার চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো; বুঝতে পারলাম।

সে-বছর নবরঞ্জন অপেরার পরিচালক কমল খাঁ। হরিপদ বায়েনের ছাত্র। ভালো অভিনয় করেন, এ্যাকটিং সেন্সটাও স্ট্রং, দেখতে সুপুরুষ, রঙ ফর্সা। প্রয়োজনে রাজা সাজেন, রাণীও। দু'দিকেই ওস্তাদ। মিঠে কথার রাজা কমল খাঁ খেলাচ্ছলে বলার মতন করে আমাকে একদিন বলেছিলো, সৎসঙ্গ থেকে নাকি ডাক এসেছে ওর। এ-মরসুমটা কাটিয়ে কমল ধৃতিশ্রীতে জয়েন করবে। এ্যাডভান্সের টাকা নেওয়া হয়ে গেছে। ঠাকুরের ছেলে নাকি লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে বিশাল দল করবেন।

রাত্রেই মনে পড়েছিলো কথাটা। নবরঞ্জনের পরিচালক তা হ'লে কে হবেন? তৎক্ষণাৎ মনে মনে আমি শম্ভু ঘোষকে ওই সিংহাসনে বসালাম। এও ভেবে

নিলাম যে, সকালে যদি আসানসোলেই জীবন দাসকে পাই, তবে তক্ষুণি কাজটা হাসিল করে ফেলবো।

কোলিয়ারিতে তখন যাত্রা হতো লাগাতার। খনি শ্রমিকদের হাজিরী বা ভাবনী থেকে টাকায় এক পয়সা করে কেটে নেওয়া হতো রিক্রিয়েশন ফাণ্ড পুষ্ট করার জন্য। সারা বছরের ওই জমানো টাকায় দিন তিনেকের লাগাতার আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন। এবং এর পেছনে সব টাকা খরচ করে ফেলা হতো। যাত্রাই ছিলো এখানকার একমাত্র আনন্দ-মাধ্যম। ফলে এক একটা দল একরাত্রে কম করে তিন চার পালা যাত্রা করতে পারতো। এক রাত্রের মধ্যে কী করে সেটা সম্ভব? দরকার মতো ওঁরা দৃশ্য ছেঁটে, অঙ্ক কেটে, পঞ্চমাঙ্ক পালাকে দেড় কি দু'অঙ্কে দাঁড় করিয়ে এই অসাধ্য সাধন করতো। তখন কোলিয়ারি এলাকার গানেই সাধারণতঃ গোটা ইনভেস্টমেণ্টের টাকাটা তুলে নেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিলো। একই পোশাকে, একই মেক-আপে ওঁরা রাতভর কোলিয়ারি টু কোলিয়ারি দৌড়ে বেড়াতো।

সকালে খবর এলো জীবনকৃষ্ণ দাস মশাই তখনও ঘুমচ্ছেন।

আসানসোলে ততক্ষণে আড্ডার আসর বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। কোলিয়ারি এলাকার লর্ড অনিল ভাণ্ডারী চায়ের কাপ হাতে দিয়ে সোজা চলে এসেছেন শম্ভুদার ঘরে। অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর অশ্বিনী দাস, নাট্যভারতীর আশুতোষ সাহা, সত্যম্বর অপেরার মধু বড়াল, ভারতী অপেরার জানকী মেদ্দা, নিউ গণেশ অপেরার অভয় হালদারকে নিয়ে সকালের চায়ের আসর দিব্যি সরগরম হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দেখি মীনা ভ্যারাইটিজ-এর দুলাল এসে হাজির। দুলাল সেই প্রথম হিন্দি যাত্রাদল করেছে। আর্টিস্টরা কেউ বাঙালী নন, সবাই অবাঙালী। হিন্দি যাত্রার সমাদর দেখে বাংলা যাত্রা-অলাদের দুশ্চিন্তার সীমা নেই। দুলাল বলছিলো, সকলে নাকি ওকে একঘরে করেছে। নায়েক ভাগাচ্ছে। রটনা করছে হিন্দী যাত্রা অর্থেই একটা গোলমেলে ব্যাপার। এই নিয়ে বাদানুবাদ হচ্ছিলো, হঠাৎ বেয়ারা এসে খবর দিলো, জীবন দাস মশাইয়ের নিদ্রা ভেঙেছে। এতক্ষণে বন্ধ ঘরের দুয়ার খুলছেন তিনি।

শম্ভুদাকে টানতে টানতে আমি জীবনবাবুর ঘরে ঢুকলাম।

ভদ্রলোক তখনও ঘুমোচ্ছেন। বিছানার ওপর বালিশ বুকে নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দেহটাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিছানায়। বেয়ারা বললো, গোটা পাঁচেক ডিমের

পোঁচ খেয়ে আবার পানে ডুবে যেতে বসেছিলেন। বোধ হয় এইমাত্র শুয়েছেন আবার।
ওঁর রুমে বসে আমরা কথা বলছিলাম, বোধ হয় সেটা শুনে থাকবেন জীবন দাস। শুনেও কিন্তু বিন্দুমাত্র নড়লেন না। কেবল ওঁর গলা শোনা গেলো, 'কে…!'
শম্ভুদা এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'প্রবোধদা এসেছেন।'
সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন। ওঁর চোখ ঢুলুঢুলু, মুখ ভারী, চুল উস্কোখুস্কো, শরীর শিথিল, গলা জড়ানো। হাত দু'টো জড়ো করে কপালে তুলতে গিয়ে পারলেন না। বললেন, 'দাশুয়া, নমস্কার।'
'দেখতে এলাম—'বলতে বলতে আমি ওঁর পাশেই বসতে গিয়েছিলাম কিন্তু কিছুতেই বসতে দেবেন না। চেয়ার টেনে সেখানে আমাকে জোর করে বসালেন। টলছিলেন। বললেন, 'সাত সকালে অপবিত্র বিছানাতে বসতে হবে না। আঁই আঁপনাকে বসতে দেবোই না।' বলার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার। বেয়ারাকে ডাকছিলেন জীবনকৃষ্ণ দাস।
ব্যবসায়ের প্রসঙ্গ, যাত্রাশিল্পের ভবিষ্যৎ, শোভাবাজারের পর কলকাতায় যাত্রা উৎসবকে নিয়মিত করা বিষয়ক আলোচনা ভুরিভোজ পর্বের সঙ্গেই সমাপ্ত হলো। এক প্যাকেট দামী সিগারেট পকেট থেকে বের করে রাখলেন। জানালেন, এটা নাকি তিনি আমার জন্যই এনেছিলেন। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ওঁর পাশে বসলাম। জীবন দাস হা হা করে বাধা দিলেন অবশ্য। কিন্তু তার আগেই আমি বসে পড়েছি। বললাম, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'
'একটা কেন হাজারটা করুন না।'
বললাম, 'আপনি আমাকে ভালোবাসেন?'
নেশাগ্রস্ত মানুষটা ফৎ করে কেঁদে ফেললেন। আমার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে নিজের বুকে ঘষতে লাগলেন। জড়ানো গলায় ডানদিকে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'বাসি বাসি—বাসবো না? আমার বাপ শালা ভালোবাসবে আপনাকে।'
বললাম, 'একটা জিনিস চাইবো। দেবেন?'
'উহুঁ।' জীবন দাস নাগাড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে গেলেন। 'দেবো না, কিছুতেই দেবো না। চাইলে কিসসু দেওয়া হবে না আপনাকে।' আমার ডান হাতটা টেনে নিজের মাথার ওপর রাখলেন। 'চাইবেন কেন? আপনি হুকুম করবেন। করুন – সব দিয়ে দেবো। করুন আর একটা যাত্রা উৎসব, আমি জীবন

দাস একা ষাট হাজার টাকা দেবো। কারো কাছে হাত পাততে দেবো না আপনাকে।'

'টাকা নয় জীবনদা, অন্য কিছু ··'আমি বললাম।

'অন্য কিছু!' সোজা হয়ে বসে তাকালেন আমার দিকে। দু'টো চোখ রক্তবর্ণ। দু'মুহূর্ত চুপচাপ। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দেব। যা বলবেন তাই দেব'—ডান হাতের বিশাল থাবা দিয়ে নিজের বুক বাজাতে লাগলেন, 'জীবন দাস জবানের ব্যাটা। কলজে ছিঁড়ে দেবো আপনাকে। এই কলজে···'

সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় কাণ্ডটি আমি করে ফেললাম। শম্ভু ঘোষের ডান হাতটা টেনে নিয়ে জীবন দাসের মুঠোর মধ্যে গুঁজে দিলাম। 'শম্ভু ঘোষকে দিলাম আপনার হাতে। আপনার সন্তানের মতো। ওকে যেন ফেলে দেবেন না কখনও।'

চিৎপুর যাত্রা জগতের বাঘা মালিক, জবানের জবান জীবন দাস অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন আমার মুখের দিকে। তারপর হঠাৎই দেখলাম ওঁর চোখের কোল বেয়ে বন্যা নেমেছে। আচমকা আমাদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'এই দান আমি সারাজীবন মাথায় করে রাখবো, কথা দিলাম।'

এক সপ্তাহ বাদে নারাণ ফোন করলো আমাকে। রাত্রে। 'শম্ভুদাকে রাখাই সাব্যস্ত করলাম। আপনি খুশী তো?'

ছয়.

রূপালী বললো, 'হ্যা, কথাটা সত্য। ওঁকে আমি ভালো বাসতাম।' বলতে বলতেই ফিক করে হাসলো এবং সঙ্গেসঙ্গেই গম্ভীর। 'অবশ্য ভালোবাসাটা যে কাকে বলে আমি ঠিক জানি না। আপনি কি জানেন কোন কোন লক্ষণ থেকে বোঝা যায় কোনটা প্রকৃত ভালোবাসা ?'

সমূহ বিপদ। ভাবতেই পারিনি রূপালী এমন একটা প্রশ্ন করে আমাকে সংকটের মুখোমুখি দাঁড করাবে। কী যে জবাব দেবো তাও ভেবে উঠতে পারছি না।

শ্যামসরোবর স্ট্রীট ধরে সোজা সেণ্ট্রাল এভেনুর দিকে যেতে বাঁ-দিকের গলি মতন রাস্তা। সামান্য এগোলে ডানদিকে সরু সর্পিল পথ। কয়েক পা এগোলেই ডানদিকে সদর। নেমপ্লেট নেই। তবু কড়া নাড়লে জবাব পাওয়া যাবে। গায়ে গেঞ্জি, পরনে প্রিণ্টেড লুঙ্গি। অনিন্দ্য।

'একতলার ফ্ল্যাট ?'

রবি বললো, 'হ্যাঁ।' ও নিজেই কড়া নাড়লো। 'এক্ষুণি খুলবে।'

ওপাশ থেকে সাড়া নেই। ভেতরে খুট করে শব্দ হলো। হাট হয়ে গেলো কপাটের দু'টি পাখা। সামনে অনিন্দ্য দাঁড়িয়ে। নবীনকুমার নামে পরিচিত। উপাধিতে দত্ত। পরনে লুঙ্গিটা আছে ঠিক, গায়ে দেখি গেঞ্জির বদলে চাইনিজ শার্ট। পায়ে চটি। মাথার চুল এলোমেলো। দেখেই চমকে উঠলো, তারপর একগাল হাসি, 'ভেতরে চলে আসুন।' বলেই ও গলা চড়িয়ে জানান দিলো, অতিথি হিসাবে ওদের বাড়ির দরজায় কে এসে দাঁড়িয়েছে।

রূপালীর সংসারে এই আমার প্রথম আসা।

চলে গেলে কি রাস্তায় দেখা হ'লে অথবা গদীঘরে আচমকা মুখোমুখি হলে, হয় অনিন্দ্য নয়তো রূপালী বারবার নিমন্ত্রণ করেছে আমাকে। কিসের নিমন্ত্রণ ? ওদের নতুন সংসার দেখার। নানা কার্য-কারণে আমার পক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। অবশেষে দেখলাম, ওদের প্রতিনিধি হিসাবে রবি, রবি বাস

বারবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, ওখানে একবার যাওয়া দরকার। ওরা দু'জনে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছে। একদিন, বোধ হয় শ্রাবনের শেষ দিকে, বেলা দশটা নাগাদ ফিরছিলাম ও-পথ দিয়েই। রবি স্মরণ করিয়ে দিতেই রাজি হোলাম।

ঘনঘিঞ্জি উত্তর কলকাতার নিচুতলার ফ্ল্যাট। যত ছায়া ততো আলো নেই। একফালি উঠোন। একটি করিডর, তারপর বেশ বড়ো একটি শয়ন-কক্ষ। পাশেই ছোট একটি রুম। এ-পাশে ততোধিক ছোট কিচেন। শৌখীন পর্দায় ঢাকা জানলা আছে গুটি দুয়েক, তবু অনিন্দ্য আলো জ্বাললো।

ডবল বেডের একটি নতুন পালঙ্ক রয়েছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। একদিকে খাটো হাইটের একটা স্টীলের আলমারি। ডানদিকে ড্রেসিং-টেবিল। গুটি তিনেক হালকা ধরনের চেয়ার, একটা ট্রানজিস্টার রেডিও। দেওয়ালে নবদম্পতির বিয়ের ছবি। খুব কাছাকাছি দু'জনে। রূপালী ছুটে এলো কিচেন থেকে। তোয়ালে হাতে। ভেজা হাত মুছছিলো। বললো, 'ঘোষণা শোনামাত্র কফির দুধ বসালাম।' ধপ করে বসে পড়লো খাটের কোণের দিকে, 'আর কী খাবেন দাদা ?'

'ব্যাস,' আমি বললাম। 'কফি ইজ ইকোয়াল টু ফুল মীল।'

রবি দাস, বলতে গেলে যাত্রা-জগতের আদরের ফটোগ্রাফার—যে প্রায় পনেরো বছর ধরে আছে আমার সঙ্গেসঙ্গেই ; সুখে দুঃখে, ঘরে-বাইরে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে—তার মুখটি দেখলাম বড়ই ব্যাজার। তরল পানীয়ের প্রতি রবির মোহ কম। ও একটু সলিড ধরনের দানাপানি পছন্দ করে। রাজভোগ, ক্ষীরকদম্ব, রসোমালাই, তালশাঁস সন্দেশটন্দেশ হ'লে রবির মুখে হাসির উল্লাস দেখা যায়। চোখের ইশারায় ও কী যেন বলছিলো অনিন্দ্যকে। মাথা নেড়ে সায় জানালো ও। চোখে চোখ রাখতেই অনিন্দ্য অপ্রস্তুতের মতো হেসে উঠলো, 'রবিদা একটা কথা বলছিলো।'

রবির যে কী কথা সেটা আমার জানা। পনেরো বছর ধরে বলতে গেলে ও আমার গার্জেনও। কোনটা খেলে আমার ভালো হবে, কী ভাবে চললে শারীরিক কষ্ট কম হবে, কোথায় আমার স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োজন সে দিকে রবির প্রখর দৃষ্টি। আমি যখন দলে যাই গান শুনতে, রবি সঙ্গে থাকেই। সে হুকুম করে, দলে আমার জন্য কী রান্না হবে, কি ভাবে।

রূপালীর সংসার-এর কথা বলতে গিয়ে যখন রবির কথা এসেই পড়লো, তখন ওর সম্বন্ধে কিছু বলার লোভ আমার পক্ষে সামলানো কঠিন।

রবিকে আমি প্রথম দেখি মীরেন স্টুডিওতে। মীরেন অধিকারীর এই স্টুডিওটি তখন রঙমহল থিয়েটারের সামনের বিল্ডিংয়ের দ্বিতলে। গোটা থিয়েটারের জগৎটাই বলতে গেলে ছিল মীরেনের কব্জার মধ্যে। প্রফেশন্যাল, নন-প্রফেশন্যাল কি এক্সপেরিমেণ্টাল থিয়েটারের একচেটিয়া ফটোগ্রাফার বলতে তখন মীরেনকেই বোঝাতো। সে তখন বলতে গেলে কিং এবং কুইন মেকার। বোর্ড থেকে শুরু করে গ্রুপ থিয়েটারের হিরো এবং হিরোইনরা সময় সুযোগ পেলেই স্টুডিও মীরেন-এ ঢুঁ মারতো। রবি দাস তখন ওখানেই কাজকম্মো শেখে। ময়লা রঙের কাহিল ছেলেটির যতো কাজ ততো অভাব। তবু ক্লান্তি নেই, মুখে বিষণ্ণতার ছায়া নেই—রবি ভালো এবং বাধ্য ছেলের মতো দিব্যি কাজ করে যাচ্ছে।

কী কারণে কে জানে, মীরেনের রবরবা যশে একদিন ভাঁটার টান শুরু হলো। থিয়েটারের কাজ কমে এলো, খদ্দেরদের ভিড় হতে লাগলো পাতলা। এই সময়ে মীরেন আমার সাহায্য চেয়েছে বারবার। মীরেনকে বরাবর আমি একটি কথাই বলে গেছি, আমার কাছে কাজ করতে হলে ওকে পদবী পরিবর্তন করতে হবে। প্রথম দিকে মীরেনকে দিয়ে আমি কিছু পরীক্ষামূলক ছবির কাজ করিয়েছিলাম। পরে আমাকে শুনতে হলো, যেহেতু মীরেনের পদবী অধিকারী, সেহেতু সে অবশ্যই আমার সহোদর। এই দুর্নামের আওতা থেকে দূরে সরে থাকার জন্যই ওই ধরনের প্রস্তাব দেওয়া। তা ছাড়া ওই সময়ে অলক মিত্র আমার ছবি তোলার কাজকর্ম করতো। শোভাবাজার রাজবাড়ির যাত্রা উৎসবের যাবতীয় ছবিও তুলেছিলো অলক। অলক মিত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান আখ্যানটি খুব মজাদার। দেখতে সুন্দর, চটপটে স্বভাব, অভিমানী এই ছেলেটি চট্ করে মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো। শোভাবাজার রাজবাড়িতে যাত্রা উৎসবের সময় জনৈকা সুন্দরী যুবতী, কী ভেবে কে জানে, হঠাৎ অলকের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলো বেলফুলের মোটা একটি মালা। মালায় হাত দিয়ে অলক কেঁদে ফেললো। আমি, শেলীদি, প্রীতিবাবু, দেবুদা হেসেই খুন।

রবির স্বভাব ছিলো ঠাণ্ডা। মুখময় অসহায় ভাব। একটু সংশয়ী। ফলে চট করে মানুষের করুণা আকর্ষণ করতো। মীরেনের সুখ দুঃখের দিনে কনিষ্ঠের

মতনই পাশে থাকতো রবি। আমি লক্ষ্য করতাম চুপচাপ কাজ করে যেতো ছেলেটি। পরে দেখি, মীরেনের ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে রবি ছবি তুলছে।
চলচ্চিত্রের এক নবাগতা হিরোইনের সঙ্গে হঠাৎই মীরেনের প্রেম। মেয়েটি পড়তো বেথুনে। সবে তখন একটি ছবিতে কাজ করেছে। চুক্তি করেছে আরও দু'টি ছবির প্রযোজকদের সঙ্গে। পাতলা ছিমছাম দেখতে, রঙ দুধে আলতায়, চোখ ডাগর, তীক্ষ্ণ ওষ্ঠ। কলেজ যাওয়ার আগে ঘণ্টা খানেক এবং ছুটির পর রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত এই নায়িকা থাকতো মীরেনের স্টুডিওতেই। অবাঙালী মেয়েটি বাংলা বলতে পারতো চমৎকার।
একদিন হঠাৎ দেখি দোতলা থেকে মীরেন স্টুডিও নেমে এসেছে কর্ণোয়ালিস স্ট্রীটের ওপর। ঠিক রঙমহলের সামনে ট্রাম লাইন পার হলেই অভিজাত এই স্টুডিওর শো-রুম। পেছনে ছবি তোলার জায়গা, ডার্করুম ইত্যাদি। একদিন ঘোষণা দেখলাম, চলচ্চিত্রের এই নায়িকা ছবি তোলার কাজও শুরু করেছে। চার্জ অবশ্যই ছিলো দ্বিগুণ।
যাত্রার সঙ্গে মীরেন অধিকারীর সম্পর্কটা ঘন না হলেও, হরিপদ বায়েনের সঙ্গে ওর একটা আত্মিক যোগসূত্র ছিলো। হরিপদ বৃহস্পতিবার অন্ন স্পর্শ করতো না। ওই দিন মীরেন মিঠাই পাঠাতো রবির হাতে।
রবি বলেছে: আমাদের এমন বহুদিনই গেছে পরপর দু' তিন দিন কেবল চা' টা খেয়ে কাটাতে হয়েছে। এই অভাবের দিনটায় বেস্পতিবার পড়লে আমি জানতাম, হরিপদদা মিষ্টির বাক্সটা হাতে নিয়েই তোষক ওলটাতেন এবং ওই হাতেই তুলে দিতেন রোল করে ছোট-করে-ফেলা একটি ঝকঝকে দশ টাকার নোট। এ ছাড়া বিপদ-আপদের কথা জানাবার সঙ্গে সঙ্গে হরিপদদা পঁচিশ পঞ্চাশ দিয়ে সাহায্য করতেন।
কোনো এক বৃহস্পতিবারেই, হরিপদর ওখানে দেখলাম রবিকে। হরিপদ নিজে থেকে ওকে তুলে দিয়েছিলো আমার হাতে। সেই থেকেই রবি দাস আমার সহচর। টানা পনেরোটা বছর ও লক্ষ্মণের মতো ঘিরে রেখেছে আমাকে।

উনিশ শো চৌষট্টির শেষভাগ থেকেই চিৎপুরের হাজার মুখ হাজার কথা বলে যাচ্ছিলো। কেউ বলেছে রূপালীর সঙ্গে নাকি বিয়ের পর্বটা সেরে ফেলেছে গোপাল। আবার কেউ বলেছে, রেজিস্ট্রেশনের নোটিশ চলে গেছে। একমাস

পরেই আসছে সেই শুভলগ্ন। তারপর অনেক মাস চলে গেছে, চিৎপুরী গুজবের মুখে ছাই দিয়ে ওরা এগিয়ে গেছে। রূপালী বলেছে, গুজবের সবটাই সত্য তা নয়, আবার সবটাই যে মিথ্যে তাই বা বলি কী করে? দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকার দোষ-গুণ থাকতেই পাবে। সেই রথের দিন থেকে শুরু, ফিরে আসা রথতক বেসুর বাজছে তো বাজছেই। মহলা সাছে। আছে চরিত্র, ঘটনা, কম্পোজিশন নিয়ে আলোচনা। টোটাল কনসেপশন, পারফেকশন নিয়ে রাতজাগা কথা। এর কি প্রতিক্রিয়া থাকতে নেই?



যাত্রাদলে একসঙ্গে থাকা মানেই ছেলেদের ঘরে মেয়ে কি মেয়েদের ঘরে ছেলে অথবা দুইয়ের পরামর্শ মতন তৃতীয় স্থানে মোলাকাৎ—এ-সব এই অপেরায় একেবারেই ছিলো না। কিন্তু অসুখে-বিসুখে দ্বন্দ্বে-মন্তর্দ্বন্দ্বে, রাগ-অভিমানে পরস্পর পরস্পরকে দেখতে গিয়ে যদি একটা আলাদা মানসতার জন্ম হয়ই তাকে কি অস্বাভাবিক বলা চলে? মেলামেশা যদি দীর্ঘকালের হয় তবে সান্নিধ্যের সূত্র ধরে অন্তর্মনে যে ভাবরস উৎপন্ন হয়, প্রায় ক্ষেত্রেই তা অসুন্দরকে সুন্দর করে। মানুষের মধ্যে দু'ধরনের সৌন্দর্যবোধ বিরাজ করে। একটা সৌন্দর্য বাইরের; 'দেখন-শোভা' যা টানে হঠাৎ, অভিভূত করে আচমকা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এটি বহমান নাও হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালের সান্নিধ্য অন্তর-সৌন্দর্যের খনি আবিষ্কার করলে রূপজ মোহটা শীৎপত্রের মতো একদিন খসে পড়ে, থাকে কেবল বন্ধন এই বোধে ভাঁটার স্থান নেই। একের রূপ ও গ্ল্যামার, নারীসুলভ নম্র আচরণ, মায়া মমতা যদি অন্যের শান্ত নম্র স্বভাব, ব্যক্তিত্ব, মায়ার মধ্যে বন্ধনের ঠিকানা খুঁজেই থাকে তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতে পারে?

এই সান্নিধ্যই নায়িকার মনে পুষ্পকোরকের জন্ম দিয়েছিলো। নায়কের শাস্তি-বিধান করার সময় নায়িকা যদি নিজেকে বধুর ছদ্মবেশে সাজিয়েও থাকে বহুবার,

তা যেমন নায়কের বোঝার কথা নয়, ঠিক তেমনি সম্ভব ছিলো না জানা ওই সময়ে রূপালীর স্বপ্নভাবনা কোন পথ ধরে ছুটছে।

কিন্তু সত্যিই কি অপর পক্ষের মনে কোনো প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ উল্লাসিত হয়ে ওঠে নি ? এ-প্রশ্ন নায়িকার। একজন মানুষ যদি শ্রমে শ্রান্ত, ক্ষুধায় কাতর, রোগে কাহিল, ব্যর্থতায় দগ্ধ হতে থাকে এবং ওই নিত্য যদি একটি অসহায় মেয়ে শান্তি, স্বস্তি ও মুক্তির পথ দেখায়, অসুস্থ হলে হাত বুলিয়ে দেয় কপালে, কাঁদলে মুছিয়ে দেয় চোখের জল, শ্রান্তির স্বেদ মুছে নেয় বস্ত্রাঞ্চলে - তবে কি একজন পুরুষের পক্ষে ওই নারীর মনোভাব বুঝে নেওয়া কঠিন ? 'না না -না', কথায় সঙ্গে মাথা দোলায় ; ওর দু'চোখের কোলে টলটল করে মুক্তোবিন্দুর মতো দু'ফোটা অশ্রু, 'এটা মিথ্যে কথা, এটা ভড়ং, এটা পলায়ন-প্রবৃত্তি।' আকুল অভিযোগের তরঙ্গ এক এক করে আছড়ে পড়ার আগেই উত্তাল।

ঠিক তখন, নিচু মুখে নিজের চোখকে আড়াল করতে গিয়ে আর একটি মেয়ের মুখ আমার মনে পড়লো। মেয়েটি একদিন ভোরভোর সকালে উপস্থিত। তখনও ঘুম ভাঙে নি আমার। যখন উঠলাম, দেখি, শিয়রের ডানদিকের জানলার বেদীতে বসে মেয়েটি নীরব কান্না কাঁদছে। মুখ শুকনো, চুল এলোমেলো, চোখের নীচে অল্প ভিজে ছায়া।

'দল থেকে ফিরলি ?' আমি উঠে বসলাম।

কথা বললো না মেয়েটি। মাথা নেড়ে জানালো, আমার অনুমান সত্য নয়।

'কাল গান ছিলো না ?'

আস্তে, ভিজে গলায় বললো মেয়েটি 'যাই নি।'

'কেন !'

'শরীর ভালো নেই।'

'এই এতো সকালে তবে কোত্থেকে এলি ?'

'বাড়ি থেকে।'

বুঝতে কষ্ট হলো না, কোনো একটা জটিল সংকট ওকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। চিৎপুরের এই অভিনেত্রীর বয়স বড় জোর একুশ, সে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূর থেকে কখন রওনা হলে এতো সকালে পৌছতে পারে, অনুমান করতে কষ্ট হলো না। নাকি কলকাতেই ছিল গতরাত্রে -আমার কাছে সত্যভাষণে ওর আপত্তি ! মনে কৌতুহল থাকলেও আমি তা প্রকাশ করিনি।

'বাড়িতে বিপদ-আপদ কিছু হয়েছে ?'

প্রথমেই জবাব দিলো না। খানিক থম ধরে থেকে, আঁচলে চোখ মুছে তাকালো, 'না।'

কাহিনীর একটি চরিত্রকে নাম-রহস্যের আড়ালে রাখাটা বোধ হয় সঙ্গত নয়। তাতে লেখার তো বটেই বোঝার ক্ষেত্রেও কিছু অসুবিধে দেখা দেয়। অথচ আসল নামটাই বা বলি কী করে! তাতে সুন্দরী এই নায়িকার ভবিষ্যৎ ব্যাহত হতে পারে। সে-কারণে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আসা মেয়েটির একটি নামকরণ করা যাক। ধরে নি ওর নাম গোলাপ। গোলাপ কিছু বলবে। কী? মনে মনে আঁক কষি: দেখলাম উত্তরটা নিছক ভুলে ভরা নয়।

'আমার কিছু বলার আছে দাদা,' গোলাপ আমার দিকে তাকালো। কেমন ফাঁকা ধূ ধূ দৃষ্টি যেন ওর চোখে। এখানে বসে ও যেন পরপার দেখছে।

আমি একটা সিগ্রেট ধরিয়ে হাসবার চেষ্টা করি, 'বলে ফেল।'

আচমকা ও আমার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। গলায় আকুল কান্নার উত্তাল তরঙ্গ।

'অন্ধকারে আমি পথ খুঁজে পাচ্ছিনা দাদা, আপনি আমায় বলে দিন।'

কী বলবো, পথ দেখাবো কেমন করে? আসলে আমিও তো অন্ধকার রহস্যের সূত্র খুঁজে মরছি সেই কখন থেকে। বললাম, 'কী হয়েছে বলবি তো?'

'কিছু হতেই আর বাকি নেই।' চোখ মুছতে মুছতে মেয়েটি উঠে বসলো। ফোঁপাচ্ছিলো। 'বাড়িতে শান্তি নেই, বাইরে শান্তি নেই—আমি এখন কী করি...'

বুঝলাম গোলাপের মনোবনে ঝড়। চিৎপুর যাত্রাপাড়ার গদীতে গদীতে তার আগেই একটা গুজব রটেছিলো। এবং তা আমার কান পর্যন্তও পৌঁছেছে। গুঞ্জরণটা যে মিথ্যে নয় এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

ছেলেটির নাম ধরে নি বিমল। বললাম, 'বিমল কিছু বলেছে?'

'না।' হাতের চুড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো গোলাপ। মুখ নিচু। না তাকিয়েই বললো, কথার সঙ্গে মাথা নাড়ছিলো। 'কিন্তু...'গোলাপ এবার আমার দিকে তাকালো। পূর্ণ দৃষ্টিতে—স্বচ্ছ চোখে, 'ওকে নিয়েই তো যতো গোলমাল।' অল্পক্ষণ থেমে থাকলো। আঙুলে দ্রুত আঁচল জড়াচ্ছিলো আর বলছিলো, 'ওকে আমি সবই বলেছি। তবু আমাকে......'

'কী বলেছিস?' আমি হাসলাম। গোলাপের অধরে দেখলাম চকিত হাসির রেখা। 'কী বলেছিস রে?'

'আমার অতীত, আমার বর্তমান।' গলায় কিছু কান্নার মেঘ, ওষ্ঠে কম্পন।

এবার আমরা বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে চলে এলে কি খুব ক্ষতি হবে? যেখানে একজন সাধারণ শ্রমিকের ঘরে বধূ হয়ে বিরাজ করছেন স্বর্গের অপ্সরা। ছোট সংসার। তিন কন্যা এক পুত্র। অবস্থা নিত্য অভাবের। নুন আনতে পান্তা ফুরনোর মতন। আমাদের প্রবচন বহুভাবে বলেছে, উৎকৃষ্ট পুষ্প কখনই পবিত্র স্থানে জন্মায় না। জন্মাতে পারেও না। হরনাথ দে মশাইয়ের সংসার কতোখানি অপবিত্র বা পঙ্ক সে-কথা পরে আসবে। কিন্তু এখানে সত্যিই পঙ্কে গোলাপ আর বেল ফুটেছে। তার শোভা এবং গন্ধে চারদিক মোহিত।

হরনাথ দে মশাই, আপনার সংসার আপনার চোখে এবং মনে সুখের। কারখানার লেদ-ক্লিনারের কাজ করতে করতে, যন্ত্রটা যখন কুৎসিৎ ও কর্কশ আওয়াজ তুলে একদলা লোহাকে খণ্ড ছিন্ন নানা আকার দেয়, ওই শব্দের মধ্যেও আপনার মনে একটি মিষ্টি, পরম কমণীয় মুখ জেগে থাকে অভঙ্গুর অবস্থায়। আপনার সামর্থ্য অপ্সরাকে নিত্য নতুন সাজসজ্জায় সাজাতে পারে না এ-কথা ব্রহ্মবাক্যের মতন সত্য, কিন্তু যার রূপে আঁধার ফেরার, মিছে পোশাকে তার সৌন্দর্য আর কতটাই বা বাড়তে পারে! সুতরাং অসামান্যা এক রূপসী আটপৌড়ে লালপেড়ে শাড়ি পরে যখন গৃহকর্মে ব্যস্ত তখন আপনি, হরনাথ দে, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। চোখের পাতা আপনার নিথর হয়ে যায়। তাকাতে তাকাতেই আপনার মন ও ভাবনার একজোড়া আলাদা চোখ খুলে যায়। সারা দিনমানের কঠিন পরিশ্রমের পর এই একটি মুখ দর্শনের প্রত্যাশা আপনাকে ঘরমুখী করে। ছুটির ঘণ্টা বাজবার পর আপনার একজোড়া তৃষ্ণার্ত নয়ন কারখানার মানুষ দেখতে পায় না, দেখে না মাথার ওপরে একটা বিশাল নীলের জগৎ আছে, পথের দু'পাশে আছে অকৃপণ সবুজের অবাধ বিস্তার, সূর্য ঢলে পড়লে মাথার ওপর দিয়ে শেষ ডাক ডেকে ডেকে নীড়মুখী পাখিরা ক্লান্ত কলরবে শূন্য প্রথিত করে—আপনার মনজুড়ে, চোখের গভীরে, হরনাথবাবু, একটি মুখ, শুধুই একটিই! এবং ওই মুখ স্বর্গের চেয়ে সুন্দর, প্রকৃতির চাইতে শ্যামল।

কিন্তু হরনাথ দে মশাই, আপনাকে যদি প্রশ্ন করি হঠাৎ আপনি কেন ঘর-বিমুখী হলেন? কেন বেলা পড়ে আসার সঙ্গেসঙ্গে আপনার মন কোন এক অজানা

কারণে চঞ্চল হয়ে ওঠে, বুক আর গলা জুড়ে কেন বারিবিহীন চৈত্র-খরার রুক্ষতা, শুষ্কতা তৃষাতুর হয়ে ওঠে। আর কেনই বা আপনি, সেই হরনাথ দে, সরাসরি বাড়ির পথ না ধরে সটান গিয়ে ওঠেন বাংলা ভাঁটিখানায়? আঘাত পেয়েছেন? আহত হয়েছেন? হতেই পারে যদি আপনি না জানেন যে, ফুলের সুবাস মৌমাছিকে মাতাল করবেই। আর দুনিয়াটা কি কেবল একটি মৌমাছিরই কায়েমী মৌচাক?

আপনার বন্ধুরা, হরনাথবাবু, আপনি জানেন না, মানুষের ছদ্মবেশে এক একটি চটকদার মৌমাছি। আর আপনার সতী-সাধ্বী স্ত্রী সেও তো জাগতিক চাওয়া-পাওয়ারই একটি স্তূপ। আমাদের মহাজনরা বলে গেছেন, সুখ ধুলোয় সঙ্কুচিত হয়, আনন্দ দেয় ধুলোয় গড়াগড়ি। আপনার পরম প্রিয়া বধূ আনন্দ বিহীনা হবেন এ-কথাটা ভাবা কি সঙ্গত হবে? তা যদি না হয়ে থাকে এবং আনন্দের আতিশয্যে তিনি যদি এক-আধটু ধুলো গায়ে মেখেই থাকেন, তবে দোষ দেবার মতন কিছু আছে কী?

ক্রমে আপনার কন্যা, প্রথমা কন্যা শশীকলার মতন দিনে দিনে মায়ের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়ালো। তখন, আপনার নিশ্চয় মনে আছে, আপনার গৃহ প্রায়শ অতিথিময় হয়ে থাকতো। আদপে স্ত্রীর কোনো বহিন না থাকলেও, সেই সব অদৃশ্য বাসিনীদের জীবন্ত পুত্রেরা মধুর সম্ভাষণে আপনার আর আপনার স্ত্রীর বক্ষ ভরিয়ে দিয়ে চোখ তুলতো গোলাপের দিকে। এই সব উটকো পরমাত্মীয়দের দৃষ্টি-ক্ষুধা বোধ হয় আপনি জানেন না, প্রথম যৌবনবতী নারী শরীরের কোন অংশে ঘুরে বেড়ায়।

যথা সময়ে অহল্যা উদ্ধারকারী রঘুপতি না হোক, একালের কোনো মুরলীধর রামচন্দ্রের রূপ ধরে আবির্ভূত হতে পারেন আপনার সংসারে। আপনার পারিবারিক দৈন্য, দারিদ্র্য, কষ্ট, পরাজয়, প্রাত্যাহিক মৃত্যু থেকে উদ্ধারের একটি পথও তিনি দৈব-আশীর্বাদের মতোই দেখাতে পারেন। কী সেই কল্পতরু? ধরে নিন যাত্রা। যাঁরা নরক বলে নাক কোঁচকান, যাঁরা দেখেন করুণার চোখে, উপেক্ষা ঘৃণার নিষ্ঠীবন যাঁরা এই নামের সঙ্গে ছুঁড়ে দেন এবং বলেন অশিক্ষিতের, নিচুতলার, আবর্জনার মতন শিল্প; যাত্রা কিন্তু তাঁদের কাউকেই বঞ্চিত করে নি, করে না। বিপদাপন্ন হয়ে এই সব নাক উঁচুদের কেউ কেউ যখন হালে পানি না পেয়ে পায়ের নিচে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন বা পড়বেন, কেঁদেছেন হয় আসল কান্না, নয়তো

কুমীরের মতনই—অন্নপূর্ণা যাত্রা তাঁদের অভিশাপ দেয় নি, দেবেও না। বরং কোলে টেনে নিয়েছে কিংবা নেবে পরম সমাদরেই। হ্যাঁ, অগতির গতি এই যাত্রা-পথেই হতে পারে আপনাদের মুক্তি—আধুনিক রামচন্দ্রের মুখের এই বাণী শুনে আপনি বা আপনারা ভরসাও পেতে পারেন।

গোলাপের বয়স তখন কতো? তেরো ছাড়িয়েছে, চৌদ্দয় পড়িপড়ি। রামচন্দ্র নামের যুবকটি আসলে যাত্রারই এক তরুণ হিরো। মেয়ের খাওয়া-পরার সুখ, নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা একটি চালেই হওয়া সম্ভব। এই প্রস্তাবে আপনার সানন্দ-সম্মতি থাকবেই থাকবে। অতএব সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপকে আপনারা তুলে দিলেন পতিত-পাবন রামচন্দ্রের হাতে। গোলাপ যাত্রায় এলো। আসাম গেলো। সেখানে ঠিকে-দলের যুবনায়কের সঙ্গে এক ঘর, এক হোটেল করতে করতে ফাল্গুনের শেষাশেষি ক্লান্ত বসন্তের এক বিকেলে দল ফিরলো, মেয়ে এলো ঘরে, দেখলেন আপনার কন্যার আলাদা এক চেহারা। হরিণীর মতন চঞ্চল, সবুজের মতো মোলায়েম মেয়েটা তখন পাথরের মতন স্থির। কথা প্রায় বলেই না। আড়াল পেলে কাঁদে। লোক দেখলে পালায়। তারপর একদিন, ঠিক দুপুরে এক গরাস ভাত মুখে তুলেই দে-ছুট, দে-ছুট। সরাসরি কুয়োতলা। মেয়ের গলার ওয়াক…ওয়াক‥শব্দ শুনে আপনার স্ত্রী উন্মাদিনীর মতো ছুটে গেলেন নির্জন কুয়োতলায়। দেখলেন কচি মেয়েটার পেট গুলিয়ে উঠে আসছে বমি। স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে থাকলেন আপনার স্ত্রী দু'মুহূর্ত। হঠাৎ প্রায় ক্ষিপ্তের মতো ঝটিতি কন্যাকে তুলে চোখের সামনে দাঁড করিয়ে মুখের দিকে, পেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিস্ফারিত চোখে। 'গো-লা-প—', অস্ফুট একটা আর্তনাদ আপনার স্ত্রীর হৃদয় ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে চৌদ্দ বছরের আহত গোলাপ মায়ের বুকে মাথা রেখে হাউহাউ কান্নায় ভেঙে পড়লো। সে-কান্না আর থামে না, কিছুতেই।

হরনাথ দে, আপনি জানেন কি, একবার লজ্জার আবরণ খুলে পড়লে আর সরমের বালাই বলে কিছু থাকে না। পর্দানশীন কি অসূর্যম্পশ্যা রমণী একবার বাইরের জগতের চেহারাটা দেখতে পেলে আর কালো কাপড়ের আড়াল কি অন্দরমহলে লুকিয়ে রাখতে চায় না নিজেকে। সুতরাং যে-জননী কিশোরী-কন্যাতে মাতৃত্বের সম্ভাবনা দেখে আর্ত চিৎকারে বাতাসকে পর্যন্ত ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো, সেই মা-ই শেষ পর্যন্ত বারংবার রামচন্দ্রের হাতে মেয়েকে অর্পণ

করেছে। আপনি যদি প্রশ্ন করতেন কেন এই ব্যবস্থা? তবে নিশ্চয় আপনার বয়স্কা অপ্সরা বলতেন, সাগরে ডুব দিয়ে আবার জলের ভয় কেন? আপনি হরনাথবাবু, পিতা হয়েই কি অভিনয় করতে পারলেন পিতার ভূমিকায়? না, অপ্সরার সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করে আপনি চুপ। কেন সে-দিন আপনি প্রতিবাদ করতে পারেন নি হরনাথবাবু, জগতের সকল পতনশীল পিতারাই তা জানেন। ক্ষুধা কথাটা যেমন সূর্যের মতো সত্য, তেমনি এই ক্ষুধাই মানুষকে কতো না ভয়ঙ্কর করে। ক্ষুধা আর দারিদ্র্য, হরনাথবাবু মানুষকে যেমন স্বার্থপর করে, তেমনি করে আত্মসচেতন, আত্মসর্বস্ব—আপনাকেও তাই করে থাকবে। মেয়ে বিক্রির পয়সায় যদি সংসার চলেই যায়, তবে প্রাত্যাহিক বাংলা মদের পরিমানটা বাড়ানো যেতে পারে। হোক না একটি বোতল দু'টি বোতল—ক্ষতি কী!

যে মানুষ খালটা পেরোবার পর নদী অতিক্রম করে তার লক্ষ্য হয় সাগর পার হওয়া। যে লোকটা সঞ্চয়ের ভাঁড়ে পয়সার পরে টাকা রাখতে পারে তার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয় লক্ষ। হরনাথবাবু, আপনি এবং আপনার অপ্সরা জীবনের, জগতের, সমাজের, বিবেকের, নীতির দিকে পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ালেন। এবং শ্রীরামচন্দ্রের হাত ক্রমশ এগিয়ে এলো আপনারই অপ্সরার বয়স্ক দেহের দিকে। পিটপিটে চোখে দেখেও না-দেখার-ভান করে থাকলেন আপনি। করে যেতে লাগলেন। ভাবলেন না, আপনারই কন্যা গোলাপ যখন সবকিছু জানতে পারলো তখন তার মানসিক অবস্থা কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

হরনাথ দে, আপনি এখন স্বর্গে। লোকে জানে মদ খেয়ে অতিরিক্ত মাতাল হয়ে আপনি হার্ট ফেল করে মারা গেছেন। কিন্তু এ-কথা কি অস্বীকার করতে পারেন, এক খাবলা ঘুমের ওষুধ খাওয়ার ঠিক আগে, আপনি যে শেষ চিঠি লিখে রেখে গেছেন, তা এখন আপনার মেয়ের গোপন সম্পত্তি? মাঝে মাঝেই মাতাল হয়ে আপনি বাড়ি ফিরে আপনার অপ্সরাকে ভয় দেখাতেন, আপনি আত্মহত্যা করার আগে স্ত্রীর মুখোশ খুলে দেবার জন্য সব কিছু লিখে রেখে যাবেন। লোকে জানবে পুষ্পে অনেক কীটের বাসা। আপনি হরনাথবাবু, সেই আত্মহত্যাই করলেন কিন্তু সহধর্মিনীর কলঙ্ক-কাহিনী লিখে যেতে পারলেন কী? লিখলেন আপনার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। কেন লিখলেন এমন জলন্ত মিথ্যে কথাটা? বলতে পারবেন না। আপনার অতৃপ্ত আত্মা এখন যদি দেহীরূপে সামনে এসে দাঁড়ায়. হয়তো সঠিক জবাব দিতে পারবে। কী জবাব দেবে—

আমিই বলে দি. শুনুন : মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেবার পর উপলব্ধির জগৎটা ঠিক জানবেন গেরুয়ার মতো উজ্জ্বল অথচ ধূসর হয়ে আসে। এই রঙ ত্যাগের, পবিত্রতার। আত্মা তখন জাগতিক ধুলো কাদাতেও পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে। সে ক্ষমা করতে শেখে ; মনে করে এই যে জীবন নামক বন্দরটা—যা কদর্য, কুৎসিৎ ক্লেদে পরিপূর্ণ, একদিন মহাজীবনের প্লাবনে হঠাৎই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে।

আপনার আত্মা যদি পরিতৃপ্ত না হয়ে থাকে, না পেয়ে থাকে পরিত্রাণ, তবে আসুন, চোখ খুলে দেখুন, কান পেতে শুনুন, আপনার প্রথমা কন্যা আঘ্রাত গোলাপ, এই গরীবের কুটিরে আমারই সামনে বসে কেঁদে কেঁদে আকুল হচ্ছে। শুনছেন হরনাথবাবু, গোলাপ তার জীবনের সকল ক্লেদ এবং আবর্জনাকে শরীর ও মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এই প্রথম প্রেমের পবিত্র জলধিতে অবগাহনের শুচিতা উপলব্ধি করতে পারছে। তার চোখে এখন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন কিন্তু অন্তরে দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর সংকোচ। ভয় পেতে পেতে এইটুকু পাখির মতো মেয়েটা জাগতিক জগতের সকল ক্ষেত্রে কেবলই ভয়ের প্রেতমূর্তি দর্শন করছে। ও বিশ্বাস করতে কষ্ট পাচ্ছে যে, সত্যিকারের একজন ভালোমানুষ সব কিছু জেনেশুনেও পাঁকের পদ্ম বুকে তুলে নিতে পারে।

জগৎটা, হরনাথবাবু দেখুন কতো বিচিত্র! সেই যে রামচন্দ্র, যিনি আপনার মৃত্যুর কারণ, আপনার অপ্সরার দীর্ঘকালের উপপতি, আপনার কন্যা-গর্ভের অনেক জীবনাঙ্কুরকে ধ্বংস করার দানব, তিনি এখনও ছোট-ফণিবাবু কথিত এই বেচিত্তিরপুরে, যাত্রা-জগতের হিরো হয়ে দিব্যি বিচরণ করছেন। আপনার মৃত্যুর পর অনেক কাল ধরে মা-মেয়ের সঙ্গে সমান সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিলো। গোলাপ একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। বললো, এই অবৈধ সম্পর্ক তার চোখে কুৎসিৎ। সে প্রস্তাব দিয়েছিলো, কপালে সিঁদুরের রেখা নাইবা পড়ুক, নাইবা মালিকা পড়ুক পরস্পরের গলায় কিন্তু বন্ধনটা কি তাই বলে অস্বীকার করা যায়? দেব হোক অথবা দানব—গোলাপ তো তারই পায়ে ডালি দিয়েছে জীবন যৌবন ধনমান, এখন সেই অধিকারের বস্তু সে অন্যের হাতে তুলে দিতে নারাজ। শুনে হেসে উঠলেন রামচন্দ্র, বললেন, 'যাত্রার পুরুষ কখনও এক ঘাটে নাও বেঁধে বসে থাকে না। দলের যাত্রাকন্যাদের সঙ্গে না হয় হয়ে থাকে একটা মরশুম চুক্তি—এখানে তা ধরতে হবে কয়েকটা মরশুম। তাই বলে একজন দেহপোজীবিনীর সঙ্গে জীবনভর চুক্তি! ফুঃ...'

এতো বড়ো কথা! গোলাপের সারা শরীরে লাভাস্রোতের মতো তপ্ত রক্তের ঢেউ বয়ে যায়, 'শকুনের মতো এই শরীরটাকে তুমি খুবলে খুবলে খেয়েছো। তাতেও আশ মেটেনি তোমার?'

ব্যাস, একটা তারা খসলো। রয়ে গেলো আর একটা। তারপর তাও একদিন হলো কক্ষচ্যুত। কিন্তু আকাশটা, হরনাথবাবু, এতো বিশাল এতো বিরাট যে, আঁধার নামলেই সেখানে চুমকির মতো অজস্র অসীম অনন্ত তারার মেলা। রামচন্দ্রজী এখন সেই সব তারায় তারায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।



আমি বললাম, 'বেশ তো, সব জেনেশুনেও যদি বিমল তোকে বিয়ে করতে রাজি থাকে, তবে বিয়েটা করেই ফেল না।'

'আমার কেমন যেন ভয়ভয় লাগে।' গোলাপের দু'চোখে কেমন এক জটিল আতঙ্কের ছায়া। 'বিয়ের পর ও যদি আমাকে ঘৃণা করে...'

বললাম, বিমলকে একদিন পাঠিয়ে দিস, আমি কথা বলবো।'

গোলাপ প্রণাম করলো আমাকে। মুখ তুললো। দু'চোখ জলে টলোমলো। বললো, 'জন্ম দিলেই কি পিতা হয়? হয় না। আমি এ-বাড়ির মেয়ে হতে চাই দাদা। আপনার মেয়ে।'

আমি হাসলাম, 'জননীর স্বীকৃতিটাও তো চাইরে, তুই বরং তোর বৌদির কাছে যা।'

খানিক পরে আমার একমাত্র এবং পরম আদরের কন্যা এসে বললো, 'গোলাপ পিসি এ-বাড়ির মেয়ে হতে চাইছে। মা বলেছে, আচ্ছা। তুমি কিন্তু বাবু মত দিও না। আমিই কেবল এ-বাড়ির মেয়ে থাকবো, হ্যাঁ...'

মিনিট পনেরো পর, রান্নাঘর থেকে হাসতে হাসতে গোলাপ এলো, 'বৌদি মত দিয়েছে দাদা।'

বললাম, 'একটা কথার স্পষ্ট জবাব দিবি ?'
'দেবো।' গোলাপ গম্ভীর হয়ে দাঁড়ালো।
'তুই কি সত্যি ভালোবাসিস বিমলকে ?'
ফুলের সারামুখে হাসি. চোখ ভরে জলও এলো দেখলাম। এ যেন ঠিক আষাঢ়ের রোদ্র বৃষ্টি। 'জানি না', ও প্রায় ছুটে চলে গেলো।
আমার মনে হলো আমি বহুকাল, বহুযুগ ধরে আষাঢ়ের ঘরে বসে আছি।

কী আশ্চর্য, প্রেম এমন বিচিত্র বস্তু, এমন বিচিত্র ও বিস্ময়কর আয়না যে, তাতে প্রতিফলিত কান্না এবং হাস্যোচ্ছল মুখ কেমন করে যেন এক হয়ে যায় ; ম্যাজিক্যাল ওয়ান। না হ'লে রূপালীর প্রেমের সূত্র ধরে আর একটি কান্নার-সাগর অতিক্রম করা মেয়ের মুখ কেন আমার মনে পড়বে! কেন মনে হবে, এই আয়নায় সব মেয়ের মাত্র একটিই মুখ। ও মুখের রহস্য আদম থেকে শুরু করে আজকের সবে-পাওয়া-প্রেমের স্পর্শকাতর যুবার কাছেও অজানার।
রূপালীর ভালোবাসা কি শুধুই এক-পক্ষের ? যে জলে ঢিল পড়লে ঢেউ ওঠে না তাকে কী বলবো ? বরফ ? কঠিন তুষার ? মনে মনে আমি ঠিক করে নিলাম, এই প্রশ্নটাই কববো একদিন রূপালীর নির্দয় প্রেমিককে।
কিন্তু ভালোবাসা যদি গভীরই হবে, তবে রূপালীই বা কেমন করে মনপ্রাণ দিতে পারলো অনিন্দ্যকে। 'কিছুই বুঝতে পারিনি।' রূপালী বলছিলো, 'সে বছর সত্যম্বর অপেরা থেকে একটা মাকাল ফল জয়েন করেছিলো আমাদের অপেরায়। মাইনে টাইনে বেশি নয়, পজিশনও সাধারণ কিন্তু ছেলেটিব স্বাস্থ্য ছিলো দেখবার মতন। চওড়া পুরুষ্টু কাঁধ, প্রসারিত বক্ষ, টেওার টল, গায়ের রঙ টকটকে, দিল খোলা মেজাজ। খুব মিশুকে স্বভাবের ছেলেদের আমার ভালো লাগতো...'
অনিন্দ্য চোখ দু'টো গোল গোল করে বললো, 'এটা কি আমি!'
'কোনটা ?' রূপালীর মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য।
'যে হিরোর তুমি বিবরণ দিচ্ছ।'
রূপালী বললো, 'হিরো! হিরো কোথায় ? ওতো চার নম্বরী আর্টিস্ট।'
অনিন্দ্য হেসে উঠলো, 'তা হ'লে ঠিক আছে। আসলে আমি নিজেকে চিনে নিতে পারছিলাম কি না তাই।'
রূপালী আমার দিকে তাকালো। বললো, 'আমি দলের হিরোইন, কে চার

নম্বরে এলো তার দিকে ফিরে তাকাবো? ফুঃ! বরং ওকে আমি করুণা করতাম।'

'না তাকিয়েই করুণা? এ কি গল্পের গরু নাকি?'

'ডিস্টার্ব করো না বলছি।' জীবন-নায়ককে মৃদু একটা ধমক দিলো নায়িকা। 'কিন্তু জানেন দাদা, ওর জন্য আমার কষ্ট হতো কিনা জানি না, কিন্তু ওর উন্নতি আমি চাইতাম।'

'তার মানে সেই একাদশীর ধনী, ডুব দিয়ে দিয়ে জল খায়, দেবতাদের বাবা…'

একটা মজা করি, আসুন। কাহিনীটা রূপালীর মুখ থেকে শুনলে কেমন রিপোর্টাজ রিপোর্টাজ মনে হচ্ছে। আমাদের দেশে চার ক্যাটাগরির লেখক আছেন। একদল কেবলই লিখিয়ে। আর একদল কেবলই সাহিত্যিক। আর একটা দল কমার্শিয়াল রাইটার অর্থাৎ ফরমায়েসী লেখক। আর একদল হাফ রাইটার।

রিপোর্টাজ: পেট-ভরতি শিল্পী আর বড় বড় ট্রাঙ্ক নিয়ে যাত্রাদলের বাস এক আসর থেকে ছোটে অন্য আসরে। রাত এগারোটায় গাওনা শেষ হলে, যদি দূরপাল্লার পথ হয় তো তড়িঘড়ি তৈরি হবার তোড়জোর চলে। তিন অঙ্ক পার হলেই চাকরেরা একে একে নাচ পার্টির মেক-আপ বক্সগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে নেয় ট্রাঙ্কে। তার আগে অর্থাৎ দ্বিপ্রাহরিক ভোজনপর্ব সমাপ্ত হলেই বিকেল নাগাদ রান্না-বাড়ির মালপত্র বাক্সজাত করে ফেলে। বাসা বাড়ির চাকর যখন ডাকতে যায় শিল্পীদের সাজঘরে আসার জন্য, তখন পরিত্যক্ত শয্যাগুলো পাট করে বেঁধে তোলা হয় বাসের ছাদে। সুতরাং, বলা যায়, দুপুরের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় পরবর্তী আসরের দিকে রওনা হবার উদ্যোগপর্ব। যাত্রাগান যত এগোয়, চাকরেবা তত তৎপর হয়।

না, রাত্রিতে রান্নাবান্নার আয়োজন থাকে না যাত্রাদলে। অভিনয় সমাপ্ত হলে খোরাকীর টাকা, বেতন-মাফিক ক্রমান্বয়ে দেওয়া হয় সকলকে। পারলে কেউ ফ্রিতে খেয়ে নেয়, নয়তো প্যাণ্ডেলের বাইরে যা দোকান-পাট বসে, আশ্রয় নিতে হয় তার। তারপর বাসে ওঠা। সারারাত বাস চলবে। পারলে সীটেই ঘুমোও, আরাম করো অথবা থাকো জেগে—তোমার জন্য বরাদ্দ বড় জোর কুড়ি বাই ১৬ ইঞ্চি জায়গা। অর্থাৎ একটি ডবল সীটের অর্ধেকটা।

প্রাচীন লিখিয়ে: নায়িকা কিন্তু এই দলে পড়ে না। সে শুধুই দলের নায়িকা

নহে, অনেকেরই ধারণা সে নায়কের ব্যক্তিগত জীবনের অংশীদারীও বটে, আবার জীবন-নায়িকাও। দুইজনে একসঙ্গে উঠাবসা করিয়া থাকে, একসঙ্গে বসিয়া আহার-পর্ব সমাপ্ত করে। ইহার সুবিধা ও দেখিয়া থাকে, উহার অসুবিধা দেখিয়া থাকে এ। নায়ক বিমর্ষ হইলে হরিণীর ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠে নায়িকা, নায়ক মানসিক কষ্ট পাইলে নায়িকার চক্ষের নিদ্রা বায়ুর ন্যায় উবিয়া যায়। এবম্বিধ অবস্থাকে নাই বা বলা হইল প্রেম, টান বলিতে ক্ষতি কিসের ?

আধুনিক লিখিয়ে : সে দিনও ছিলো দূর পাল্লার পথ। সোনামুড়া থেকে সটান আগরতলা। রাত একটায় গান শেষ। বাস ছাডতে ছাড়তে রাত তিনটে। আকাশ ভরা তারারা তেল-ফুরনো প্রদীপের মিটমিটে আলোর মতো জ্বলছে। হু হু হাওয়ায় ঝাপটা আছড়ে পড়ছিলো গালে গলায় কপালে মাথায় এবং বুকে। এ-এক পরম প্রশান্তি। কপালের খুচরো চুলগুলো শিশুর হাতে পতপত করা কাগজের পতাকার মত এলোপাথারি আছারি বিছারি খাচ্ছে ঘর্মক্ত কপালে। আঃ, শান্তির মত শীতলতা। চোখের পাতায় অডিকোলন মাখার মত একটা ভারী অনুভব। আশি কিলোমিটার স্পীডে চলা বাসের ইঞ্জিনটা ভীরু এবং চড়া গলায় গোঙাচ্ছিলো। হর্নের শব্দে রাত্রির পাখিরা আচমকা জেগে উঠে শুরু করছিলো কলরব। বাইরের পৃথিবী তন্দ্রাচ্ছন্ন। আকাশে চাঁদ নেই কিন্তু অতি মলিন জ্যোৎস্নার মত একটা অবস্থা অথচ সৌন্দর্যময় আলোয় ভরে আছে প্রকৃতি। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, রূপালীর খেয়াল নেই।

আচমকা ঘুম ভাঙলো ওর। ভাঙলো নয়, তন্দ্রার নিস্তরঙ্গ জলে হঠাৎ পড়লো একটা ঢিল। চোখ চাইতে চোখ।····· কে ! রূপালী দু'চোখের পাতা মুড়ে নিয়ে অন্ধকারে একজোড়া জ্বলন্ত চোখের মানুষটাকে ভাবতে লাগলো।

ড্রাইভারের ঠিক পেছনের সীটটাই হিরোইনের জন্য নির্দিষ্ট। গোটা সীট। পারলে বসে থাকো একলা, নয়তো থাকো আধ-শোওয়া হয়ে অথবা গা-গতর টানটান করে শুয়েও পড়তে পারো। জানলায় বসে থাকা আনমনা নায়িকা নিজেও জানতো না তার ক্লান্ত কাহিল শরীরটা গোটা সীটকে কখন শয্যা করে নিয়েছিলো। মাথার নীচে একটা নরম বালিশের অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। বালিশ ? নাকি দয়িতের লোভনীয় নরম নরম কোল ?

বেশ খানিক পরে, তন্দ্রার ঘোরটা কৌতুহলের ঝাপটা খেয়ে পালিয়ে গেলে রূপালী ভাবতে পারলো, ঠিক তার শিয়রের ডানপাশে এ-দলেরই দু'জন প্রবীন

অভিনেতার স্থায়ী বসার সীট। এক বাস অন্ধকারে রূপালী ব্লেডে কাটা কাগজের সরু ফাঁকের মত চোখের পাতাকে টানা-না-টানার মধ্যখানে রেখে তাকালো। নাহ্, দু'জনেই ঘুমোচ্ছে অঘোরে।

কমার্শিয়াল সাহিত্যিক: জলজলে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো চোখ দু'টো কার! অন্ধকারে মনের হাত বাড়িয়ে রূপালী মানুষটাকে ধরতে চাইলো। আবছা আবছা কয়েকটি মুখ ওর স্মৃতির পর্দায় ভাসতে পারতো, কিন্তু ভাসলো না। দু'চোখ ভরা অন্ধকার দিয়ে নায়িকা হাসলো। ধরা পড়েছে, ঠিক ধরে ফেলেছি। কিন্তু ছেলেটির কি এতোবড় সাহস হবে। একবুক সন্দেহ নিয়ে রূপালী চোখটাকে পটলের মত চিরে ফেললো। হ্যাঁ, তাইতো, তার শিয়রের ডান-পাশের দ্বিতীয় সীটটায় বসা মানুষটির নির্ঘুম দৃষ্টিজোড়া জ্বলছে। শুধু জেগেই নেই, অন্ধকারে ওই দৃষ্টি সকলের অগোচরে নায়িকার দেহকে করছে লেহন। ও কী চায়? ভাবতে গিয়ে হাসি পেলো আবার। এক ধরনের কৌতুক পেয়ে বসলো রূপালীকে। চোখ খুলে ঝড়ের বেগে উঠে বসতে গিয়ে দেখে, ও-দিকের মানুষটা তক্ষুণি চোখ বুঁজে দিব্যি ঘুমের মহলা দিচ্ছে।

হাফ রাইটার: আমি মেয়ে, নায়িকা ভাবলো। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত অনুভব পা থেকে সিরসির করে উঠে এলো মাথায়। চোখ বুজে রূপালী তার বসনহীন দেহপটের সকল অংশ দেখতে পাচ্ছিলো। ঢালু বক্ষে স্বর্ণশুভ্র মৌলী গিরি, শীর্ষের ছায়াভ চত্বরে তরল স্তন্য নির্গমনের মুখ-ঢাকা গহ্বর, আরও নিম্নে ওঁ মণিপদ্মে হুম; তারপর অরণ্যের·· না না, নায়িকা ভাবলো সে মেয়ে এবং অভিনেত্রী; কলাবতী। চৌষট্টি কলার একটি ছাড়লে বাছাধন তোমার ত্রিভুবন চক্কর খাবে। এই যে রাঙা, গোলাপী, নরম, ফুলের পাপড়ির মতো বিম্বাধর, এ-যদি তোমার ওষ্ঠ, গণ্ড. কণ্ঠ স্পর্শ করে তবে তো তুমি বলবেই, কিন্তু যদি তোমার জিভটা · আহারে! দেখিতো কেমন তুমি ধরা না দিয়ে থাকো। অল্পক্ষণ ছুটন্ত বাসের জানলায় চুপচাপ বসে থাকলো ও। দেখলো ড্রাইভারের বাঁ-দিকের লম্বা সীটজুড়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে নায়ক। পেছনের কোণের দিকে একটা বিড়ির আগুন থেকে থেকেই জলজলে হয়ে উঠছে। হয় সুরপার্টির কেউ, নয়তো সাজঘরের বেশকারীও হতে পারে। এরই মধ্যে আড়চোখে বার-কয়েক আপাতত ঘুমের মহলা দেওয়া মানুষটির মতিগতি লক্ষ্য করে শুয়ে পড়লো

নায়িকা। কিন্তু দু'চোখের পাতা এক করলো না কিছুতেই। করলো না বলেই চার চোখের সংঘর্ষ। অনেকটা বর্ষায় আকাশে হঠাৎ শব্দহীন বিজলী রেখার অভ্যুদয় ও অন্তর্ধানের মতন। এবার সত্যিই হেসে ফেললো নায়িকা। করুণার হাসি।

এমনি বার কয়েক চোখে চোখ পড়ার পর, ছেলেটি বোধ হয় বুঝতে পেরে থাকবে সে নায়িকার হাতে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে। ধরা-পড়ার আনন্দটা খুব রোমাঞ্চকর কিন্তু লজ্জাটি গভীর ক্ষতের মতন। আজ আর নয়, ছেলেটি জানলার গরাদে ডান হাতের কনুই তুলে দিয়ে তার ওপর মাথা রাখলো, চোখ বুজলো; অন্ধকারে জেগে রইলো কেবল একটি মিষ্টি মেয়ের ভুবন-ভোলানো স্মৃতি।

পাখি জাগা সকালে একটা চায়ের দোকানের সামনে বাস থেমেছে। রাত শেষের চা-তৃষ চঞ্চল মনকে ইচ্ছে করলেই এখানে ঠাণ্ডা করে নেওয়া সম্ভব। খরচ যার যার তার। হুড়হুড় করে লোকজন নামলো। নিমেষে চা-দোকানের সামনে দিব্যি ভিড়।

'চা-খাবে ?' নায়ক আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়েছে।

'না।' রূপালীর জবাব। হ্যাঁ, এই প্রথম না। রূপালী নিজেও ভেবে পেলো না, কেমন করে, কোন সাহসে সে নায়কের প্রস্তাবকে খারিজ করে দিতে পারলো।

'শুনছেন ?' জানলায় মুখ গলিয়ে দিয়ে ডাকছিলো রূপালী, 'শুনতে পারছেন ? ও মশাই।'

পাশের একটা কাঁঠাল-তলায় দাঁড়িয়ে ছোট কাচের গ্লাসের ধোঁয়া-ওঠা চা হুসহুস করে গিলছিলো অনিন্দ্য। ডাক শুনে তাকালো। ওমা, নায়িকা যে ওকেই ডাকছে! 'আমায় বলছেন ?' অনিন্দ্য ঢোক গিললো, কেমন বিচলিত হয়ে পড়ছিলো।

'তবে আর কাকে…', মিষ্টি করে দুষ্টুমির হাসি হাসলো রূপালী। 'আমায় একটু চা খাওয়াবেন ?'

'নিশ্চয় …', অনিন্দ্য এই প্রথম নিজের হাতে নায়িকাকে চা দেবার সৌভাগ্য লাভ করলো।

উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়লো রূপালী। বললো, 'নেহাৎই মজা করার জন্ত ভীষণ খেয়ালী হয়ে উঠলাম। ওই খেয়ালই পেয়ে বসলো আমাকে। আমার জীবনের একটা দিক যতো ব্যর্থ হচ্ছিলো, ততই মজার নেশা তপ্ত করছিলো আমাকে।' বুক খালি করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো এবং এক ঝলক হাসি দিয়ে আবার তা আড়ালও করে ফেললো।

'মজা করতে করতেই মজে যাওয়া আর কি…' পরিবেশটাকে লঘু করলো অনিন্দ্য।

বললাম, 'তুমিও কি ?'

মাথা ঝাকাতে শুরু করলো অনিন্দ্য 'না-না ; একেবারেই না। আমি সত্যিকারের ভালোবাসার নৈবেদ্য নিয়ে দেবী পুজোয় নেমেছিলাম।'

'হঠাৎ তোমার মধ্যে এ-ধরনের বাসনা জন্মালো কেমন করে ?'



অনিন্দ্য বললো, 'আসলে কেন যেন আমার মনে হতো, মেয়েটি একটা মরীচিকার পেছনে ছুটছে। অনুমান যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ বারবার আমি পেয়েছি। এবং সে-কারণে পাথরের দেওয়ালে মাথা-কুটে-মরা একজন অসহায় মেয়ের ব্যর্থতাকে ঢাকতে গিয়ে মনে মনে কখন যে ভালোবেসেছিলাম জানি না।'

'অতটা মিথ্যে বলো না।' বাধা দিলো রূপালী, 'অসহায় আমি ছিলাম না কোনোদিনই।'

বললাম, 'তর্কাতর্কি থাক। গল্পটা জমেছে দারুণ। তারপর ?'

রূপালী হাসতে হাসতে বললো, 'তারপর আর নেই।'

'তা হলে বিয়েটা হলো কী করে ?'

'ওটা একটা নেহাৎই এ্যাকসিডেণ্ট।' চোখ টিপে অনিন্দ্যকে কিছু বললো।

বললাম, 'ঠিক আছে। বাকিটুকু তা হলে আমিই বলি ?'

'আপনি !' ওরা অবাক।

'হ্যাঁ আমি—'

'ওমা !' রূপালীর চোখ দু'টো প্রায় বিস্ফারিত হয়ে আসে, 'আপনি সব জানেন ?

'না-জানলে বলবো কী করে ?'

রূপালী বললো, 'ঠিক আছে বলুন, দাদার মুখ থেকে নিজের প্রেম-কাহিনী শোনার আনন্দটা কেমন লাগে দেখি।'

'একটা দৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছি' ; বললাম আমি, 'তা হলেই বোঝা যাবে ঘটনাটার কতখানি আমি জানি।'

অনিন্দ্য বললো, 'ব্যাপারটা খুবই নাটকীয় হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'বাসটা দৌড়োচ্ছিলো রাত্রির বুক চিরে। ড্রাইভারের বাঁ-পাশের লম্বা সীটটায় শোয়া নায়কের চোখে ঘুম নেই। নায়ক যে নির্ঘুম রাত্রি যাপন করছেন নায়িকার তা জানার কথা নয়। ও জানেই না যে, তার মজার নেশা ক্রমশ নায়কের মনে মেঘের সঞ্চার করছে…'

অনিন্দ্য, রূপালী আর রবি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো।

'এ-দিকে কোনো একটা কৌশলে ভিলেনের স্থান পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ নায়িকা আর তার মধ্যে যে সীটটার ব্যবধান ছিলো তা গেছে ঘুচে। দেখা গেল, নায়িকার শিয়রের ডান দিক করে যে প্রথম সীটটার দু'জন প্রবীন অভিনেতা বসতেন তাঁরা উৎখাত হয়েছেন, ওই জায়গা জুড়ে অধিষ্ঠান হয়েছেন নব-নায়ক, অনিন্দ্যকুমার।'

বাধা দিলো অনিন্দ্য, 'আমাকে ভিলেন বলাটা কি ঠিক হচ্ছে দাদা ?'

বললাম, 'গপ্পো সাজালে তাই তো হয়। সিনেমা দেখো না ?'

'কিন্তু ও সীটটা দখল করার জন্যে আমরা, দু'জনের কেউই কোনো কৌশল করিনি। আপনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন।'

জবাবে বললাম, 'আমিই কি বলেছি কৌশলটা তোমাদের ?'

'তবে।'

'ধরে নাও কৌশলটা নায়কেরই। তিনিই এ্যারেনজমেণ্ট করে দিয়ে ওয়াচ করতে পারেন।'

আবার তিনজোড়া চোখে ঘন বিস্ময়

রূপালী বললো, 'ঠিক ধরেছেন দাদা। ব্যাপারটা এখন আমার কাছে পরিষ্কার।'

বললাম, 'তারপরের ঘটনা একটা চিরুনী নিয়ে…'

'ও-মা-আ—' রূপালীর মুখে বিস্ময়ের অব্যয়।

'ওই এক অস্ত্রেই নায়ক পরাভূত…'

ছোট মেয়ের মতো দু'হাত ছুঁড়তে লাগলো রূপালী। গলায় আদুরে স্বর, লক্ষ্য অনিন্দ্যর দিকে, 'এ-মা, তুমি সবগুলো কথা দাদাকে বলে দিয়েছে; ছিঃ ছিঃ…'

বেচারী বাধা দিয়েও থামাতে পারছিলো না রূপালীকে। তার গলা এবং ব্যক্তিত্ব কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছিলো না, এই কথাগুলো সে আমাকে একেবারেই বলে নি। শেষ পর্যন্ত বাধা দিতে হলো আমাকেই। আমি বললাম, ঘটনাগুলো যার মুখ থেকে শোনা, তার নাম বলতে পারবো এখনই।

'পরে বলবেন তো?' স্বাভাবিক হলো রূপালী 'আমি এখন ঠিক ধরেছি, আসলে কথাগুলো আপনাকে কে বলেছে।'

'কে?'

'স্বয়ং নায়ক তো?'

'বলে যাও।'

'তার মানে তিনিও নন?'

'না।'

চোখ বুজে রূপালী বোধ হয় চেনা মুখগুলো হাতড়াচ্ছিলো। কাউকে না পেয়ে হতাশ হয়ে বললো, 'হার মানলাম আমি। তবে বাকি অংশটা আমিই বলবো। হঠাৎ ওই ঘটনা অর্থাৎ চিরুনী মাথায় দেওয়ার পর নীচ থেকে একটা গম্ভীর গলা ভেসে এলো। তাকিয়ে দেখি দলপতি-কাম-নায়ক। একমুখ আষাঢ় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার জানলাটার ঠিক নীচেই। দুরুদুরু বক্ষে নেমে এলাম বাস থেকে। আমাকে সঙ্গে করে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেলেন তিনি, 'দলটা আমার…।' তারপর চুপ। দৃষ্টির আগুন দিয়ে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুড়িয়ে ছাড়লেন ভদ্রলোক। 'এটা ব্যভিচারের জায়গা নয়।' ওঁর নিশ্বাস বেশ দ্রুত হচ্ছিলো, তুমি আমার মান সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে রূপা; এটা তোমার কাছ থেকে আমি আশা করি নি।'

'কী আশা তুমি করো আমার কাছে?' ফুঁসে উঠলো রূপালী, 'ব্যাভিচার তুমি করো না?'

'আর কথা নাই-বা বললাম,' রূপালী তাকালো আমার দিকে।

দেখি ওর চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে। নিশ্বাস দ্রুত। যেন সে অতীতের একটি মুহূর্তের ঘরে অনায়াসে চলে যেতে পেরেছে।

'সেই দিনই আমি জেদের শিখরে উঠে বসলাম। ডিসিসন নিয়ে ফেললাম।'

'তোমাদের নেওয়া ডিসিসনটা অমনি কানে এলো আমার—,'আমি হাসতে হাসতে বললাম।'

'কী করে এলো!' রূপালীর দৃষ্টিতে বিস্ময় আর প্রশ্ন - দুইই।

'কাবেরী' বলেছিলো।'

'এ-মা—'রূপালী বিছানায় এলিয়ে পড়লো। তাকালো অনিন্দ্যের দিকে, 'তোমার ভাইঝির পেটে পেটে এতোও ছিলো?'

রূপালী-অরূপ পুরনো অপেরা থেকে চলে এসে জয়েন করলো আর এক দলে। পরের মরশুমে। তার আগে অবশ্য রেজিস্ট্রেশনটা সেরে রেখেছিলো। সামাজিক বিয়েটা হলো পরে। ওরা দু'জনে বাসায় এসে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলো। রতনমণি দে-র সঙ্গে সস্ত্রীক আমি বিয়ে বাড়ি গেলাম। অরূপদের পৈতৃক আবাসেই ফুলশয্যা। আত্মীয়-স্বজন এবং নিমন্ত্রিতদের আনাগোনায় বাড়িটা সরগরম। সেজেগুজে একটা সিংহাসনে বসে আছে কনে, যেন রাজরাণী। সামনে যেতেই একমুখ উজ্জ্বল হাসির প্রশান্তি। নেমে এসে প্রণাম করলো নববধূ, বললো, 'আমি কী সুখী হতে পারবো দাদা?' 'নিশ্চয় পারবি।' আমি বললাম, 'জাগতিক সুখটা নিজের মনে; মনকে শক্ত রাখিস, দেখবি ওই পথ ধরে সুখের দেবী মনের সিংহাসনে বসেছে।'

আর কেউ দেখেছিলো কিনা জানি না, প্রণামের পর যখন রূপালী নিজের মাথা তুললো, কিছুতে তাকালো না আমার চোখে। কেন তাকালো না? চুপিচুপি আজ বলি, আমি দেখেছিলাম, ওর চোখের কোল ভিজে। নীচ অধর কাঁপছে অতি দ্রুত। একবার ভাবলাম শুধোই : হ্যাঁরে রূপা, সে এসেছিলো? কিন্তু গোটা আনন্দের দুধটা ছানা কাটুক এমন কিছু করতে চায় নি মন। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ভাবলাম, এঁদের সবাইকে বারণ করে দিয়ে যাই যেন এই দিনটাকে মেঘলা করতে কেউ না এসে উপস্থিত হয়।

কাবেরীর সঙ্গে দেখা ও-বাড়িতেই। ওকে টেনে নিয়ে নিরালা এক কোণে গেলাম। শুধোলাম।

ও বললো, 'না, এখনও আসে নি।'

আমাদের ঔপন্যাসিকদের হাতে পড়লে এই কাহিনীটাই বেশ সরস, রসালো এবং রগরগে হয়ে উঠতে পারতো। কী রকম হতো অনুমান করতে পারেন? আমার এক বন্ধু, যাঁকে বলা যায় উপন্যাসের পোকা, সে প্রতিবাদ করলো কথাটার। 'সব ঔপন্যাসিককে টানা উচিত নয় তোমার। তুমি বরং বলতে পারো অন্যদের কথা। এ-কাহিনী তাঁদের হাতে পড়লে, এঁদের কেউ কেউ নায়ক নায়িকাকে যৌবনের আঁচ কমাবার পবিত্র কর্মে নিযুক্ত করতেন। বাসের মধ্যে, বনে জঙ্গলে, বাসাবাড়িতে এমন কি উর্ধ্ব, অধঃ সর্বত্র যৌনাচারে লিপ্ত করিয়ে তার উত্তেজক বিবরণ ফলাও করে লিখতেন। একদল আবার দিশি কি বিদিশি মদ্যপান করিয়ে চরিত্র দু'টিকে চেতনার গভীরে নামিয়ে এনে বলতেন, জীবন কী ও কেন? আবার এমন ঔপন্যাসিকও পাওয়া যাবে যেখানে এই চরিত্র দু'টিকে প্রতীক হিসাবে তাঁরা ব্যবহার করতেন। তুমি যেভাবে কাহিনীকে এনে দাঁড় করালে, ওঁরা সে-পথেই হাঁটতেন না। শেষ হতো এ-ভাবে: অনি কী ভাবছিলো, তার মন মঘা নক্ষত্রের জল ছুঁয়ে শনি গ্রহের চারপাশ ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। রূপা আলগোছে তার কাঁধে হাত রাখতেই ভাসমান চেতনাকে ফিরে পেলো অনি। অন্যমনস্কভাবে বললো, 'চলো।' দু'জনে এগোতে লাগলো। ঋজু পথ। আকাশের চাঁদ দামী আইসক্রীমের মতো গলে গলে পড়ছে। হাওয়া বইছে ছুটন্ত উন্মাদিনীর এলোমেলো চুলের মতো। সামনে গর্ত। ওরা স্থির, নিস্পন্দ। সময় থেমে গেছে। দুই মেরু বাড়িয়ে দিলো হাত। সোভিয়েত। আমেরিকা।'

আমি হেসে উঠলাম।

পাঠক বললেন, 'জীবন নিয়ে সাহিত্য; সাহিত্যই জীবন নয়। মানুষের কল্পনা এমনিতে জন্মায় না। অভিজ্ঞতা, দর্শন-বৈশিষ্ট্য, উপলব্ধি, অনুভবের গভীরতা ইত্যাদি মিলিয়ে লেখকের তৃতীয় নয়ন খুলে যায়। কল্পনা সার্থক হয় তখনই। না হ'লে অবাস্তব কল্পনাকে আমরা রূপকথা বলি কেন? আসলে আমাদের সাহিত্যের বড় অভাবটা ওখানেই। একটা উপন্যাস লিখতে যেখানে একটা লোকের জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয়, সেখানে এ-দেশে বছরে ডজন-খানেক বাচ্চা বিয়োয় লেখকরা। কিসে সাহিত্য হয়? বড়ো কঠিন প্রশ্ন। যদিও কেবলমাত্র সত্যকে নিয়েই সাহিত্য নয়।'

আমি বিতর্কে যাই নি। কারণ আমি জানি এই কাহিনীর যিনি নায়ক, নায়িকার

পেছনে তার দানটাও খুব একটা কম নয়। গাঁয়ের একটি আটপৌরে সাধারণ মেয়েকে যাত্রায় এনে তাকে শিখিয়ে, পড়িয়ে. কাছে কাছে রেখে একজন টপস্টারে পরিণত করেছেন তিনিই। নায়ক যদি সত্যিই রূপালীকে জীবনের আসল সহচরী করতে চাইতো বাধা দেবার কেউ ছিলো কি ? হয়তো এমনও হতে পারে দলের স্বার্থরক্ষার জন্যই ওই ব্যক্তি এ-ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন।
অনিন্দ্য রূপালীর সংসার এখন পরম সুখের নীড়। রূপালীকে কিন্তু এখানে একদম বেমানান মনে হয় না। নীড় প্রত্যাশী পাখিদেরও বুঝি এমনিই হয়।

সাত

বিরস বদনে সামনে এসে দাঁড়ালো মাখন, মাখনলাল নট্ট—নট্ট কোম্পানীর মালিক। আমি মুখ তুলে তাকালাম। ও মাথা নাড়লো। তার মানে, যে-কাজে মাখন গিয়েছিলো তা সফল হয় নি। তবু আমি বলি, 'যাবে না?' মাখন বললো, 'না।'

সে-বছর পাটনা দুর্গাবাড়ি বায়না করেছে নট্ট কোম্পানীকে। তিন দিনের গান। কিন্তু একটি পালা ওঁদের চাই-ই-চাই। সে পালাটিরও তখন টপ যশ। নাম 'মহীয়সী কৈকেয়ী'—পালা-সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র রচনা। দিন কয়েক আগে মাখন আমাকে জানিয়েছে, পাটনা অনুরোধ করেছে, কৈকেয়ীর চরিত্রে তাঁরা কাঞ্চনকে চায়। অথচ সে বছর কাঞ্চন নেই। বিভিন্ন লোকের মুখ থেকে শুনেছি, সে নাকি হাবড়া অঞ্চলে রিকশা চালাচ্ছে।

অবাক হবার মতন ঘটনাই। এক বছরের মধ্যে দেখলাম, দলের একটি সাধারণ ছেলে, যে-'সুলতানা রিজিয়া' পালায় মাত্র উনিশ নম্বর পার্ট বলতো, একটা ঘটনাতে সেই ছেলেটি হয়ে গেলো নট্ট কোম্পানীর হিরোইন। চারদিকে তার যশ আর যশ। কাঞ্চন করছে রিজিয়া? কৈকেয়ী করবে কাঞ্চন? ব্যাস নায়েকরা লাইন দিলো। কাউন্টারের সামনে অভাবিত ভিড়। সেই ভারতজয়ী পুরুষ হিরোইন এখন চালাচ্ছে রিকশা?

যেদিন কাঞ্চন নট্টর চাকরী ছেড়ে চলে যায়, সেদিন গদী থেকে বিদায় নিয়ে ও এসেছিলো আমার বাসায়। এসে ও প্রণাম করলো। বললো, 'আমি বিদেয় নিতে এলাম বাবু।'

'বিদায়!' আমি এক পাহাড় প্রশ্ন নিয়ে তাকাই। 'কিসের বিদায়?'

'আমি আর যাত্রা করবো না বাবু।'

'কেন!'

'সে অনেক কথা।' কাঞ্চনের গলাটা কেমন ভারীভারী, ভিজে। 'সিংহাসন

কেড়ে নিলে রাজার আর থাকে কিছু ?' ওর চোখ দু'টো ছলোছলো, বাষ্পাকুল। দেখলাম গাল গড়িয়ে চোখের জল পড়ছে। উঠতে যাচ্ছিলো, আমি ওকে বসতে বললাম। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও চোখ মুছতে লাগলো। ঠিক তখন আমার মনে পড়লো, মাখন বলেছিলো আমাকে যে, কাঞ্চন থাকতে চাইছে না কিছুতেই। সে বায়না ধরে বসেছে, নট্টতে তার পজিশন চাই টপের। অর্থাৎ সবার ওপরে তার নাম চাই। কিন্তু তা কী করে সম্ভব ? কমল মিত্র যেখানে রয়েছেন, সেখানে কাঞ্চনের নাম টপে দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এই পর্যন্তই জানতাম আমি। জানি না, তারপর অনেক জোয়ার ভাঁটা গঙ্গায় বয়ে গেছে।

আমি বললাম, 'এটা তোর অন্যায় দাবি, মনি।'

'অন্যায় বললে অন্যায় কিন্তু আমার কাছে ওটাই ন্যায়। বলুন না বাবু, আমাকে সিংহাসনে বসান নি ? ছিলাম রাস্তার ছেলে, ছাপ্পান্ন টাকা মাইনে পেতাম, কুড়ি নম্বরী রোল করতাম। সেখান থেকে তুলে এনে কেন আমাকে সিংহাসনে বসালেন ? আর বসালেনই যদি, আজ কেন রাস্তার ছেলেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিছেন রাস্তায় ?' রাগে, আবেগে, অভিমানে আবার কেঁদে ফেললো ছেলেটা।

আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি, 'দেখ মনি, তুই যা চাইছিস তা দেওয়া সম্ভব নয়। বড়োর সম্মান দিবি না ? কমল মিত্র এই নামটি রঙ্গজগতে জ্বলন্ত সূর্যের মতন। হালে তাঁর পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা ক-জনের আছে ? তোর বায়না মেনে নিলে তাঁকে অসম্মান করা হয়। এতে তোর ভাল হবে না রে।'

কাঞ্চন বললো, 'ভাল আমি চাই না বাবু, ভাল আমি চাইও নি। কিন্তু যেখানে আমি বসেছি একবার, সেখান থেকে নামবো না। যদি জোর করে আমাকে নামিয়ে দেন তো আমি যাত্রাই আর করবো না।'

অভিমানী, জেদী ছেলেটা সত্যি সত্যি চলে গেলো যাত্রা-জগৎ থেকে। অনেক শিল্পী আমি দেখেছি কিন্তু এমন পুঞ্জীভূত অভিমান দেখিনি কারও মধ্যেই।

এর ঠিক বছর তিনেক আগে, চূড়ান্ত ব্যবসায় মরশুমে নট্ট কোম্পানীর ওপর বাজ ফেলে চলে গিয়েছিলো সুজিত পাঠক আর চপল ভাদুড়ী। পুরনো প্রবীন যাত্রামোদী মানেই জানেন চপল ভাদুড়ী তথা চপলরানী নট্ট কোম্পানীর পালার কতখানি অধিকার করে অবস্থান করছিলো। চপল ছিলো মঞ্চ ও চিত্রাভিনেত্রী প্রভা দেবীর ছেলে, আজকের মঞ্চের গৌরব কেতকী দত্তর ভাই। যে কোনো কারণেই হোক, লেখাপড়া এগোয় নি। দেখতে সুন্দর ছিলো ছেলেটি, আচার

আচরণে মেয়েলি ঢংয়ের প্রাধান্য ছিলো বলেই সূর্যকুমার দত্তর নজরে পড়ে। সবাই ভেবেছিলো জিভ্‌ ভারী এই তোতলা ছেলেটাকে দিয়ে সূর্যবাবু কোন রোল করাবেন! সূর্যকুমার দত্ত কিন্তু সকলের ধারণাকেই উল্টে দিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখেছেন সূর্যবাবু হাতে একটা কাঠি নিয়ে দিনরাত চপলকে উচ্চারণ শেখাচ্ছেন। কাঠিটার মাথা চপলের মুখগহ্বরের বিভিন্ন অংশে ঢুকিয়ে উচ্চারণ-স্থান বুঝিয়ে দিতেন। কখনও বা জিভের বিভিন্ন অংশ, তালু, দাঁত ও ওষ্ঠকে কোন উচ্চারণে কখন কাজে লাগাতে হয় বুঝিয়ে দিতেন। এমনি করেই কিশোর চপল একদিন যাত্রাজগতের সুপার-স্টার হয়ে উঠেছিলো। সূর্যকুমার দত্তর অপ্রাণ চেষ্টায় তিলেতিলে রচিত হয়েছিলো এক একটি সোপান। সেই চপল ভর মরশুমে আচমকা, উইদাউট নোটিশ নট্ট কোম্পানী ছেড়ে চলে গেলো। কোলিয়ারী এলাকায় ভালো যশ ছিলো দলের। শেষ গানের রাত্রে মাখন উপস্থিত ছিলো আসরে। তখনও সে জানতে পারে নি তার বড আপন করে নেওয়া সুজিত পাঠক আর চপলরাণী এমনি ভয়ঙ্কর একটা বাজ হানবে দলের ওপর।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'সুলতানা রিজিয়া' পালার বিজ্ঞাপন বেরোয়। সঙ্গে সঙ্গে সারা বাঙলা আলোড়িত। ঠিক কালীপুজোর পর কোলিয়ারিতে যাত্রা করতে নেমেছে নট্ট। এই সময়ে সারা চিৎপুর জুড়ে জোর গুজব : নট্ট গেলো, নট্ট গেলো। বেদনার চাইতে উল্লাস বেশি। যেন নট্ট কোম্পানা বন্ধ হয়ে গেলেই সব পথ পরিষ্কার। আমি কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি চিৎপুরী গুজবকে। মাখনের দল ছেড়ে শিল্পী চলে যাওয়া তখনও যেমন সংবাদ ছিলো, আজও তেমনিই আছে।

ইচ্ছে করলেই টেলিফোন করে জেনে নিতে পারতাম কিন্তু ওই রকম একটা দুঃখের খবর জানতে চাওয়াটাও বেদনার। ভাবছিলাম কী করি। ঠিক এমনি এক সময়ে মাখন এসে উপস্থিত। তখন বিকেল। অফিসে বসে লেখার কাজ করছিলাম। সামনে মাখনকে দেখে মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম ওর মুখটাও বিকেলের মতো বিষণ্ণ। বসতে বললাম ওকে। কলম রেখে শুধোলাম, 'সত্যি?' হ্যাঁ, মাখন মাথা নেড়ে বললো, 'সত্যি।' অর্থাৎ সুজিত পাঠক আর চপল বিনা নোটিশে দলের বাস থেকে নেমে গেছে।

এর চাইতেও বিশ্বাসযোগ্য হতো যদি কেউ আমাকে বলতো, কাল রাত্রে পৃথিবীটা

ওল্টোট পালোট খেয়েছে। সুজিৎ পাঠক-এর আগেও বার-কয়েক দল ছাড়ার কোশিস করেননি তা নয়, কিন্তু কোনো-না-কোনোভাবে সে খবর অনেক আগেই মাখনের কানতক পৌঁছেচে। মাঝখান থেকে দৌড়াদৌড়ি বেড়েছে মাখনের। সুজিত পাঠক মশাই অবশ্য দর বাড়িয়ে নিয়েছেন যথারীতি এবং থেকে গেছেন সেই নট্ট কোম্পানীতেই।

চিৎপুরের যাত্রাপাড়ার কাছে এ-কৌশলটা যদিও নতুন নয়, তবু এই অস্ত্রেই মালিকরা কুপোকাৎ। নিজের বাজার দর বাড়াবার এ একটা পদ্ধতি। মরশুম চলাকালীন অন্য দলের মালিক ম্যানেজারদের গোপনে শিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করার ঘটনাটাও চিৎপুরে কিছু নতুন চালু হয় নি। কিন্তু শিল্পীরা যা ঘটে তার চাইতে রটায় অনেক বেশি। প্রতি মরশুমেই শুনি নট্ট থেকে নাকি ডাক এসেছে। এ-ডাকের রকমফের নেই। টপ-টু-বটম প্রায় সকলেই ওই জুজুর ভয় দেখিয়ে মালিককে বেসামাল করে আখের গুছিয়ে নেয়। মালিকদের অনেকে সরাসরি মাখনকে না জিজ্ঞেস করে শুধোয় আমাকে। আমি হাসবো না কাঁদবো বসে বসে ভাবি। তারপর দেখলাম ওই পদ্ধতি সামান্য পালটাতে লাগলো। নট্ট রইলো অবশ্যই, তার পাশাপাশি আরও কয়েকটা বড়ো দলের নাম যোগ হতে শুনলাম। যাত্রায় এটা ওপেন সিক্রেট। তবু মালিকরা টোপ গেলে। দেড় হাজারী মাল বিনা দ্বিধায় পাঁচ-হাজারে কিনে নেয়।

সুজিৎ চপলের ক্ষেত্রে কথাটাকে অতদূরে নিয়ে যেতে চাই না। বা নিয়ে যাওয়া সঙ্গতও হবে না। প্রথমত এঁরা দু'জনেই নট্টর পারিবারিক আত্মীয়র মতন সম্মান পাচ্ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এরা দু'জনেই ছিলেন মাখনলাল নট্টর কনফিডেন্সের আঁওতার মধ্যে। তৃতীয়তঃ এই দুই শিল্পীর মধ্যে গুরুভক্তি ছিলো অতি প্রবল। সুতরাং ভেবে পথ পাওয়া কঠিন, এই অসম্ভব সম্ভব হলো কেমন করে! তা ছাড়া চলতি মরশুমে ওরা নাওই বা ভিড়াবে কোন দলের ঘাটে— আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। সুতরাং মাখনকে শুধোই, 'অন্য কোনো দলে যাচ্ছে নাকি ওরা?'

মাখন মাথা নেড়ে জানায়, সে কিছুই জানেনা।

মুখে কথা বলি কিন্তু মন সারা চিৎপুরের সকল দলের গুঁফো রাণীদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। সুজিৎ পাঠকের জায়গাতেই বা বসানো যেতে পারে কাকে! সুলতানা রিজিয়া পালা যদি যশের এভারেস্ট না স্পর্শ করতো, তবে এ-সব ভাবনার

কারণ থাকতো না। এর দিন-কয়েক আগেই কোলিয়ারী-লর্ড অনিল ভাণ্ডারীর সঙ্গে দেখা। চিৎপুরে। বগলে পোর্টফোলিও, দু'হাতে পোস্টারের রোল। বললো, গোটা কোলিয়ারী এলাকার মানুষেরা রিজিয়া দেখে ও দেখার জন্য পাগল। এই চাহিদার বিপুল তরঙ্গকে কি রোধ করতে চায় ওঁরা! কিন্তু একের ভাগ্যকে কি অন্যের পক্ষে কেড়ে নেওয়া সম্ভব? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি এবং এই পথে সান্ত্বনা পেতে চাই। আসলে এই পালাটির পরিকল্পনা থেকেই আমি জড়িত। লেখার কাজ শেষ করে ব্রজেনবাবু চিঠি পাঠালেন আমাকে। ইনল্যাণ্ড :লেটার। লিখলেন, 'সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে নট্ট কোম্পানী আর এক ইতিহাস সৃষ্টি করলো। যাই হোক, আমার কাজ শেষ। মাখন প্রায়ই আসে ইছাপুরে, আপনি একটু সময় করে এলে পড়ে শোনাতে পারতাম আপনাকে। তাতে আপনার শোনা ও আমার সংশোধন – দুইই হতো।' সময়াভাবে যাওয়া হলো না। সুতরাং আমাকেও পত্রের আশ্রয় নিতে হলো: ভয়ানক ব্যস্ত, ক্ষমা করবেন। পালাটি দিয়ে দেবেন। মহলাতে আমি দেখে নেবো। ওই সনে আগের বছরের একটি পালা চালু ছিলো—'ভরত বিদায়'। সে এক অসামান্য রচনা। তৃতীয় পালাও ব্রজেনবাবুরই—নাম: 'দুধ সায়রের দেশে।'

সময় করে মহলায় হাজির হতে পারিনি একদিনও। 'সুলতানা রিজিয়া' দেখলাম আমি নিউ আলিপুরের এক আসরে। দলে ছিলেন আচার্য পূর্ণেন্দু-শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত পাঠক, চপলরানী, নির্মল অধিকারী, মনোজকুমার, ফণী ভট্টাচার্য, হরিগোপাল, মনীন্দ্র নন্দী, খোকন বিশ্বাস গুরুদাস মণ্ডল, কার্তিক দাস, গোষ্ঠ পাল, নবকুমার এবং আরও অনেকে। দর্শকদের বারো আনাই প্যাণ্ট-কোট-পরা বাঙালী সাহেব-সুবো এবং আধুনিক রূপসজ্জায় সাজা বাঙালী মেম আর মিসিবাবারা। পালা ভাঙলে দর্শকরা উঠে পড়লেন কিন্তু কেউ স্থান ত্যাগ করলেন না। সকলের এক দাবি, তাঁরা আর্টিস্টদের দেখতে চান। অতএব মেক-আপ নিয়েই প্রায় সকলকে আসতে হলো আসরে। হাজার কয়েক মানুষের বিপুল করতালিতে মুখর হলো কয়েকটা মিনিট। ঠিক তখন, আমার মনে হলো, বুকের ছাতিটা যেন আচমকা দ্বিগুণ হয়েছে। শোভাবাজার রাজবাড়িতে যাত্রা উৎসব করতে করতে যে-প্রতিজ্ঞা আমি মনেমনে গ্রহণ করেছিলাম, যাত্রার গা থেকে গেঁয়ো অপবাদের পোশাকটাকে আমি ছিঁড়ে ফেলবো। প্রমাণ করবো, যাত্রা গ্রামীন বা তথাকথিত লোকশিল্প নয়। নয় অচ্ছ্যুৎও। সময় এবং

সভ্যতার সঙ্গে পা মিলিয়ে সে এগিয়ে যাবে। পারফরমিং আর্টসের মধ্যে যাত্রাই জয় করে নেবে শ্রেষ্ঠ স্থান। মডার্ন আর্টসকেও সে লজ্জা দিতে পারবে। স্বপ্ন দেখলাম, এখানেই তার সূচনা এবং ভবিষ্যতে যাত্রা শহরের দর্শকদের মন জয় করবে। একদিন গোটা কলকাতার মানুষেরা হাত বাড়িয়ে ঠাঁই-পিঁড়িতে বসা যাত্রাকে বসতে দেবে চেয়ার টেবিলে।

এই স্বপ্ন দেখা প্রসঙ্গে, আমার ছোটবেলায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তখন আমার বয়স খুবই কম। টেউরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। ছুটি হয়েছে শারদীয়া পুজোর। বাড়ির সামনের মাঠে ছয়দিন ধরে যাত্রা হবে আর্য অপেরার। দল এসে পৌঁছেচে কাল রাত্রে। সকাল থেকে সারাটা দিন যাত্রাদলের বাসা বাড়ির চারপাশে ঘুরি। ভাবি কখন শুরু হবে কনসার্ট, কখন গিয়ে দাঁড়াবো সাজঘর থেকে শিল্পীদের আসরে যাতায়াতের পথের ধারে এবং কখন রাম কি নারায়ণ, শিব অথবা ব্রহ্মা কিংবা সীতা কি সুভদ্রা, লক্ষ্মী বা সাবিত্রী আমাকে না ছুঁয়ে কিছুতেই যেতে পারবে না আসরে। ·থন অভিনয় দেখার চাইতে স্পর্শসুখটাই ছিলো বড়। মনে হতো দেবদেবীর স্পর্শে আমি ধন্য হোলাম। সেদিন সপ্তমী। বিদেশ থেকে কখন যে আমার এক মামা এসে পৌঁছেছেন জানা ছিলো না। হঠাৎ বিকেলের দিকে দেখলাম। মনে হলো তিনি রুষ্ট। দেখলাম, মাকে জব্বর ধমকানো ধমকাচ্ছেন। আস্কারা দিয়ে নাকি আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হচ্ছে। আমার মাতুলের সুনিশ্চিত ধারণা যাত্রা শুনলে নাকি মানুষের ইহকাল পরকাল অতি ঝরঝরে হয়ে যায়। তাই ঠিক সন্ধ্যায় যখন আসরের দিকে যাওয়ার জন্য পোশাক পাল্টাতে এসেছি, তখন ধরা পড়লাম। জবরদস্তি আমাকে পিঠমোড়া করে বাঁধা হলো। কোমড়ে আটকানো হলো শেকল। মার শোবার ঘরের মোটা শালকাঠের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো আমাকে। আমি যাত্রা শুনতে যাবো; মাতুল মোড়ায় বসে পথ আগলেছেন। তাঁর হাতে মোটা একটি বেত-লাঠি। আমি যত কাঁদি, মাতুল মশাইয়ের হাতের বেতটা তত ল্যাকপ্যাক করে নাচে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এলো। যাত্রার পাণ্ডেল আর আমার মধ্যে ব্যবধান আমাদের পশ্চিম-দুয়ারী বিশাল ঘর। লোকজন জমছে, আসরে হ্যাজাক ডেলাইট উঠছে—গুঞ্জরণ, গুঞ্জরণ। কাঁদতে কাঁদতেই আমি ভেবে নিলাম

সাজঘরের আসন জুড়ে এতক্ষণ শিল্পীরা সব সাজতে বসে গেছেন। বাজনা এসেছে আসরে। আমি টানা কেঁদে যাচ্ছিলাম। কোথা দিয়ে যে সময় পার হচ্ছিলো জানা নেই। হঠাৎ কানে এলো ঘণ্টার আওয়াজ, তারপর কনসার্টের সুর। আমি আর স্থির থাকতে পারছিলাম না। দুঃখ বেদনা আক্রোশ সব মিলিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। মাতুল মশাই সঙ্গেসঙ্গে যষ্ঠি নাচিয়ে আমার ওপর গলা চড়িয়ে ধমকে যাচ্ছিলেন। তাতে কিন্তু কনসার্ট বন্ধ হলো না। সে বাজছে তো বেজেই চলেছে। প্রথম কনসার্ট এমনি করে শেষ হ'লে দু'নম্বর কনসার্ট শুরু হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। রাগে, দুঃখে, আক্রোশে, ক্ষোভে আমি শাল কাঠের থামে মাথা ঠুকতে শুরু করে দিলাম। দেখতে দেখতে মাথার ক্ষত থেকে রক্তের ধারা নেমে এলো। সারামুখ ভেসে গেলো তাজা রক্তে। তবু বিরাম নেই। লোক জমানো কান্না কেঁদে যাচ্ছিলাম অবিরাম।

আমার বন্ধুরা লুকিয়ে-চুরিয়ে বন্দীদশা দেখে গেছে আমার। সবাই খুব নতুন জামা প্যাণ্ট জুতো পরে যাত্রা দেখতে গেলো। বাবা তখন দিনাজপুরে। জানতাম বাবা থাকলে আমার এই দুর্দশা করার সাহস পেতো না মাতুলমশাই। সেই দুঃখেই কান্নার সঙ্গে বারবার বাবার নাম উচ্চারণ করে যাচ্ছিলাম আমি। এবং প্রাণপণে শিকল ছিন্ন করবার জন্য জোর দিচ্ছিলাম। আমার অবস্থা দেখলে হয়তো পাষাণও গলে জল হতো; কিন্তু মাতুল মশাই বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। অবশেষে মা এলো। বাঁধন খুলে দিলো আমার। কোলে টেনে নিয়ে রক্ত মুছিয়ে দিয়ে বেঞ্জিন লাগালো, ব্যাণ্ডেজ করে দিলো। মা কাঁদছিলো। আমি জামা-প্যাণ্ট পরে সটান দৌড়ালাম যাত্রার আসরের দিকে। গিয়ে দেখি ভিড়ে ভিড়াক্কা। ঠেলেঠুলে কোনোরকমে ঢুকে পড়লাম। দাঁড়ালাম অবশ্যই সামনে কিন্তু জায়গাটা হলো আসর থেকে অনেক দূরে, শিল্পীরা সেজে যেখানে দাঁড়ায় তারই প্রায় কাছাকাছি।

ক্ষতের ব্যথা-বেদনা কখন যেন ভুলে গিয়েছিলাম। শিল্পীরা আমার গা ছুঁয়ে যাচ্ছে, সেটাই আনন্দ। পালা ছিলো লক্ষণ বর্জন। রাম, লক্ষণ, সীতা, দশরথ গা ছুঁয়ে যাতায়াত করছে। ওঁদের মেক-আপ, পোশাকের গন্ধ মিলিয়ে কেমন মাতাল করা বাস। শিল্পীদের ঢোকা বেরোনো যখন নেই তখন গলা বাড়িয়ে যাত্রা শুনি। এমনি করে কতক্ষণ সময় কেটেছিলো জানি না, হঠাৎ দেখি পাশেই নিচু গলার চাপা কলরোল। চোখ ফিরিয়ে দেখি একগুচ্ছ সখী চমকদারী সাজে

সেজে এসে জমেছে আমার পাশেই। তখন স্বরপার্টি থেকে ফুঁ দিয়ে বাজানো পেতলের বাঁশী না বাজলে সখীদের আসরে প্রবেশাধিকার ছিলো না। দেখলাম বয়সে একটু বড়ো সখিরা বিড়ি টানছে। হঠাৎ এক সখি তার হাতের বিড়িটা আচমকা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে 'ধরতো একটু' বলে নাচতে নাচতে আসরে ঢুকলো। ব্যাস, আর আমাকে পায় কে! সখির জ্বলন্ত বিড়ির দিকে তাকিয়ে আমি ফুলে ঢোল। তাকিয়ে দেখলাম আমার বন্ধুরা কেউ আমাকে দেখছে কিনা এবং হিংসায় ওদের কেউ জ্বলছে কিনা। আমার এক বন্ধু, এগিয়ে এসে বললো, 'ওমা বিড়ি টানছিস তুই!' আমি বুক চেতিয়ে ধমক দিলাম, 'ধ্যেৎ, সখি দিয়েছে।'

আনন্দে উত্তেজনায় ঘামছিলাম। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি বিড়ির আগুনটা ক্রমশ কেমন নিবুনিবু হয়ে আসছে। এমন সময় কানে ব্যথা পেলাম। মনে হলো কেউ আমার বাঁদিকের কানটা শক্ত আঙুলে চেপে ধরেছে। উঃ! পাশ ফিরে দেখি মাতুলমশাই কংসের মতন দাঁড়িয়ে। আমার কানটা সমূলে তাঁর হাতে। বাজখাই গলায় ধমকের সুরে বললেন, 'হারামজাদা কোথাকার, বিড়ি খাচ্ছিস?' কানের ব্যথাতে মুখ বিকৃত করে বলি, 'না খাইনি।' সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচকা টান। কানটা যায় যায়। 'হাতে ওটা কী, এ্যাঁ?' আমি কাতর গলায় কোনোরকমে বলি, 'বিড়ি। সখী দিয়েছে।' অমনি কষে একটা থাপ্পড়, 'ফের মিথ্যা কথা!' ধমক এবং জব্বর গোছের থাপ্পড়ের সঙ্গেসঙ্গে এমন টান, মনে হলো কানটা ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে মাতুল চিলটা। লোকে বলে কান টানলে মাথা আসে। আসলে মাথার না এসে উপায় কি? অতএব অনেক কষ্টে জোগাড় করা জায়গা ছাডতে হলো। মামা আমাকে সটান হাজির করলেন মা-র দরবারে।

আমার হাতে তখনও জলজ্যান্ত বিড়ি। সে ততক্ষণে নিবে একেবারে জল। রোষকষায়িত চক্ষে মা সরাসরি তাকালো আমার চোখে। তার আগে অপদার্থ, কুলাঙ্গার এই আমি কী ভয়ানক বকে গেছি যে, শেষ পর্যন্ত বিড়ি ধরেছি এবং অচিরেই গাঁজার কলকে উঠে আসবে আমার হাতে—এরকম নালিশ মাতুলমশাই করে ফেলেছেন।

'বিড়ি খেয়েছিস?' মার মুখচোখ লাল।

'না।' আমি শিরদাঁড়া টান করে আরও সোজা হই।

খপ করে হাত থেকে বিড়িটা কেড়ে নেয় মা। তুলে ধরে আমার সামনে, 'এটা কী ?'

'বিড়ি।' আমি বলি। 'আসরে হঠাৎ বাঁশী বেজেছিলো, তাই সখী ধরতে বলেছে।'

মা গলা বাড়িয়ে মুখটা আমার মুখের কাছে আনলো। হা করতে বললো। এবং গন্ধ শুঁকলো। তারপর টেনে নিয়ে গেলো বিছানায়। এটা আমার শাস্তি। মার পাশে শুয়েও সারারাত আমি ঘুমোতে পারলাম না। শুয়ে শুয়ে রাতভর যাত্রার সংলাপ শুনলাম। আমার স্পর্শকাতর মন বারবার চাতকের তৃষ্ণা চুরি করে নিয়ে বলছিলো : চল, আসরে চল।



বাস্তবিক এ এক সমস্যা এবং মহাসঙ্কট। অনেক শূন্যস্থানই পুরণ করা যায়, করেছিও কিন্তু এ দু'জনের জায়গায় বসানো যাবে কাকে ! হঠাৎ চোখ পড়লো, টেবিলে, দেখি কলমটা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। ক্যাপটা কোথায় ? আঁতিপাতি খুঁজি। মাখন বললো, 'কিছু হারালেন ?' হারালাম ! 'হ্যাঁ, কলমের মাথাটা খুঁজে পাচ্ছি না।' আমি খুঁজতে থাকি।

আমার টেবিলে বসেই স্থির হলো, এ-সময়ে দলকে একদিক থেকে বাঁচাতে পারেন আচার্য মহেন্দ্র গুপ্ত। মাখন বললো, অনেকদিন আগে একবার মহেন্দ্রবাবুকে দলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিলো। সেই সময় অগ্রিম বাবদ কিছু টাকাও দেওয়া হয়েছিলো মহেন্দ্রবাবুকে। অনেকবার সে টাকা ফেরৎ দিতে চেয়েছেন মহেন্দ্রবাবু, কিন্তু কবে তাঁকে দরকার হবে কে বলতে পারে এই ভেবে টাকাটা ফেরৎ নেওয়া হয়নি। তা ছাড়া নট্টর ঘরানার এটাই নিয়ম যে, দিলে ফেরৎ চলবে না। দলের এই অবস্থা শুনে মহেন্দ্রবাবু রাজি না হয়ে পারলেন না। অতএব সুজিৎ পাঠকের শূন্যস্থানে বসলেন নাট্যাচার্য মহেন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু চপল,

চপলের শূন্যস্থান? এমনিতেই যাত্রাশিল্পে পুরুষ-রাণীর সংখ্যা কমে এসেছে। নট্ট বাদে অধিকাংশ দলেই মহিলা চরিত্রে অভিনয় করার জন্য এসেছে মেয়েরা। তবু জুৎসই একটা গুঁফোরাণীর নাম কিছুতেই মনে পড়ছে না, ছবিও ভাসছে না চোখে। শুধু পুরুষরাণী হলেই চলবে না, তাকে দাঁড়াতে হবে চপলরাণীর জায়গায়। দু'রাত ঘুম নেই। হঠাৎ একটা মুখকে ভাসাভাসা কল্পনা করতে পারলাম। ডেকে পাঠালাম মাখনলাল নট্টকে। সেও চিন্তিত। দল সবেতন ছুটি দেওয়া হয়েছে একুশ দিনের। বাকি মাত্র উনিশটা দিন। এর মধ্যেই রিজিয়াকে তৈরি করতে হবে। মাখনকে শুধোলাম, 'সুলতানা রিজিয়া পালায় রিজিয়ার ভ্রাতৃবধূ সেজেছিলো যে ছেলেটি তার নামটা কী?' 'মণি', মাখন বললো, 'মণীন্দ্র নন্দী।'

'ওকে দিয়ে কাজ চলবে না?'

'না।' স্পষ্ট জবাব দেয় মাখনলাল নট্ট। 'একেবারে নতুন।'

'হোক', আমি বললাম, ফিগারে আসবে। চেহারাটাও ম্যানেজ করা যাবে। আমার মনে হয় মণিই পারবে।' আমি কেমন যেন একটা বল পাই মনে। 'ছেলেটা গদীতে আছে?' মাখন জানালো আছে। আমি উঠলাম তক্ষুণি। গদীতে এসে ডাকতে বললাম মণিকে।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। গঙ্গার শীতল হাওয়ার ঝাপটা আছড়ে পড়ছে এ-বাড়ির তিনতলার সর্বত্র। আমি বারন্দায় রেলিঙ ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মাখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তখনও তার মনের সঙ্কোচ কাটে নি। ভীরু আপত্তি করে যাচ্ছে। এমন সময় মণি এলো। খুব কুন্ঠিত ভাব। প্রণাম করলো আমাকে, মাখনকেও। 'এ-দিকে আয়', আমি ডাকলাম ছেলেটিকে। ও এমনভাবে এগিয়ে এলো যেন অজানা আতঙ্কে কাঁপছে। ওকি ভাবছে ওর চাকরী যাবে? আমি হাসতে গিয়ে হাসি না। ততক্ষণে প্রাক-সন্ধ্যার ছায়া প্রায় গাঢ়তা পাচ্ছে। কিন্তু আলো জ্বলার সময় আসেনি। 'মণি,' আমি ওকে নরম গলায় ডাকি। ও আমার মুখের দিকে তাকায়। 'চপলের পার্ট তুই করতে পারবি?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলো না। মাথা নিচু করলো ছেলেটি।

গঙ্গার জল তোলপাড় করে ফ্ল্যাটটানা স্টীমার যাচ্ছে। গঙ্গার ধার থেকে আসছে চলন্ত মোটর গাড়ির হর্ন। চৌকো ছোট্ট আকাশে কিছু পাখির দাগ। দোতলার

ভাড়াটের মধ্যে বুঝি ঝগড়া লেগেছে। মেয়েপুরুষের চড়া গলার কথা কাটাকাটি এসে পৌঁছচ্ছে এখানে। আমি লক্ষ্য করেছি, প্রস্তাবটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা চমকে উঠলো, কাঁপছিলো। এখনও কাঁপছে মণি। জানি অলক্ষ্যে বিধাতা হাসছেন। যিনি বল দেন মনের, যিনি কথা দেন মুখের তিনি স্তব্ধ। বিশাল কিছু দেবার আগে একী চপল খেলা! দেবো দেবো করেও হাত খুলছেন না কিছুতে।

কাঠের মতো দাঁড়িয়ে আছে মাখন। মাথার ওপরে পাখা ঝাপটাচ্ছে পায়রার দল।

'কীরে!' আমি মণিকে কথার ধাক্কা দিয়ে সচকিত করি, 'পারবি না?'

'বাবু!' আমার দিকে তাকালো ও, মাখনের মুখটা দেখে নিলো একবার, 'আপনার আশীর্বাদ থাকলে…'কথাটা শুনে মাখনের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো জানি না, কিন্তু আমি ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম। এবং সঙ্গেসঙ্গে খপ্ করে ওর হাতটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলাম সূর্যবাবুর ঘরে।

ও-ঘরে তখন বাতি জ্বলেছে। সূর্যবাবু কী যেন পড়ছিলেন, আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে বিস্ময়। চট করে মণির হাতটা ওঁর হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, 'অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন আপনি, অনেক অচলকে সচল করেছেন। এই আপনার শেষ পরীক্ষা। আপনি আর একটা রাণী তৈরি করতে পারবেন না?'

'আমি কি পারবো?' যাত্রা জগতের গুরু মশাই সূর্য দত্ত ইতস্তত করেন।

'পারবেন।' আমি বলি, 'পারতেই হবে আপনাকে।'

সেদিন রাত থেকেই মণিকে নিয়ে বসলেন সূর্য দত্ত মশাই।

আমি রোজ একবার যাই। শুনি, দেখি। দিন সাতেক পরে ঠিক এমনি এক সন্ধ্যায় মণি কাঁদছিলো। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম আমি আর মাখন। 'আমি পারবো না বাবু, ছেড়ে দিন আমাকে'—মণি কেঁদেকেটে মুক্তি চাইছিলো। সতেরো ঘণ্টা রিহার্সাল, বাবু আমার বুক পেট ব্যাথায় টনটন করে। গুরুজী ছাড়ে না কিছুতেই।'

'ভয় পাচ্ছিস!' মণিকে আমি উৎসাহিত করি। 'বড় হতে গেলে কষ্ট করতে হয়। তা ছাড়া এই তো হয়ে এলো। এবার মহেন্দ্রবাবুকে নিয়ে রিহার্সাল হবে।' তারপর তোর ছুটি।'

কিন্তু আমি জানতাম ওর ছুটি নেই। দল বেরোবার আগ-মুহূর্ত পর্যন্ত সূর্যবাবু ওকে ছাড়বেন না। ছাড়তে পারেন না।

ঠিক দশ দিনের মাথায় পোশাক, উইগ, মেকআপ-বক্সসহ মণিকে নিয়ে আমরা গেলাম অলক মিত্রের স্টুডিওতে। অলককে বললাম, 'যত খুশি ছবি তুলতে পারো কিন্তু এমন কয়েকটা ছবি আমার চাই, যা দেখলে মানুষের বিভ্রম হবে, সত্যি কী এ-ছেলে!'

একদিনে নয়, দু' দিনে অলক ছত্রিশখানা ছবি তুললো মণির। প্রত্যেকটি ছবিই অসামান্য। কাগজে ওই ছবি ছাপার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া। তার আগে গেছে নামকরণ সমস্যা। মণির নাম দেওয়া হলো কাঞ্চন। নামকরণটা আমারই।

উনিশটা দিন পার হলো। দল রওয়ানা হলো জলপাইগুড়ি। মাখন, মহেন্দ্রবাবু আর আমি বিমানে বাগডোগরা গেলাম। ওখান থেকে সরাসরি জলপাইগুড়ি। রুবী হোটেলে উঠলাম মহেন্দ্রবাবু, আমি আর মাখন। নায়েক-পার্টি যাত্রার বিশাল প্যাণ্ডেল বেঁধেছে আর্য নাট্য সমাজ প্রাঙ্গনে। গান তিন দিনের। প্রথম দিন 'সুলতানা রিজিয়া', দ্বিতীয় দিন 'মহীয়সী কৈকেয়ী', সমাপ্তি তারিখে 'দুধ সায়রের দেশে।' ইনডিয়ান এয়ারলাইন্সের বোয়িং বিমানে বাগডোগরা যাওয়ার সময় মহেন্দ্রবাবুকে শুধোলাম, 'মণি কেমন করবে বলে মনে হয় আপনার?' মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'নতুন ছেলে, বোঝাটা বড়ো। তবে ভালোই চলে যাবে বলে মনে হয়।'

বিকেল মরলে যাত্রার মাঠে ভিড় উপচে পড়লো। দেখতে দেখতে প্যাণ্ডেল ফুল। বাইরে টিকিট না পাওয়া হাজার কয়েক লোকের গোলমাল। নায়েকপক্ষ ছোটাছুটি করছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্যাণ্ডেলের বেড়া খুলে দিতে বাধ্য হলেন নায়েকপক্ষ। পালা গোড়া থেকেই জমজমাট। নট্টর শিল্পীরা সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে হাজার আস্টেক লোককে বোবা বানিয়ে রাখলো। কাঞ্চন মনপ্রাণ দিয়ে ভালো অভিনয় করলো বটে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার আশা পূর্ণ হলো না। দর্শক এবং নায়েকরা অবশ্য শতমুখে প্রশংসা করছিলো কাঞ্চনের।

আমরা কেউই যা ভাবতে পারি নি, কাঞ্চন তা দেখালো পরদিনের আসরে। পালা 'মহীয়সী কৈকেয়ী'। নামভূমিকা কাঞ্চনের। ব্রজেন্দ্রকুমার দে রামায়ণের এই কাহিনীর নতুন ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন: কৌশল্যা অবশ্যই জন্মদাত্রী জননী ছিলেন রামের কিন্তু রামকে মানুষ করেছিলেন কৈকেয়ী।

মায়ের কাছ থেকে পুত্র যা প্রত্যাশা করতে পারে তার সবটুকুই রামকে দিয়েছিলেন কৈকেয়ী। সুতরাং শ্রীরাম কৈকেয়ীকেই মা বলে ডাকতেন। পালার আরম্ভ সদ্য পরিণীতা নববধূ সীতাসহ রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে। কৈকেয়ীর হাতে শঙ্খ। তিনি ছোটাছুটি করছেন আনন্দে। কৌশল্যাকে ডেকে আব্দার জানালেন নববধূকে বরণ করবেন তিনি নিজে। কৌশল্যা সানন্দ সম্মতি জানিয়ে বললেন, আমি শুধু গর্ভে ধরেছিলামমাত্র, রামকে তুই মানুষ করেছিস। সুতরাং মা হিসাবে ছেলেবৌকে বরণ করার অধিকার তো তোরই। রাম প্রণাম করলেন কৈকেয়ীকে। সীতাকে বললেন প্রণাম করতে। বললেন, এই আমার মা। সীতা প্রণাম সেরে উঠে কৈকেয়ীকে দেখেই আৎকে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠে স্বগত সংলাপ : এই তো, এই তো সেই মাতা ধরিত্রী—যাকে আমি শৈশব থেকে স্বপ্ন দেখি রোজ…।

অভিনবত্ব এখান থেকে শুরু। কাহিনীর ক্রমোন্মোচনটি এমন সুন্দর যে কার সাধ্য আসর থেকে চোখ ফেরায়! খানিক এগিয়ে পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে বলেছেন, রামের বনবাসের জন্য আসলে মন্থরার পরামর্শ দায়ী নয়। বা এটা মন্থরার ষড়যন্ত্রও নয়। আসলে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে নিয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বামিত্র। দশরথ যেমন প্রতিশ্রুত ছিলেন কৈকেয়ীর কাছে, ঠিক তেমনি কৈকেয়ীর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে বিশ্বামিত্র রামকে চাইলেন কৈকেয়ীর কাছে। দশরথের কাছে প্রতিশ্রুত বর প্রার্থনার পরামর্শও দিয়েছিলেন বিশ্বামিত্রই। তপস্বী ঋষি বললেন, অনার্যদের অত্যাচারের হাত থেকে ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য চাই একজন দেবতা। শ্রীরাম নারায়ণের অংশ। সুতরাং বিশ্বামিত্র রামকে বনবাসে নিয়ে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে আগে লড়াই করতে দেবেন। তারপর বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে। এমনি করে রাম হয়ে উঠবেন দেবতা। সুতরাং জগতের কল্যাণের জন্য কৈকেয়ী রামকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বনবাসে পাঠিয়ে যেন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। বিশ্বামিত্র নিজেই বলে দিলেন দশরথের কাছে কী কী বর চাইবেন কৈকেয়ী।

আপত্তি ছিলো কৈকেয়ীর। তিনি বললেন, তাঁর ইষ্টস্বরূপ বৃদ্ধ স্বামী প্রস্তাব শুনলেই দেহত্যাগ করবেন। বিশ্বামিত্র বললেন, জগতের স্বার্থের কাছে বৃদ্ধ স্বামীর কোনো মূল্য নেই। কৈকেয়ী অস্থির হয়ে উঠলেন, বিশ্বামিত্রের পাদস্পর্শ করে কাঁদতে লাগলেন। অনুরোধ করলেন, যেন এই ভয়াবহ আদেশ বিশ্বামিত্র

ফিরিয়ে নেন। বিশ্বামিত্র ফিরিয়ে নিতে অসম্মতি জানালেন। বললেন : কৈকেয়ী, তোমার মতো শক্তির আধার বিশ্বে কখনও জন্মায় নি, জন্মাবেও না। অনন্তকাল ধরে মানুষ যখনই শ্রীরামের নাম উচ্চারণ করবে, তখনই ভাববে তোমার কথা। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কৈকেয়ী সুতরাং গুরু বিশ্বামিত্রের পরামর্শে, রামের কল্যাণ কামনায় এবং তাকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যাবতীয় কলঙ্কের বোঝা নিজের স্কন্ধে নিয়ে দশরথের কাছে বর চাইলেন। সূর্যকুমার দত্ত কাঞ্চনকে এক মুখে দুই রূপ আনার কৌশলটি শিখিয়েছিলেন। বর চাওয়ার দৃশ্য থেকে দেখলাম কাঞ্চনের মুখাবয়বের ডান অংশ কাঁদছে, বাম অংশে আনন্দের অভিব্যক্তি। এই গুহ্যতত্ত্ব চপলকেও দেন নি সূর্যবাবু। এমন বিরল অভিনয় আমি দৃশ্যবাহিত শিল্পের কোনো অঙ্গেই দেখিনি। পালায় দশরথের প্রথম তিনটি দৃশ্যে অভিনয় করলেন পূর্ণেন্দুবাবু। বাকি দৃশ্যগুলোতে মহেন্দ্র গুপ্ত। রাম সেজেছিলো নবকুমার, লক্ষ্মণ কার্তিক দাস, ভরত মনোজকুমার, কৈকেয়রাজ অচিন মৈত্র, কৈকেয়ীর ভাই নির্মল অধিকারী, বিশ্বামিত্র গোষ্ঠ পাল, কৌশল্যা সুখরঞ্জন, কৈকেয়ী কাঞ্চন, সীতা ক্ষেত্র পাত্র, মন্থরা ফণী ভট্টাচার্য। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর যাত্রা আমি কমই দেখেছি। ওই বাঘা বাঘা শিল্পীদের সঙ্গে কাঞ্চন পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে গেলো। ওর অসাধারণ চরিত্রসৃষ্টির যশ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে, ফুলের সুবাসের মতো। চারদিকে রব উঠলো : সাধু সাধু।



উত্তরবঙ্গ আসাম পরিভ্রমণ শেষ করে নট্ট ফিরে এলো কলকাতায়। ইছাপুর আনন্দমঠের আসরে ব্রজেন্দ্রবাবু আমার পাশে বসে 'মহীয়সী কৈকেয়ী' দেখলেন পালা শেষ হলে দেখলাম নিশ্চুপে বসে আছেন। 'কেমন লাগলো আপনার?' ব্রজেনবাবু রুমালে চোখ মুছলেন, বললেন, 'ওই এক-ফোঁটা ছেলেটা, আশ্চর্য চপলের নামটা একেবারে মুছে ফেললো। একবারও মনে করতে দিলো না,

চপল কোথায় কেমন করেছিলো ! গোড়া থেকেই ও আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো।'

'আর কিছু বললো ?' আমি মাখনের দিকে তাকালাম।
'না।' অল্পক্ষণ চুপ করে থাকলো মাখন। 'পাটনাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি কাঞ্চন যাবে না।'
'আমি একবার যাবো। দেখি আমাকে কী বলে ছেলেটা।'
'আপনি !' মাখন অবাক হয়, ইতস্তত: করে, 'কষ্ট করে শুধু শুধু...'
অশোকনগর স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় এগারোটা। ফাল্গুনের চনচনে রোদে মাঠ ঘাট পুড়ছে। আমরা একটা রিকশা নিলাম। যেতে যেতে হঠাৎ মাখন বললো, 'ওই মণি আসছে।' আঙুল বাড়িয়ে দেখালো ও। দেখলাম মাথায় গামছা-বাঁধা একটা লোক গলদঘর্ম হয়ে প্রাণপণে মাল-বোঝাই একটা রিকসা-ভ্যান চালিয়ে আসছে স্টেশনের দিকেই। লোকটির পরনের কাপড় তার হাঁটুর ওপর তোলা। থামো থামো বলতে বলতে রিকশা থামলো। আমি ওই রোদেই লাফিয়ে নামলাম রিকশা থেকে। দাঁড়ালাম ঠিক রাস্তার মাঝ-বরাবর, যাতে আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে না যেতে পারে রিকশা-ভ্যান। সেকেণ্ড কয়েকের ব্যবধানে রিকশা-ভ্যানের হর্ন পকপক করে বেজে উঠলো। রোদে-পোড়া একটি মুখ তাকালো আমাদের দিকে। তারপর সীট ছেড়ে নেমে এলো চালক। পায়ের ধুলো নিয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'বাবু, আপনি !'
'তোর কাছেই আসতে হলো আমাকে।' মাথা ছুঁয়ে নমস্কার করে আমি বলি, 'তুই তো আমাকে আসতে বাধ্য করলি।'
মাথার গামছা খুলে ও ঘাড় গলার ঘাম মুছছিলো। দেখলাম ওর মাথা একদম ন্যাড়া। মৃদু হাসির ভঙ্গি করে মণি বললো, 'সেটা আমার সৌভাগ্য।' বললাম 'এ কী চেহারা করেছিস রে !' ওর হাসিতে কেমন মলিন রোদ, 'রিকশাঅলার চেহারা কি বাবু এর চাইতে ভালো হতে পারে ?' বললাম, 'মাথা ন্যাড়া করেছিস কেন ?' মণি বললো, 'না-বাবু, মারা যায় নি কেউ। মা আর বাবাকে তো সেই কবেই খেয়েছি।' মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিলো মণি। বললো, 'চুল বড় ছিলো। ঘাম বসে যায় বলে ও ল্যাঠা চুকিয়ে দিয়েছি।' একটু থামলো মণি, 'আমি যে ভ্যান চালাই বাবু। সকাল থেকে রাততক মাল টানি। চুলের দিকে

তাকাবার সময় কোথায় আমার।' ও আবার গামছা বাঁধলো মাথায়। তাকালো, 'আমার বাসায় কিন্তু একবার যেতে হবে বাবু।'

'আমি পাটনার ব্যাপারে এসেছি মণি। ওখানে আমার জানাশোনা অনেক লোক আছেন। তাঁরা তোর অভিনয় দেখতে চায়। বারবার লিখছে, যাতে তুই যাস।' মাখনকে দেখালো মণি, 'আমি তো বাবুকে বলেই দিয়েছি, আমাকে মাপ করতে। চলে আসবার সময়েও তো বাবু আমি বলেই এসেছিলাম, নট্ট যখন ছাড়ছি, যাত্রা আর আমি করবো না।'

'মনে আছে আমার।' বললাম আমি, 'নেহাৎ মুস্কিলে না পড়লে আমিও আসতাম না।'

'না বাবু, না। আপনি সব সময়েই আসবেন। আশীর্বাদ করবেন যেন আমাকে আর যাত্রা করতে না হয়।'

মাথার ওপর দুপুরের চনমনে রোদ। দূর ও-অদূরের বাড়ি ঘর মাঠ মাঠালি পুড়ছে। একটা মালগাড়ি এইমাত্র স্টেশন ছেড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রওনা হলো। রুমালে আমি গাল গলা মুছি। কোথায় যেন ঘুঘু ডাকে। একবুক অভিমান নিয়ে দাঁড়ানো মণি অন্যমনস্ক। মাখন চুপ। রিকশা যাতায়াত করছে। আমরা রাস্তার একপাশে সরে যাই। 'আমাকে তা হ'লে ফিরে যেতে বলছিস মণি?' কথাটা শোনার সঙ্গেসঙ্গে ও দু'হাতে নিজের কান দু'টো ধরলো, জিভ কাটলো, 'আপনাকে আমি ফিরিয়ে দেবো না বাবু। দিলে ভগবানও ক্ষমা করবেন না। আপনিই পথের একমুঠো ধুলোকে সোনার সিংহাসনে তুলে দিয়েছিলেন। সে কথা কখনও ভুলবো না বাবু। তবে মনে আনি না। আনলে বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে: জ্বলে যায়। তার চেয়ে এই ভালো বাবু, এই ভালো...' মণির গলা কেমন বুজে আসে, 'আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে নেবো। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে বাবু।'

'বল।'

'এই শেষবার। আমার মাথা ছুঁয়ে বলুন, আর কখনও যাত্রা গাইবার কথা আমাকে বলবেন না।'

বলবো কি, আমার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এলো, গলায় স্বর ফোটে না। দেখলাম মাখনও চোখ মুছছে। 'তোকে কথা দিলাম আমি, আর কোনোদিন যাত্রা করার কথা তোকে বলবো না।'

'ব্যাস, বাবু গো, এই আমার শাস্তি।' গামছা দিয়ে দু' চোখ রগড়ে রগড়ে রক্তজবা করে তুলেছে চোখ দু'টো। 'কবে দল রওনা হবে বলুন, আমি ঠিক মতন সময়ে হাজির হবো।'

মাখন তারিখ আর বার বলে দিলো। মণি আবার আমাদের প্রণাম করে রিকশার দিকে এগোলো। আমি পিছু ডাকলাম। ও ফিরে এলো। 'একটা কথার জবাব দিবি?' আমি বললাম। 'কিসের ওপর, কার ওপর তোর এতো অভিমান?' ফৎ করে আবার কেঁদে ফেললো ও। ডান হাতে ধাইধাই করে থাবড়া মারলো কপালে, 'এই কপালের বাবু, এই কপালের। খেতে না পাওয়া মানুষকে এক চিলতে রাজভোগ খাইয়ে গোটাটা কেড়ে নেওয়ার মতন। কিন্তু আমি তো চাই নি বাবু, কখনও চাইনি…'

দাঁড়িয়ে আছি পাথরের মতন। দেখলাম ঘাড় গুঁজে, গায়ের সমস্ত জোরকে একত্র করে সাইকেল-ভ্যানটাকে মণি চালু করলো। চালাতে লাগলো স্টেশনের দিকে।

আমরাও তা হ'লে স্টেশনেই ফিরি। ফিরে যাই কলকাতায়। অতএব রিকশায় উঠলাম। স্টেশনে গেলাম। টিকিট কাটা হলো। শুনলাম গাড়ি আসতে ৩৩ মিনিট বাকি। এই অবসরে একটু চা খেয়ে নিলে হয়। প্ল্যাটফরমেই ছিলো চায়ের দোকান। এক কাপ চায়ের কথা বললাম দোকানীকে। ততক্ষণ সিগ্রেট ধরিয়েছি। চায়ের ভাড়টা নিয়ে মুখে তুলবো, দেখি মণি এসে দাঁড়ালো সামনে। 'কী ব্যাপার!' অবাক হয়ে আমি শুধোই। ও মাথা চুলকোয়। 'একটা কথা বলা হয়নি বাবু। যাত্রা আমি করে দেবো। কিন্তু কিছু নিতে পারবো না বাবু, ও পয়সা আমার পেটে সইবে না।' বলেই গেট পেরিয়ে হন হন করে চলে গেলো মণি। মিশে গেলো জনস্রোতের মধ্যে। অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার বুক খালি করে। মনে হলো নিদাঘের তীব্র তাপের চাইতেও তপ্ত একটা হাওয়ার ঝলক নিমেষে মিলিয়ে গেলো।

আট.

অপত্য স্নেহ থেকে প্রেম !

চিৎপুরী গুজবকে বিশ্বাস নেই, আবার অবিশ্বাস করেও পার পাবার উপায় .নই। এখানকার হাজারো মুখের বানানো মিথ্যেটা আশ্চর্যভাবে অনেক সময়েই সত্যি হয়ে যায়। এই গুজব, শুনি, দিনকে অনায়াসে রাত করতে পারে, এবং হনুমান গন্ধমাদন আনতে গিয়ে যেমন করে সূর্যকে বগলে চেপে অস্ত যেতে দেয়নি ঠিক তেমনি এই গুজব সময়কে খুঁটিতে বেঁধে বলদ বানাতে পারে। তা নইলে এ কেমন ব্যাপার ! পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তি, যিনি কন্যাবৎ পালন করছেন একটি মেয়েকে সেই পনেরো বছরের এক ফোঁটা মেয়ের সঙ্গে তাঁর প্রেম জমাট বাঁধতে পারে ! বিজয় তথা দুর্জয়দা বলেন : হয় হয় জানতি পারো না।

চিৎপুরের গদীতে গদীতে, আনাচে কানাচে কানাঘুষো। আমি আনুপূর্বিক ভাবি। বিজয়দা বলেন, 'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যেতে না দেওয়ার এই ফল। অভিশাপ, অভিশাপ ! মুনি ঋষিদের বাণী অমান্য করার ফল। এখন তাই জঙ্গল নেমে এসেছে সংসারে। নইলে শালা ·····'

অস্পষ্ট থাকে না আমার কাছে। এতো সেই দিললিতে দেখা অংকুরের মহীরুহ হওয়ার পর্ব। সেই কাহিনীর পরবর্তী অধ্যায়। ইন্দু নামের সেই পঞ্চদশী কিশোরীর পরিণত প্রেম-কাহিনী। নয়াদিললি কালিবাড়িতে যে-মেয়েটি একবুক মার্কেটিং নিয়ে ফিরছিলো, এ তারই অন্য উত্তরণের সংবাদ। তখনই একটা খটকা ঢুকলো আমার মনে। ইন্দু আমাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ কেন চমকে উঠলো এবং কেনই বা ত্রস্ত্যে সদরের সোজা পথ দিয়ে ভেতরে না ঢুকে, সরু পথ ধরে এক ঝলক হাওয়ার মতন ভেতরে চলে গেলো !

কৌতুহল বস্তুটাই বড় খারাপ। তা নইলে নিশ্চিন্তে বসা একটা মানুষকে কেন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে ভেতরে ! কৌতুহল আমাকে ইন্দুর পেছনে পেছনে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো। এগোতে এগোতে এ-বিষয়ে আঁচ দেওয়া

মানুষটির মুখ স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। 'যাহা কিছু রটেক বাবু, তাহা কিছু বটেক। কেমন যেন একটা গড়বড় গন্ধ পাই দাদা।' কে! হরিপদ? রাজেন মণ্ডল? সুখেন্দুবাবু? একবার ভাবলাম আর না এগিয়ে, হরিপদকে একটু ঝালিয়ে নিতে পারলেই কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে আসবে। আবার ভাবলাম, হায়রে মন, দুর্গন্ধে কেন এত আসক্তি!

যন্ত্রচালিতের মতন তবু এই দেহটাকে কোন অদৃশ্য শক্তি যেন ভেতরে টেনে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হয় বিবেক: ছিঃ! দোতলার সিঁড়ির কাছে থমকে দাঁড়াই আমি। নিজেকে শক্ত এবং সংযমী করা দরকার। হায় রে কৌতূহলী আঁখি, স্থির হও, শান্ত হও, ধৈর্য ধরো। তখন ব্রজেনবাবুর একটি বিশেষ সংলাপ মনে পড়লো আমার, যা প্রায় সব পালাতেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন। এখানে হুবহু সেই সংলাপটি নাই বা বললাম। ভাবটা এই, মেঘাচ্ছন্ন আকাশটাই দেখেছো কিন্তু শরৎকালে যে এই আকাশের অসীম নীলের জগতে সৌন্দর্যের সুষমা নিয়ে চাঁদ ওঠে, তোমার পোড়া-চোখ কি তা প্রত্যক্ষ করেছে কখনও?

মন শক্ত করে ফিরেই আসছিলাম, কিন্তু আসি বললেই কি আসা হয়? আমার যা দেখবার কথা, তা না দেখে ঈশ্বরের হাত থেকে রেহাই পাবো কেমন করে। দেখলাম আট নম্বর ঘরে ঢুকে বুকে চেপে-ধরা ভারী মার্কেটিং-এর গাঁটরি তক্তপোষে রাখলো ইন্দু। তারপর এক এক করে প্যাকেট থেকে বের করতে লাগলো দামী দামী শাড়ি, ব্লাউস, বেলবটস প্রভৃতি। ঘরে আর কেউ নেই। খুশীতে মেয়েটার চোখ জ্বলছিলো। গলায় গানের গুণগুনানি। হঠাৎ দেখলাম ভয় পেয়ে দু' হাত পিছিয়ে এলো ও, যেন ভূত দেখেছে। ওদিকে, রাস্তার দিকের জানলার গরাদ ছুঁয়ে কী যেন নড়ছে। আতঙ্কে পিছিয়ে আসা মেয়েটি দেখলাম, মুখের ওপর তোলা ডান হাতটা নামিয়ে ফিক করে হেসে উঠলো। এগিয়ে গেলো জানলার কাছে। নড়া বস্তুটা থপ করে কেড়ে নিলো। দেখলাম একটা হাত জানলার গরাদের ওপর। ইন্দু নিচু হয়ে মুখটা এগিয়ে দিলো। মনে হলো ওই আগন্তুক হাতের পাঁচটা আঙুল ইন্দুর বিম্বোষ্ঠের পাপড়ি এবং গোলাপের মতো গাল ছিঁড়ে নিতে চাইছে।

ইন্দু কি চুম্বন করলো ওই হাতে? শক্ত শক্ত সমস্ত আঙুলগুলোকে রক্তিম অধর-ওষ্ঠের স্পর্শ দিয়ে ধন্য করলো! তখনই চলে আসা উচিত ছিলো আমার। এলে

অধিকতর বিস্ময়কর কিছু চোখে পড়তো না। এবং আসামীকে পাকড়াবার জন্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে আসতে হতো না উত্তেজনা নিয়ে। কেড়ে নেওয়া কাগজের ছোট প্যাকেটটা চরচর করে ছিঁড়ে ফেলেলো বিন্দু। টেনে বের করলো খান তিনেক ব্রা। এবং নিমেষে বুকে চেপে ও নেচে উঠলো।

চমকে উঠলাম। তখনও যদি মনে হতো এই বস্তুটি নিজে লজ্জায় ও কিনতে না পেরে কোনো বান্ধবীকে কিনতে দিয়েছে, তা হ'লেও নিস্তার -পেতাম। ভাবার আগেই আমি সদরে এসে পৌছে গেছি। দেখি প্রৌঢ় ভদ্রলোক হনহন করে ফটক দিয়ে ঢুকছে। রাস্তায় এসে দেখি, হাজার গজের মধ্যে কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। রাস্তাটা ফাঁকা, ধূ-ধূ।

আমি দাঁড়াতে পারতাম ভদ্রলোকের পথ আগলে। তা হ'লে ওঁর মুখের আয়নায় নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করা যেতো অপরাধীর অপ্রস্তুত মুখের ছবি। আসলে দরকার ছিলো কি ? আসামী যে ততক্ষণে আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। হরিপদ বলতে চেয়েছিলো, দেয়ার ইজ সামথিং। কিন্তু যে-ইংরেজি বললো হরিপদ, এখানে তা বললে রসের ভিয়েনে একমুঠো সোডা পড়ে যাবে।

পঞ্চু সেন মশাই তখন যাত্রার আকাশে সূর্যের মতনই দীপ্যমান। কিষাণ দাশগুপ্তর বড়ো বাসনা ছিলো, তাঁর দল অর্থাৎ নাট্যভারতীতে পঞ্চু সেন যদি আসেন। আমাকে কয়েকবার বলেছেন। আমি হরিপদ বায়েনকে দেখিয়ে দিয়েছি। কারণ পঞ্চু সেন এবং হরিপদ বায়েন বহুকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু কী কারণে কে জানে, হরিপদ একদম রাজি হলোনা। বললো, 'ওটা আপনিই করে দিন।'

সে-বছর জ্যোৎস্না দত্তও জয়েন করেছিলো নাট্যভারতীতে। পালা 'বিনয় বাদল দীনেশ', 'বাঁচার লড়াই'। সুতরাং বাগবাজারের বাসা থেকে পঞ্চুবাবুকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে সোজা ক্রীক রো-তে আনার কথা বলে দিয়েছিলাম কিষাণবাবুকে। ওখানেই থাকতেন কিষাণবাবু। বললাম, বেলা ১০টার পর আনবেন। আমি ওই সময়ের মধ্যে পৌছে যাবো। কথামতন কাজ। পঞ্চু-বাবু খুব একটা বিস্মিত হননি আমাকে দেখে। কারণ জানতেন, নাট্যভারতী বেচে দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন কিষাণবাবু। দারুণ অর্থাভাব, পাওনাদার অসংখ্য। শেষ পর্যন্ত আমি দলটিকে বিক্রয় করতে বাধা দিই। হাজার হাজার টাকা জোগাড় করে দিয়েছিলাম চন্দ্রাবলী সিংয়ের কাছ থেকে। এবং

অজিত ব্যানার্জির কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা। টাকা নেওয়া হয়েছিলো হুণ্ডিতে। আমি ছিলাম গ্যারান্টি। কেন করেছিলাম, কোন কারণে, সে-প্রসঙ্গ পরে আসবে। তবে এটা রটে গিয়েছিলো, নাট্যভারতী দলটিকে তরতাজা করার দায়িত্ব অলিখিতভাবে আমি নিয়েছি। মিনিট পঁচিশেক নানা কথা এবং চা খেতে কাটলো। পরে প্রস্তাবটা দিলাম। অবস্থা বললাম কিষাণবাবুর দলের। পঞ্চু সেন মশাই বললেন, 'অতো কথার দরকার কী। আপনি কি চান আমি নাট্যভারতীতে থাকি?' বললাম, 'চাই এবং ষড়যন্ত্রকারীদের দেখতে চাই।' পঞ্চুবাবু বললেন, 'ব্যাস। আমি থাকছি। একটা রূপোর টাকা অ্যাডভান্স হিসাবে আজ আমি আপনার কাছে থেকে নেবো।'

কিষাণবাবু লাফিয়ে উঠলেন আনন্দে। এতটা তিনি আশা করেন নি। এ-প্রসঙ্গে বলে রাখি, ওইদিন জ্যোৎস্নাকেও অগ্রিম দেওয়া হলো একটা রূপোর টাকা। এবং সেটাও দিলাম আমি নিজে।

সেই থেকে পঞ্চু সেন মশাইয়ের সঙ্গে এমন একটা সম্পর্ক হলো আমার, তিনি কোন দলে কাজ করবেন তার পরামর্শ দিতে হতো আমাকে। কিংবা আমি যদি কোনো দলে কাজ ঠিক করতাম পঞ্চুবাবু সানন্দে তাতে সম্মতি জানাতেন এবং কাজ করতেন। এই সম্পর্ক আরও গাঢ় হলো একটা ভয়াবহ বিরোধকে কেন্দ্র করে। অজিত ব্যানার্জি মশাইয়ের বড় ইচ্ছে কলকাতায় 'সোনাই দীঘি' পালার কম্বিনেশন নাইট করান পঞ্চু সেন আর স্বপনকুমারকে নিয়ে। কারণ তখন পর্যন্ত এই পালার যতো কম্বিনেশন নাইট হয়েছে, সেখানে পঞ্চু সেন আর স্বপনকুমারকে একসঙ্গে কোনোদিন অভিনয় করতে দেখা যায় নি। শুধু 'সোনাই দীঘি' কেন, যাত্রা-জগতের এই দুই সূর্য হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন, তাঁরা কদাচ এক পালায় অভিনয় করবেন না। তবে লক্ষ্য করেছি, গুরুশিষ্যের কেউই পরস্পরের নামে নিন্দাবাদ করতেন না। পঞ্চুবাবু বলতেন, 'স্বপন আমার গর্ব, সে আমার শিল্পীজীবনের একমাত্র যোগ্য পুত্র।' স্বপনকুমার বলেছেন, পঞ্চু সেন তাঁর গুরু, যাত্রাশিল্পে এই ব্যক্তিই একমাত্র স্বপনকুমারের পিতৃতুল্য। অথচ আশ্চর্য একসঙ্গে অভিনয় না করার দৃঢ়পণে দু'জনেই অটল। শুনি কিন্তু আসল রহস্যটার তল খুঁজে পাই না।

অজিতবাবু আমাকে জোর-ধরা ধরলেন। তরুণ অপেরার শিব ভট্টাচার্য অর্থাৎ যাত্রা-জগতের হাস্যার্ণব শিববাবুও ইন্ধন জোগালেন। তাঁর সঙ্গে অজিতবাবু

ফয়সালা করে নিয়েছিলেন যে, যাত্রা শিল্পী সংঘের ব্যানারে তিনি এই বিরল কম্বিনেশন করাবেন। এবং এর জন্যে শিববাবুকে দেওয়া হবে নগদ কিছু টাকা। নাট্যভারতীর গদীতে হরিপদ বায়েনের সামনে কথাবার্তা হচ্ছিলো। ওঁরা তিনজন মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, এই দুঃসাধ্য কর্মটি নাকি একমাত্র আমার দ্বারাই করা সম্ভব হতে পারে। আর আশ্চর্য, জেদের বশে আমি রাজিও হ'য়ে গেলাম। অজিতবাবু তাঁর আগে মহাজাতি সদনে 'বাঙলার মেয়ে'র নিয়মিত অভিনয় চালু করে খুব বড়ো রকমের আর্থিক ক্ষতিতে পড়েছিলেন।

অজিতবাবুকে কিছু পয়সা পাইয়ে দেবার নৈতিক দায়িত্বকে আমি অস্বীকার করতে পারিনি। কারণ বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির মাঠে যখন বেশ বড়ো রকমের একটা যাত্রা উৎসব করেছিলাম আমি, সেই দুর্দিনে অজিতবাবু আমার পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন। আমার ব্যক্তিগত ক্ষতির পরিমাণ অনেক। কিন্তু অজিতবাবু অল্পের জন্য হাজার তিনেক টাকা পুরণ করতে পারলেন না। সুতরাং বিবেকের দিক থেকে আমি দায়বদ্ধ ছিলাম ওঁর কাছে। ওই যাত্রা উৎসব কমিটিতে আমার মামাতো দাদা হেরম্বকুমার নন্দী ছিলেন, ছিলেন কিরণ মৈত্র, হিরন মৈত্র, শৈলেন মোহান্ত। বিমল রায়কে করা হয়েছিলো সাধারণ সম্পাদক। জগন্নাথ ভট্টাচার্যও উৎসবে ছিলো আমার ডানহাত। তার হাতেই আদায় বিদেয়। উৎসব শেষে ক্ষতির বোঝাটা বরাবরের মতো চাপলো আমারই ওপর। সুতরাং অজিতবাবুর লস্‌টা নীতিগত-ভাবে আমার ঋণ বলে আমি ধরে নিয়েছিলাম। এই সুযোগে যদি ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারি, এ-কারণেও দুরূহ কাজটা সম্পাদনের দায়িত্ব আমি খুশী মনেই গ্রহণ করলাম।

অজিতবাবু একবুক ভরসা নিয়ে সাহসে বুক বেঁধে চলে গেলেন কিন্তু আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে। কী করে সাধন করবো অসাধ্য কর্ম? কোন পথে, কী উপায়ে! তারপর একদিন নাট্যভারতীর গদীতে পঞ্চুবাবুকে পেয়ে প্রস্তাবটা রাখলাম। স্বপনকুমারকে নেওয়া হচ্ছে এমন কথা বলিনি। বললাম, স্বপন যদি থাকেন ব্যাপারটা দারুণ হয় না? শুনেই পঞ্চু সেন আগুন। বললেন, 'অসম্ভব। স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু কি মহেশ্বর অথবা তিনজন একত্র হ'লেও স্বপনের সঙ্গে আমাকে অভিনয় করাতে পারবে না।' পঞ্চুবাবু তাকালেন আমার দিকে। তাঁর চোখ দু'টো নিমেষে রক্তজবা হয়ে উঠেছে। 'আপনি জানেন না, স্বপন

আমার কোথায় আঘাত হেনেছে। আমি মরমে মরে আছি।'

'তাই নাকি···।'

আমি কিছুই জানি না এমন ভান করি। পঞ্চুবাবু জানেন না, তাঁর যে নরম ক্ষেত্রে স্বপন বাজ হেনেছেন সে-জায়গা আমার অজানা নেই। আর একটা কথা, পঞ্চুবাবু বললেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও তাঁকে স্বপনকুমারের সঙ্গে কাজ করাতে পারবে না। তিনি কিন্তু বলেন নি মানুষের কথা। অর্থাৎ দেবতারা না পারতে পারেন কিন্তু মানুষ যদি পারে তবে বাধা নেই। মনে মনে আমিই সেই মানুষের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে গেলাম। 'তা হ'লে দরকার নেই স্বপনের। আপনি থাকলেই যথেষ্ট।'

পঞ্চু সেন মশাই বললেন, 'আমাকে আপনি যা সাজাবেন তাই সাজবো।'

পরদিন আমি যাই নি, অজিতবাবুকে পাঠালাম পঞ্চুদার বাসায়। শ-দেড়েক টাকা অগ্রিম দিয়ে চুক্তিপত্রে সই করিয়ে আনলেন অজিতবাবু। তাঁর মুখে কোথায় হাসি দেখবো, না, তার বদলে বিষম বিষন্নতা। অজিতবাবু বললেন, পঞ্চুবাবু নাকি জব্বর শাসাণ শাসিয়েছেন, স্বপনকুমারকে নেওয়ার চিন্তা নিমেষের জন্যও যেন না করা হয়। করলে শেষ পর্যন্ত তিনি ভরাডুবি করে ছাড়বেন। আমি যতো অভয় দিই, তত ভেঙে পড়েন অজিতবাবু। অবশেষে তাঁকে পাঠালাম স্বপনকুমারের বাসায়। বলে দিলাম, শ-দেড়েক টাকা অগ্রিম দিয়ে সই করিয়ে নিতে। ঘুণাক্ষরেও যেন প্রকাশ না পায় পঞ্চুদার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। অজিতবাবু যথারীতি কাজ সমাপ্ত করে এসে আরও ভেঙে পড়লেন। বললেন, আলোচনা প্রসঙ্গে নাকি তিনি পঞ্চু সেনের নামটা করেছিলেন পাবলিক ডিম্যাণ্ডের সূত্র ধরে। ব্যাস, স্বপনকুমার একেবারে তেতে লাল। টাকাটা অজিতবাবুর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয় নাকি বলেছেন, নামটা মুখে আনার অপরাধে তিনি এই কম্বিনেশনে অভিনয় করতে অসম্মত। অজিতবাবু বললেন, 'অনেক বলে কয়ে, ভুল স্বীকার করে তবে সই করাতে পেরেছি। আসার সময় আবার তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, পঞ্চুবাবু শো দেখতে এলেও কিন্তু তিনি সহ্য করবেন না। একবার দেখতে পেলে তিনি পোশাক, মেক-আপ খুলে চলে যেতে বাধ্য হবেন।' অজিতবাবু হাঁপাচ্ছিলেন, বললেন, 'কী করে যে কি হবে আমি বুঝতেই পারছি না। শেষকালে পাবলিকের ধোলাই খাবো নাতো?'

আমি শুধোই, 'ঈশ্বরের খাদ্য কী, জানেন?'

অজিতবাবু মলিন হেসে বললেন, 'আমি কি স্বর্গবাসী যে জানবো?'

'অহমিকা'—আমি বললাম, 'ত্ব'জনের অহমিকাই এবার ঈশ্বর খাবেন। অজিতবাবুকে আমি কেন যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে চলে যেতে বললাম। কে যেন আমাকে দিয়ে বলালো। বললাম, 'পোস্টার ছেপে বাজার ছেয়ে ফেলুন। তাতে অন্যান্য নামের টপে থাকবে পঞ্চু সেন ও স্বপনকুমার।'

দিন চারেক বাদে পঞ্চুবাবু আগুন হয়ে ছুটে এলেন, 'এটা কী হলো প্রবোধবাবু! আপনাকে বারবার করে আমি বললাম যে…'

'কেন, কী হয়েছে!' আমি অবাক হই।

'সারা কলকাতা পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ হয়ে গেছে। পোস্টারে স্বপনের নাম এলো কোত্থেকে!'

'স্বপনকুমারের নাম?'

'হ্যাঁ।' পঞ্চুবাবু বললেন, 'এ-রকম তো কথা ছিলো না আপনার সঙ্গে।'

আমি সান্ত্বনা দিই পঞ্চুদাকে। 'মনে হয়, গোড়ায় ব্যাপারটা না:বুঝেই কিছু পোস্টার অজিতবাবু ছাপিয়ে রেখেছিলেন। ভুল করে বোধ হয় সেগুলিই মারা হয়ে থাকবে। যাই হোক আমি অজিতবাবুকে বলে দেবো।'

ব্যাস মহাদেব খুশী। বললেন, 'কিছু মনে করবেন না আপনি। আমি অতটা তলিয়ে না দেখেই উত্তেজিত হয়েছিলাম।'

'হওয়াই স্বাভাবিক', আমি বললাম। 'উত্তেজনা কি আগুপিছু বিবেচনা করে আসে নাকি।' পঞ্চুবাবু বললেন, 'ঠিক তাই। আসলে কি জানেন? শিবে আমাকে দিয়ে এই কাজটা করালে। আজ দুপুরে আমার বাসায় গিয়ে বললো কি জানেন? বললো, আপনি নাকি স্বপনকে আর আমাকে একসঙ্গে নামাবার ফন্দি করেছেন, তাই…। অবশ্য জানি চিৎপুরের অযাচিত পরামর্শের পেছনে কী কী আছে…'

এখানে কেবল হাসি আমি। কথা বলতে যাওয়া বিপদ।

একটা ফাঁড়া তো এভাবে কাটালাম। আরেক মস্ত ফাঁড়া এসে উপস্থিত বিকেলেই। হঠাৎ শম্ভুদার ফোন, 'দাদা?' বললাম 'হ্যাঁ, শম্ভুদা নাকি?' শম্ভু ঘোষ বললেন, 'একটু ধরুন, স্বপনবাবু কথা বলবেন।'

স্বপনকুমার কী বলবেন, বলতে পারেন—তাতো জানাই। সুতরাং বিস্মিত হই না। বরং তৈরি হই। ওপাশ থেকে স্বপনকুমারের গলা ভেসে আসে, 'প্রবোধদা?'

'হ্যাঁ।'

'প্রবোধদা, অজিতবাবুর কাণ্ড দেখেছেন?'

'কেন কী হয়েছে!'

'ভদ্রলোক আপনার নাম করে এসেছিলেন সোনাই দীঘি কম্বিনেশনের জন্য। তখন বললো টপে থাকছি আমি। কিন্তু পোস্টারে দেখলাম পঞ্চুবাবুর নাম।'

'সেকি! আপনার নাম নেই!'

'আছে আছে। পঞ্চুবাবুর তলায়। কিন্তু এ-রকম তো কথা ছিলো না। আপনি অজিতবাবুকে বলে দেবেন, টাকাটা যেন ফেরৎ নিয়ে যায়। আমি অভিনয় করবো না।'

'নিশ্চয় বলে দেবো।' বললাম আমি। 'এটা যদি হয়ে থাকে খুব দুঃখের ব্যাপার।'

'হয়ে থাকে মানে, হয়েছে প্রবোধদা।'

'আসলে একটা গোলমাল হয়ে গেছে মনে হয়।' আমি বোঝাতে চাই স্বপনকুমারকে। 'অজিতবাবু রাম না জন্মাতেই রামায়ণ রচনা করে বসেছিলেন। জানেন, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ একদিন একটা পোস্টার আমাকে দেখালেন। সোনাই দীঘির। তাতে পঞ্চুবাবু ও আপনার নাম আছে। তখনও আপনার সঙ্গে কথা হয় নি। বোধ হয় পাবলিসিটি স্টাণ্ট দেবার জন্যই পুরনো পোস্টারগুলো মেরেছে।'

'তাই নাকি?' স্বপনকুমারের কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য অনেক কমে এসেছে। 'মানে আপনি বলছেন, তারপরে আসল পোস্টার ছাড়া হবে?' আমি ছোট করে বললাম, 'হুঁ।' স্বপনকুমার বললেন, 'তবে তো ল্যাঠা চুকেই গেলো। আপনি অজিতবাবুকে বলে দেবেন, পঞ্চুবাবুকে নেবার প্ল্যান করলে আমি নেই।' আস্তে করে আমি ধমক দিই, 'আবার পঞ্চুবাবু! আরে মশাই…'। স্বপনকুমার বললেন, 'না-না-না, ঠিক তা নয়, মানে আমি বলতে চাই…'

তারপর দিন-কয়েক একেবারে চুপচাপ। ঋতু পরিবর্তন, আচমকা বর্ষায় ভেজা, তপ্ত রোদ থেকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঢোকা—এসব মিলিয়ে আমাকে অসুস্থ করে ফেললো। গায়ে জ্বর একশো তিন ডিগ্রি। সেই সময়েই অজিতবাবু এলেন। আমি দু' রকমের পোস্টার বাজারে ছাড়তে বললাম। একটা পোস্টারের টপে থাকবে পঞ্চু সেনের নাম। অন্য পোস্টারের টপে থাকবে

স্বপনকুমারের নাম। কিন্তু কাগজের বিজ্ঞাপনে থাকবে কেবল স্বপনকুমারের নাম। আমার কথাগুলো অবাক হয়ে শুনলেন অজিতবাবু। বললেন, 'অগাধ জলে নামতে বলছেন। আমি নামছি। দেখবেন যেন ডুবে না মরি।'

দিন দুই পরে আবার দু'পক্ষের আক্রমণ। স্বপনকুমার বললেন, 'সব ঠিক আছে কিন্তু একটা পোস্টারে দেখলাম পঙ্কুবাবুর নাম। আমার নাম···আমার নাম একেবারেই নেই।' পঙ্কুবাবু বললেন, 'কী যে ব্যাপার, কী যে রহস্য, আমি তো ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছি না।' অজিতবাবু যথারীতি পঙ্কু সেন এবং স্বপনকুমার দু'জনের বাসাতেই গেলেন। বললেন, 'শত্রুপক্ষ পেছনে লেগেছে। আমি এখন কী করি বলুন তো?' তার মানে পরস্পরবিরোধী পোস্টার এবং বিজ্ঞাপনগুলো শত্রুপক্ষের করা? ওঁরা দু'জনেই নাকি অভয় দিয়েছেন অজিতবাবুকে।

এমনি করে দিন কাটাতে কাটাতে অভিনয়ের দিন এগিয়ে এলো। কাউণ্টারে পড়লো লাইন। দেখতে দেখতে একটা শো হাউস-ফুল। অজিতবাবু ছুটে এলেন, তাঁর ডবল শো করার বড়ো ইচ্ছা। আমি ওঁকে আগে পঙ্কু সেনের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করতে বললাম। পরে স্বপনকুমার। দু'জনেই ডবল শো-র জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন বটে, কিন্তু বলে দিয়েছেন, কথার যেন নড়চড় না হয়। দর্শকরা পোস্টারে আর বিজ্ঞাপনে পঙ্কু সেন ও স্বপনকুমার একসঙ্গে আছেন জেনে মুড়ি মুড়কির মতন টিকিট কাটছিলো। অভিনয়ের বাকি মাত্র তিনদিন। শো ডেট রবিবার। শুক্রবার সকালে আমি আর অজিতবাবু একটা ট্যাকসি নিয়ে পঙ্কুদার বাগবাজারের বাসায় গিয়ে উপস্থিত। আমাকে দেখেই পঙ্কুবাবু মুখ গোমড়া করে বসলেন, যেন অভিমানী কিশোর। প্রথমে কথাই বলছিলেন না। অবশেষে তাঁকে বোঝানো গেলো যে, অজিতবাবুর বিরুদ্ধে যিনি বেআইনী পোস্টার ও বিজ্ঞাপন করেছেন, সেই ভদ্রলোক ধরা পড়েছেন। তার সঙ্গে আজ এক্ষুণি একটা ফয়শালা হবে। সুতরাং পঙ্কু সেনকে অতি অবশ্যই সঙ্গে চাই। ব্যাপারটা শুনে সামান্য হালকা হলো পঙ্কুদার মন। বললেন, 'ওখানে আমার যাওয়ার কী প্রয়োজন!' আমি বললাম, 'আপনার পারমিশন ছাড়া একটা ভুয়ো ব্যাপারের সঙ্গে আপনাকে কেন জড়িত করেছে তার কৈফিয়ত চাইতে হবে না?'

দোমনা দোমনা করতে করতে রাজি হ'য়ে গেলেন পঙ্কু সেন। ট্যাক্সিতে উঠলাম আমরা। আমি সামনে, পেছনে পঙ্কুদা আর অজিতবাবু। ট্যাক্সিটা বাগবাজার খালপাড় ধরে বি. টি রোডে ঢুকবার ব্রিজ পার হয়ে টালা ব্রিজের ওপরে উঠলো।

ব্রিজ শেষ হতে ডানদিকে, টালা-পার্কের দিকে ট্যাক্সিটা মোড় নিতেই উঠে দাঁড়াতে চাইলেন পঙ্কুদা। কিন্তু ট্যাক্সির মধ্যে দাঁড়াবেন কী করে? উত্তেজনার গলায় বললেন, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে! এ-রাস্তায় তো স্বপন থাকে।' আমি ওঁকে ঘাবড়াতে বা উত্তেজিত হতে বারণ করি। বলি, 'এ-পথেই একটু এগিয়ে।' আমার নির্দেশ মতো ট্যাক্সিঅলা ঠিক স্বপনকুমারের বাসা ছাড়িয়ে গজ ছয়েক দূরে গাড়ি থামায়। দরজা খুলে আমি নামি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি বলে আমি সরাসরি স্বপনকুমারের ফ্ল্যাটে হাজির হোলাম। দরজা খুলে দিলেন স্বপনবাবুর মা। শুধোলাম, 'তিনি কোথায়?' মা বললেন ভেতরে। গিয়ে দেখি সবে দাড়ি কামিয়ে লোশন লাগাচ্ছেন স্বপনকুমার। আমাকে দেখে একেবারে অবাক, 'আসুন, আসুন...।' আমি বললাম, 'পঙ্কুদা এসেছেন। ট্যাক্সিতে বসে আছেন।' মাতাপুত্র একসঙ্গে 'এঁ্যা' করে উঠলেন। বললাম, 'যেচে যখন এসেছেন মহামান্য অতিথি, তখন তাঁকে বরণ করে আনা উচিত।'
হাওয়া বদলে গেলো মুহূর্তের মধ্যে। মা-ছেলে দু'জনেই প্রায় ছুটে গেলেন ট্যাক্সির কাছে। আমি অদূরে, আড়ালে। দেখি পঙ্কুদা গাড়ি থেকে নামতে বাধ্য হয়েছেন। রাস্তার ওপরেই গুরু-শিষ্য গলা জড়াজড়ি করে কাঁদতে শুরু করেছেন।
বর্ষার বিষণ্ণ মেঘ কেটে আলো ফুটতে খুব একটা দেরি হলো না। বাড়িজুড়ে হৈ হৈ কাণ্ড। নানারকম খাবার দাবার এলো। অনেকদিন মুখ-না-দেখা গুরু শিষ্য ততক্ষণে পারিবারিক আলোচনায় রত। চিনেমাটির বড় ডিস ভরতি নানারকম মিষ্টি এলো। পঙ্কুদা একটা রাজভোগ তুলে আগে স্বপনকুমারের দিকে তাকালেন। তারপর আচমকা রাজভোগটা গুঁজে দিলেন আমার মুখে, 'নাটের গুরুর পুরস্কার।' আমি মজা করে আয়ু শেষ করলাম রাজভোগটার। পঙ্কুদার চোখ ছলছল করছিলো। ধরা গলায় বললেন, 'অগস্ত্য যদি রাজনীতি বুঝতেন তবে বিন্ধ্যের মাথাটা না নামিয়েও তার বৃদ্ধি রোধ করতে পারতেন। আপনি এ-কালের অগস্ত্য।'
দেখলাম স্বপনবাবুর চোখের কোলে মুক্তার মতো টলটলে জলবিন্দু। মা চোখ মুছছেন। অজিতবাবুর চোখ গড়িয়ে আনন্দের অশ্রুধারা নামছে।
এই পঙ্কুদাই একদিন আমাকে শুধোলেন। মুখের চাপা হাসি চোখ ঠিকরে পড়তে চাইছে। তারই মধ্যে আশ্চর্য এক ইঙ্গিত। এমন এক্সপ্রেশন পঙ্কু সেনের মতন

অভিনেতার পক্ষেই জানা সম্ভব। বললেন, 'সিন্ধুর ঢেউয়ের খবর কিছু জানা আছে নাকি ?'

প্রথমটা আমি ধরতে পারি নি, পঞ্চুদা কী বলতে চাইছেন। কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম, পঞ্চু সেন মশাই কথা শেষ করে হরিপদকে একটা গোপন চিমটি কাটলো। হরিপদ হেসে উঠলো। বললো, 'বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ।' এবার ইঙ্গিতটা বুঝতে আর বিলম্ব হবার কারণ নেই।



পঞ্চু সেন মশাইয়ের মুখাবয়ব বেশ গোলাকার। তার মধ্যে দীর্ঘায়ত দু'টি উজ্জ্বল চোখের জ্যোতি। মোটা ভুরু, পাতলা চুল। রঙ টকটকে ফর্সা। লম্বায় কিছু খাটো, দেখতে নাদুসনুদুস চেহারা। হরিপদ বায়েনের পরমপ্রিয় বান্ধব। যাত্রা শিল্পের আকাশে এ দু'জনই তখন টপ-স্টার। বড় ফণিবাবু এর কিছুদিন আগে দেহ রেখেছেন, ছোট ফণিবাবুর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটেছে তারপর। প্রভাত বোস, নটকেশরী ভোলা পাল অবসর নিয়েছেন যাত্রা থেকে। সুতরাং এই শিল্পের মাথার ওপরে জ্বলছে তিন সূর্য। এক. আচার্য পূর্ণেন্দুশেখর ব্যানার্জি, দুই. অমিয় বোস, তিন. পঞ্চু সেন। এই তিনের মধ্যে তখন পঞ্চুদাই যশের মধ্য গগণে। এ-দিকে দল পরিচালক হিসাবে হরিপদ বায়েনের ধারকাছ ঘেষবার মতনও কেউ নেই। সে একাই সন্ধ্যার আকাশে জ্বলন্ত শুকতারা। দু'জনের তুই তোকারি সম্পর্ক। তুই ইয়ারই ইঙ্গিতের হাসি হেসে যাচ্ছে। বললাম, 'না, আমি ঠিক···'

পঞ্চুদা বললেন, 'দেখতে দেখতে মাটির ঘর অট্টালিকা হয়ে উঠলো, আপনি জানেন না ?'

জানি কী! দল মালিক বারবার আমাকে বলছেন, তাঁর দলে নাকি মোটা লস্। অথচ গানে যশ প্রচুর, আদায় বিদেয় আশাপ্রদ নয়। ওই দলের তরুণ দল-পরিচালক যে রিপোর্ট আমাকে দিয়েছে, তাতে কোথাও ক্ষতির সম্ভাবনা আমি

দেখিনি তবে ছেলেটি আভাষে ইঙ্গিতে আমাকে একটা ধরতাই বোধ হয় দিতে চেয়েছিলো। বলেছিলো, ওর মালিকের হাতটা নাকি বেশি খরচের। দল ও গদী থেকে রেগুলার টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। কোথায় যাচ্ছে তা কে জানে! ওদিকে বিন্দুর আব্দারে তো দল রাখাই কঠিন।

বিন্দুর কথা আগে বলেছি। চেহারার বর্ণনাও দিয়েছি বোধ হয়। বয়স কম। ছোটখাটো ছিমছাম দেখতে মেয়েটি। গায়ের রঙ দুধে আলতায়। মুখের গড়নে একটা মিষ্টি আবেশ, চোখের মণি গভীর কালো, দৃষ্টি তির্যক, তপ্ত—একবার তাকালে সব পুরুষকেই নড়তে চড়তে হয়। দেহ সৌষ্টবে চাপা কামনা ফুটিফুটি করে। যাত্রায় প্রথম এসেছিলো নাচতে। বছর দুই পরে ওর কাজ ছিলো নাচ এবং ঠেকা সাজার। অর্থাৎ কোনো মহিলা-শিল্পী অনুপস্থিত কি অসুস্থ হ'লে বিন্দুর ভাগ্যে রোলটা জুটতো। ভাল পার্ট করতে পারুক না পারুক, মানানের দিক থেকে ও পুষিয়ে দিতে পারতো। সেই বিন্দুর মনে মনে এতো! চিৎপুরী গুজব, পঞ্চুদা, হরিপদ বায়েন, কিষাণ দাশগুপ্ত একই কথা বলছেন। বলছেন, গ্রামের কোন মন্দিরের পেছনে কী যেন ধরা পড়ায় নায়েকরা কেবল রাম ঠ্যাঙানই ঠ্যাঙান নি। হাজার তিনেক টাকা মুচলেকা নিয়ে ওই মানব-মানবীকে নাকি ছেড়েছে।

ওই দলে উর্মিলা সাহা নামে একজন অভিনেত্রী, প্রকৃতপক্ষে যে হিরোইন—তাকে চাকরী করে দিয়েছিলাম আমিই। বি এফ জে-এ-র তৎকালীন কোষাধ্যক্ষ, গোপাল পাল এবং তার সঙ্গী এক নাট্যকার একদিন মেয়েটিকে নিয়ে আমার দপ্তরে হাজির। দেখেই চিনতে পারলাম আমি। অঞ্জু সাহা নামে ও এককালে বহু নাট্যদলে অভিনয় করেছে। এখন বিবাহিতা। বাচ্চা হয়েছে তিনটি। গোপাল বললো, 'বড়ই কষ্টে আছে দাদা। স্বামীটা অমানুষ। বাচ্চাগুলোর মুখে রুটি জোগাড়ের ব্যবস্থা নেই।' শুনে আমি ওকে চিঠি লিখে দিলাম। পরদিন মেয়েটি এসে জানালো তার চাকরি হয়ে গেছে। অগ্রিম পেয়েছে দেড় হাজার টাকা। আমাকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেলো উর্মিলা। এই সময়ে আমার এক সহকর্মী রবি বসু আমার সামনেই বসেছিলেন। মেয়েটি যাওয়ার পর রবিবাবু হাসলেন। বললেন, 'একটা অনুচিত কাজ করলেন।' শুনে আমি অবাক। বললাম, 'তার মানে?' রবিবাবু বললেন, 'যে মেয়েটির চাকরি করে দিলেন, গোপালরা তার ঘাড় ভেঙে খাবে।'

রবি বসু যে-সব কথা বলেছিলেন মেয়েটি প্রসঙ্গে তা নাই বা বললাম। তবে সেই দিনই, রাত্রি সাড়ে ন-টার সময় অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে দেখলাম, গোপাল পাল এবং তার বন্ধু প্রায় টলতে টলতে বার থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরলো। সঙ্গে উর্মিলাও ছিলো।

উর্মিলা কদাচিৎ দেখা করতে আসতো অফিসে। এবং বিন্দু সম্পর্কিত কাহিনী বলবার চেষ্টা করতো। ঘুরিয়ে সে দল-মালিকের দোষ সম্পর্কে সজাগ করতে চাইতো আমাকে। আভাসে ইঙ্গিতে বলতে চাইতো, বিন্দুর জন্যই দলের নাকি এই হাল। মালিক কিন্তু উলটে উর্মিলার নামে নানা অভিযোগ করেছে। চোখ দু'টো গোলগোল করে বলেছিলো, 'কী বলবো দাদা, খাবার দাবারে একদম রুচি নেই মেয়েটার। লেপের তলায় ঢুকে পাঁইট সাবাড় করার মতন মেয়ে। তবে, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। সম্প্রদায় হিসাবে সী ইজ ও. কে।'

বিজয়দা হ'লেন চিৎপুরের গেজেট। বিন্দুতে সিন্ধুর সম্ভাবনা বিষয়ক আলোচনার আসর যখন গুলজার, বিজয়দা সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'শিবিরাজার গপ্পো জানো তোমরা? ধর্ম যেখানে কপোত সেজে হাজির হয়েছিলো। এ-কালে কপোতের প্রতীক হলো গিয়ে মেয়েছেলে। সেকালে চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খেয়ে আরামে আরামে শিবিরাজার চেহারাটা যেই না নাদুসনুদুস হ'য়ে এলো অমনি ধর্মের আবির্ভাব। কাটো গতর থেকে মাংস। ঈশ্বরের নিক্তির পাললা সর্বদা সমান থাকতে হবে। শরীর থেকে মাংস কেটে কেটে দিয়েও যখন পাখির ওজনের সমান হয় না, তখন শরীরটা নিয়েই পাললায় উঠে পড়লেন শিবিরাজা। অর্থাৎ ধনেপ্রাণে গেলেন। জীবজগতে যে ব্যাটা বেশ কিছু জমায়, ঈশ্বর অমনি একটি মেয়েছেলেরূপী কপোত পাঠিয়ে দেন। নিক্তির ওজন সমান করতে তখন আর খুব বেশিদিন সময় লাগে না। সুতরাং মনে রাখতে হবে মহিলারাই ধর্ম। না হ'লে গোটা বিশ্বের তামাম মানুষকে শালা নাকে দড়ি দিয়ে...'

এই বয়সে বিন্দু দু'একবার পা পিছলে পড়েনি যে তা নয়। বিজয় মিত্তির হ'লে বলতেন, মেয়েরা পড়ে না, ল্যাং মারে। আমার স্মরণ আছে, একদিন আগ-দুপুরের দিকে হঠাৎ ল্যাকপ্যাক করতে করতে কিষাণ দাশগুপ্তর আগমন। এসেই হাঁটুমুড়ে বসে পড়লেন, ধাইধাই করে থাপ্পড় মারতে লাগলেন নিজের কপালে।

'কী হলো কিষাণবাবু!'

'হালার গিদ্ধরের পুতে আমারে খাইয়া ফ্যালাইচে। হালার গলায়…' বলতে বলতে পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করেন। এক টিপ নস্যি দু'নাকে প্রাণপণে টেনে চোখ ও নাকের জলে ভাসিয়ে নেন মুখ। এবং যথারীতি নস্যির পলেস্তারা পরা আধভেজে কিতকিতে রুমালে নাক মুছে নিয়ে আবার আর্তনাদ করে ওঠেন, 'পলাইচে, হালায় পলাইয়া গেচে গা।'

'কে, কে পালালো!'

'সুমুন্দির পুতে মাইয়া লইয়া ভাইগ্যা গেচে।'

তারপর আস্তে আস্তে কাহিনীর জট খোলেন কিষাণবাবু। বলেন, তাঁর দলের সুরপার্টির এক টপ বিন্দুকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। গত পরশু গান ছিলো মদনপুরে। যাত্রা শেষ হ'লে দেখা গেলো বাসের দু'টো সীট খালি। তারা এলো না তো এলোই না। দল ফিরে এলো কিন্তু তাদের পাত্তা নেই।

খবরটা যেমন মজার, তেমনি দুঃখের এবং অবাকেরও। বিন্দু এক বনেদী ব্রাহ্মণ বংশের কন্যা। তার রুচি বলে কিছু থাকবে না ভাবা যায়? সেই বিন্দু সুরপার্টির একটা লোকের সঙ্গে পালিয়ে যাবে এও কি বিশ্বাস করতে হবে! আমার কাছে অসম্ভব ঠেকলো যে কারণে, তার প্রথম ও প্রধান কারণ, বিন্দু যে-লোকটির সঙ্গে পালিয়েছে বলে রটানো হয়েছে, সেই লোকটি জাতে মুসলমান। তিনি চল্লিশোর্ধ্ব। বিবাহিত। এবং আধ ডজন সন্তানের জনক। ওই ব্যক্তি, ধরা যাক তার নাম ইসমাইল—তিনি এর আগেও নিজের স্ত্রীর অজান্তে জনৈকা অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। আমি শুনেছিলাম, এই বিবাহপর্ব নাকি সংঘটিত হয়েছিলো কালীঘাটে, মালা বদল করে। তখন সেই অভিনেত্রীর উঠতির সময়। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ হবে। রঙ কালো, মুখ গোল—চেহারার কোথাও নম্র কোমলভাব, কমনীয়তা নারীসুলভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। চালচলনেও পুরুষ পুরুষ ভাব। অথচ সে সত্যি মহিলা। আমি বলছি না এ-রুচিবিকার। কারণ ঈশ্বরের পৃথিবীতে কতো বিচিত্র মানুষই না আছে। তাদের কারো সঙ্গে কারও মিল নেই, রুচিরও না। সাধুরা বলেন, গত জন্মের প্রভাব নিয়ে মানুষ জন্মায়। কর্ম, ক্রিয়া, ভাগ্য, রুচির খরচ-করতে-না-পারা অংশটা পায় সে এ-জন্মে। সুতরাং নীরদবরণ ওরফে ইসমাইলকে তো যথার্থ রুচি নিয়েই জন্মাতে হয়েছে। এখানে মানুষের করার কিচ্ছুটি নেই। এমনও তো হ'তে পারে, এই

ব্যক্তি গত-জন্মে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকার অধিবাসী ছিল। বছর খানেক ধরে ওরা স্বামী স্ত্রী হিসেবে একটি দলে কাজ করেছে। পরের বছর আমি যখন যাত্রা শুনতে এবং যাত্রার বাজার দেখতে আসামে যাই, ওখানে নীরদবরণের সঙ্গে আমার দেখা। সাক্ষাৎমাত্রই ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো। মুখভরা হাসি আর ছোট ছোট কথায় কুশল বিনিময়। খাওয়া-খাদ্যির পাট চুকিয়ে আমি যখন শোবার ঘরে বিশ্রাম করছিলাম, হঠাৎ দেখি সেখানে গুটিগুটি প্রবেশ করলো নীরদবরণ। মাথা চুলকোচ্ছে। খুব নরম গলায় ডাকলো, 'দাদা!'

অগত্যা উঠে বসা দরকার। কিন্তু পথশ্রান্ত শরীরটা তখন বিদ্রোহী। চোখে মুখে ক্লান্তি। 'বল্', আমি প্রায় ভারী হয়ে আসা চোখের পাতা জোর করে টেনে তাকাই, 'আয়।'

কাচুমাচু হয়ে, দু'হাত কচলাতে কচলাতে অপরাধীর মতন কাছে এসে দাঁড়ালো লোকটা। ওর চোখের পাতা দু'টো অস্থির, মণি চঞ্চল।

'বোস' আমি একটু সরে শুই। জায়গা করে দিই। হাই ছাড়ি, 'ঘুমটা সবে আসছিলো রে...'

'তা হ'লে আমি যাই।' অপ্রস্তুতের মতন উঠে দাঁড়ায় নীরদ।

'না না', আমি বাধা দিই। 'এসেই যখন পড়েছিস, থাক। কিছু বলার থাকলে বল। আমি বরং শুয়ে শুয়েই শুনি।'

বিছানার ওপর বসলো না নীরদ। পৈথানের মেঝেতে বসলো, 'মনটা বড়ই খারাপ দাদা, ভীষণ অশান্তি যাচ্ছে।'

এর পরেও কি কোনো পাষাণ শুয়ে থাকতে পারে? অতএব নিদ্রার আশা শিকেয় তুলে উঠতে হলো আমাকে। বসলাম। সিগ্রেট ধরালাম। এবং ডেকে, জোর করে বিছানায় বসালাম শ্রীমান প্রৌঢ়কে। 'বল্।' অল্প ইতস্তত করে ও। বলবে কি বলবে না ভাব। অবশেষে ঝপ করে বলেই ফেলে, 'রূপার কোনো খবর জানেন দাদা?'

'রূপা মানে তোর দুই নম্বর বউ রূপস্নিগ্ধা?'

'হ্যাঁ।' মাথা চুলকে বোকার মত হাসছিলো নীরদ।

'কেন, সে কোথায়!'

'গেলো বোশেখে পাকিস্তানে পালিয়েছে।'

'একা!'

'না!' অল্প থামলো নীরদবরণ, যেন রূপা একা না পালানোর জন্যে ও খানিকটা নিশ্চিন্ত।

'নিশাপতির সঙ্গে।' আগ্রহের গলায় বলছিলো নীরদ। 'একটা উড়ো খবর এসেছিলো। শুনলাম চট্টেশ্বরী অপেরায়। পরে রূপা চিঠি দিয়েছিলো আমাকে। টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলো।'

'কেন, কাজ করছে না?'

'করছে, বোধ হয় কুলোচ্ছে না। তাই মাস চারেক টাকা ঠিক পৌঁছেচে। কিন্তু এই মাস তিনেক দাদা, টাকা ফিরে আসছে।'

কথা বলতে বলতেই একটি চিঠির কথা মনে পড়লো আমার। হুগলী জেলার একটি গ্রাম থেকে অত্যন্ত কাঁচা হাতে লেখা একটি চিঠি। পুরনো এক্সারসাইজ খাতার ময়লা পৃষ্ঠায় এলোমেলোভাবে লেখা। পত্রলেখকটি কে! ওমা চিঠির শেষপ্রান্তে চোখ রেখে আমি অবাক। লেখা আছে আপনার অভাগিনী ভগিনী হামিদাবানু। পত্রের বক্তব্য এই যে, গ্রামে ছয় ছয়টি সন্তান নিয়ে তাঁর বাস। জমিজমা কিছু আছে বটে কিন্তু তাতে অভাব মেটে না। খসম প্রতিমাসে যে-টাকা পাঠাতো তাতেই কোনোরকমে হামিদা ভগিনী সংসার চালিয়ে নিতেন। কিন্তু হালে খসমের গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। গত আট মাস হামিদার খসম একটি কপর্দকও সংসারে পাঠায় নি। বরং এখন গ্রামের মানুষেরা পাঁচ-রকম কথা বলছেন। সবগুলিই আকথা-কুকথা। কিন্তু আমার হামিদা ভগিনী জানেন যে, তাঁর খসম পবিত্র চরিত্রের। সে কখনও গুনাহ্ করতে পারে না, এই তাঁর বিশ্বাস। তবু আমি যেন একটু নজর রাখি দুলহাজানের ওপর। এবং শাসন করি। গ্রামের মানুষেরা ভগিনী হামিদাকে পরামর্শ দিয়েছে আমাকে বিস্তারিত জানাবার জন্য। সুতরাং হামিদা ভগিনীর খসম যাতে নিয়মিত সংসারে টাকা পাঠান তার ব্যবস্থা যেন আমি করে দিই। আল্লাহ্ কসম, আমি যেন দায়িত্ব ভুলে না যাই।

স্বীকার করতে দোষ নেই, ভগিনী হামিদার চিঠির কথা আমি বেমালুম ভুলে বসে আছি। আসল আসামীটি কে, তাও আঁচ করতে পারিনি। এখন বুঝতে পারলাম আল্লাহতায়ালা হক হাফেজ। তা নইলে এমন যোগাযোগ! 'ইসমাইল', আমি ডাকলাম। অনুগত কনিষ্ঠের মতন জবাব দিলো নীরদবরণ, 'দাদা।'

'তোর বাড়ির খবর কী?'

'ভালো।' নীরদবরণ ওরফে ইসমাইল কথাটা বলার সঙ্গেসঙ্গে কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়লো, 'কেন দাদা? কোনো খারাপ খবরটবর পেয়েছেন নাকি?' হঠাৎ মাথা চুলকোতে শুরু করলো ও, 'মাস তিনেক আসামে আছি তো, তাই……'
'মাস ছয়েক আগের খবর রাখতিস?'
এবার বেচারীর মুখে কথা নেই। চুপচাপ। আমি এক ভয়ঙ্কর অপরাধীর ভাবগতিক লক্ষ্য করছিলাম। ও পকেট থেকে একটা সিগ্রেট বের করে ইতস্তত করছিলো। ইশারায় আমি ওকে ধূমপানের অনুমতি দিলাম। ও সিগ্রেটটা ধরালো। কয়েকটা চরম টান টানলো। গলগলে ধোঁয়ার মধ্যে মুখ লুকিয়ে বললো, 'এমন একটা চাকরি করি দাদা, মনকে চোখকে সামাল দেওয়াই কঠিন। বাস থেকে আসরে, আসর থেকে বাসে। রাত নেই দিন নেই সব এক। ঘরের কথা কখন যেন ভুল হয়ে যায় দাদা। যে-সব মেয়েরা আসে…'
আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। আমাকে উদ্যোগী হয়ে থামাতে হয়, 'সব খবর আমি রাখি, লুকিয়ে লাভ নেই। তোর বিবির নাম হামিদাবানু?'
'জী দাদা।'
আসামী এখানে কনফেস করলো। 'শোন ইসমাইল', আমি বললাম, 'তোর মালিককে আমি বলে যাবো, বাকি ক-মাস তুই কেবল হাতখরচা বাবদ একশো টাকা পাবি। বাকি টাকা মনিঅর্ডার করে তোর স্ত্রীকে পাঠানো হবে।'
ও মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। তাকায় আমার দিকে, 'তা হ'লে রূপার ব্যাপারে আর মাথা না ঘামানোই ভালো, কী বলেন দাদা?'
কী জবাব দেবো বলুন তো। যে লোকটা সবই বোঝে, সে যদি মুহূর্তে বোকার চরিত্রে অভিনয় করতে শুরু করে, তবে তাকে বোঝাবে কে? ইচ্ছে হচ্ছিলো গালে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিই। দিলাম না। অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করলাম। কোনো জবাবই দিলাম না আমি।
'মরুক, মরুক।' আপন মনে বলে যাচ্ছিলো ইসমাইল। 'আমার মতন তিন তিনটা মানুষকে ফাঁকি দিয়ে মাগী এসেছিলো আমার কাছে। আমাকেও শা…'
'ওঠ।' আমি ধমক দিই। 'চলে যা এখন। আমি ঘুমোবো।'
ইসমাইল ওঠে, 'এই কানমলা নাকমলা খাচ্ছি দাদা। এই বেহেস্ত থেকে আর আমাকে সরায় কোন ইবলিসে!'

কিষাণবাবু সেই কান আর নাকমলা খাওয়া ব্যক্তিকেই গালাগাল করছে এখন। সে নাকি বিন্দুকে নিয়ে পালিয়েছে।

'বিন্দু বাড়িতে যায় নি তো?'



'না,' কিষাণবাবু চরকির মতো ঘোরাতে চাইলেন মাথ.টাকে, 'ইডা আপনে কী কন?'

'কেন!'

'উড়াল পাখি কি খাঁচায় ধরা দেয়?' কিষাণবাবু থামেন, প্রকট চোয়ালে অল্প উজ্জ্বলতা, 'কুকিল হালায় কাউয়ার বাসায় ডিম পারে জানেন না?'

ঠিক এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে হরিপদ বায়েনের প্রবেশ। নাদুসনুদুস মানুষটা ঘামে নেয়ে উঠেছে একেবারে! কী ব্যাপার! হরিপদ বায়েন এমনভাবে মাথা নাড়লো, যা দেখে ধরে নেওয়া যেতে পারে আসামীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

'গেচে!' কিষাণবাবু লাফিয়ে উঠলেন, 'পাওয়া গেচে, ধরা পডচে হালায়? মায়ানীর পুতে আচে কুথায়? বিন্দুরে কি পাওয়া গেচে অর লগে?'

হরিপদ ধীরেসুস্থে বিস্তারিত খবর পেশ করলো। বললো, ইসমাইলের গ্রামে লোক পাঠানো হয়েছিলো, বাড়িতে সে পায়নি ইসমাইলকে। বাড়ির লোকেরা কোনো খবরও জানতো না। কিন্তু চতুর ছেলেটি খুঁজতে খুজতে শেষ পর্যন্ত ড্যারার সন্ধান পেয়েছে। ইসমাইলের গ্রাম থেকে প্রায় দু'ক্রোশ দূরে, হাটের একটা দোকানের আধখানা অংশ ভাড়া নিয়ে বিন্দুকে বিবি বানিয়ে ইসমাইল নাকি দিব্যি সংসার ফেঁদে বসেছে। পাগলা ওখানে চা মিষ্টি তো খেয়েছেই, দ্বিপ্রহরে বিবির রান্না পাঁচ বেগুন ভাতে ফলাও আহারও সেরেছে। নগদে পেয়েছে দশটা টাকা। ইসমাইল টাকাটা পাগলার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছে যে,

সে যেন বলে, বিন্দু আর ইসমাইলের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় নি। লোকে বলছে, ওরা নাকি পাকিস্তানে পালিয়েছে।

হরিপদ বললো, পাগলা নাকি সে-কথাই বলেছিলো প্রথমে। বলেছিলো দিগরের কোথাও খুঁজতে তার বাকি নেই। ও-দিকেই নাকি পা বাড়ায় নি ইসমাইল। কিন্তু হরিপদ বায়েনের চোখে ধুলো দেওয়া কি চারটিখানি কথা! 'ওকে দেখেই ধরে ফেলেছি আমি। ব্যাটাকে অমন তেল-চুকচুকে দেখাচ্ছে কেন? স্নান খাওয়াটা সারলো ও কোথায়? অগত্যা পাগলাটাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলাম। দেখি ঠোঁটে পান খাওয়ার দাগ। চট করে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, ভাল আছে তো ইসমাইল-বিন্দু। সংসার পেতেছে? তুর ছাই! শেয়ানা পাগলার মুখে দেখি কোনো ভাঁজই নেই। ও একেবারে দাঁতে দাঁত বসিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাঠ হয়ে। বুঝলাম ব্যাপার বেগতিক। ওকে আরও একটু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে বললাম, যাওয়ার আগের দিন নগদ তিনশো টাকা নিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে। বলেছিলো সংসার পেতেই জানাবো। কেমন খাওয়ালে দাওয়ালে? এতক্ষণে পাগলা কেবল ঘাড় কাৎ করে মৃদু হাসলো। ঝট করে আমি ওর হাত চেপে ধরলাম। সাবধান, কিষাণদা জানতে পারলে তোর আমার দু'জনের চাকরিই যাবে ...' হরিপদ বললো, 'আমার ওই নিখুঁত এ্যাকটিংএ জল হয়ে গেলো ব্যাটা। ব্যাস, অমনি সরসর করে সব ফাঁস করে দিয়েছে।'

কিষাণবাবু রাগে তর-র-র কাঁপছিলেন। 'বসুন', আমি বসতে অনুরোধ জানাই। কিষাণবাবু খপ করে চেপে ধরেন আমার হাতের কব্জি। 'আহেন, উইঠা আহেন দেহি।' হাইহাই টানছিলো আমাকে, বেশ জোরে, 'মারানীর গবারে জব্বর তাইস্তানি দেওন লাগাবো। বামুনের মাইয়া লইয়া ফস্টি-নস্টি; এঁ্যা...'

উঠতে হলোই। গাড়িও ডেকে আনলো হরিপদ। তিনজন মিলে উঠলাম। গদী থেকে পাগলাকে ডেকে নেওয়া হলো। সে আমাদের পথপ্রদর্শক। হরিপদ আগেই বলে দিয়েছিলো, আমরা পাগলার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবো।

তারকেশ্বর ছাড়িয়েও পথ বহুদূরের। মাইল কুড়ি বোধ হয় হবে। পথে ঘণ্টা-খানেক কেটেছিলো থানায়। তারপর ঠিক গোধূলি লগ্নে স্পটে গোটা দুই ভ্যান নিয়ে আমরা হাজির। গিয়ে দেখি আমাদের পৌঁছবার আগেই আর এক পুলিশ বাহিনী কেস তুলে নিয়েছে তাঁদের হাতে। অর্থাৎ আমার ভগিনী

হামিদাবামু খবর পেয়ে তাঁর এলাকার একজন ও. সি আর জনা তিনেক কনস্টেবল নিয়ে কেস প্রায় ফয়সালা করে ফেলেছে। শুনলাম দুই তাগড়াই কনস্টেবলের বেসামাল পিটুনীতে আধমরা ইসমাইলের দেহটা গরুর গাড়িতে চাপিয়ে গাঁয়ের পথে যাত্রা করেছে এক কনিষ্ঠ। সঙ্গে গেছে ছেলেমেয়েরাও। স্পটে তখনও এক দেওরকে সঙ্গে নিয়ে রয়ে গেছে হামিদাবামু। তারা বিন্দুকেও আধমরা করতে পারতো। কিন্তু করেনি। কেবল খসমের নয়া-বিবির চুলের মুঠি ধরে হাতের বাজু দিয়ে আচ্ছামতন ঘা কতক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। পুলিশের সহায়তায় ।বন্দুকে কলকাতায় পাঠাবার কৌসিস যখন প্রায় করে ফেলেছে হামিদা-বামু, এমন সময় সপুলিশ আমাদের স্পটে প্রবেশ।

ভ্যান থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে একজন কনস্টেবল কোনোরকমে খৈনীটা মুখে গুঁজে দিয়ে, জব্বর লাঠি ঠুঁকে বললো, 'ক্যা বোলা? আসামী ভাগলবা?' সঙ্গে সঙ্গে অন্য সিপাইরাও দেখি ঠকাঠক লাঠি ঠুঁকছে মাটিতে আর গোঁফে দিচ্ছে তা। হামিদা আমাদের নিয়ে গেলো সেই তছনছ করা নয়া খুয়াবের বেহেস্তে। ঘরে ঢুকে দেখি, বিন্দু গুম হয়ে বসে আছে ঘরের কোণে। তার পোশাক এবং চুল আলুথালু। চোখের কোলে জল শুকানোর দাগ। কিষাণবাবুকে দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠলো বিন্দু, 'অ কাকামনি গো···আমার কী হইলো গ···!'

ওই ডাক এবং কান্নার সঙ্গেসঙ্গে কিষাণবাবুর অন্তর গলে জল। বিন্দুকে যাত্রায় এনেছিলেন কিষাণবাবু। আবার আরতির বন্ধু বলেও ভয়ানক দুর্বলতা কিষাণ দাশগুপ্তের ছিলোই। সুতরাং বিন্দুর মুখে মাইয়ার মুখচ্ছবির ছায়া পড়বে এতে আর আশ্চর্য কি। দেখলাম কিষাণবাবুর চোখের কোণে টলমলো করছে অশ্রুবিন্দু। এবং হঠাৎই তিনি বিন্দুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভেউভেউ করে কেঁদে উঠলেন। কাছে গেলেন বিন্দুর। নাকে নস্যি না দেওয়া সত্বেও পকেট থেকে কিতকিতে কালো রুমালটা খা করে বের করে ঘনঘন নাক মুছতে লাগলেন এবং ফৎ ফৎ করে হেঁচকি তুলে কাঁদতে শুরু করলেন, 'মারানীর গিধরে তরে একা ফালাইয়া ভাইগা গেচে গা?"

মাইয়ায় যত কাঁদে, খুড়ো কাঁদে তার শতগুণ। হরিপদ আমার ডান-কানে মুখ গুঁজে বললো, 'নিন, সামাল দিন এবার।' তাকিয়ে দেখি, খাকি হাফপ্যাণ্ট হাফসার্ট এবং হাঁটু পর্যন্ত মোজায় ঢাকা দু' পায়ে দাঁড়িয়ে লম্বা ব্যাটনের ওপর থুতনি রেখে কনস্টেবল রামতারণ তেওয়ারিও কিষাণবাবুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাপুস

সেখানে বাঁধা পড়ে।' এই সূত্র ধরে যদি বিন্দু-কাহিনীর রহস্য উদ্ঘাটন করতে যাওয়া হয়, সমাধান মিলবে কী ?

কুলোকে নানা কথা ততক্ষণে বলতে শুরু করেছে। চিৎপুরের বাতাস গুজবের মৌতাতে তপ্ত। এর মধ্যে শুনি আর এক কথা। হরিপদ বায়েন আমার কানের কাছে মুখ এনে এমন একটা কথা বলে যে, আমি চমকে উঠি, 'ধ্যাৎ!' বিজয় খুড়ি দুর্জয় মিত্তির মাথা দোলাতে দোলাতে বলতে থাকেন, 'হয় হয়। নিয়তির লেখা থাকলে এ্যা-ও হয়।'

'তার মানে!'

আমার মুখ থেকে তুরন্ত কথা কেড়ে নেয় পঞ্চুদ', 'বিন্দুই তো সব। বিন্দু থেকেই জাগতিক বিশ্ব…"

হরিপদ বললো 'মানবের জন্ম।'

বিজয়দা বলেন, 'এই জন্মের হিস্টিরিয়া বড়ই রহস্যময়।'

হরিপদ হাসতে হাসতে ঢলে ঢলে পড়ছিলো। পঞ্চুদা নাগাড়ে কাতুকুতু দিয়ে যাচ্ছেন হরিপদকে।

হরিপদ সারা তক্তপোষ ধামসায়। উল্টো কাতুকুতু দিতে যায় পঞ্চুদাকে। এমনি করে অনেকটা সময় পার হয়। হরিপদ বায়েন বলে, 'খুব শক্ত, বলা খুব শক্ত দাদা বিন্দুর মধ্যে কোন সিন্ধু।'

বিজয় মিত্তির বলেন, 'নতুন কিছু না, নতুন কিছু না। মহাভারতেই ছাখো না। অর্জুন ব্যাটা নপুংশক সেজে নাচ শেখাতেন বিরাট রাজার কন্যাকে। মানে উত্তরাকে। সে এক উদ্ভিন্ন-যৌবনা। দুধ ঘিয়ের শরীর তো তাই বেশ নরম নরম। অর্জুন তো শক্তের ভক্ত নরমের যম। অভ্যাস টভ্যাস ছিলো আর কি! আসলে বৃহন্নলা কি সত্যি হিজরে ছিলো? ধ্যেৎ, আস্ত গুল। আমি তখন বিরাট রাজার রাজত্বে থাকলে অর্জুনকে বিবস্ত্র করে দেখিয়ে দিতাম টাইট ল্যাঙ্গটের কাজটা কি! উত্তরার দোষটা কী বলুন তো? গুরু বলে কথা, সেবাযত্ন তো করতেই হবে। হ্যাঁ, শিষ্যা আমারও কিছু কম ছিলো না। কিন্তু আমাকে ফাঁসায় কোন মায়ের বেটি! পারলো না। কিন্তু চক্ষের সামনে অর্জুনটা গ্যালো ফেঁসে। এখন করে কি মেয়েটাকে নিয়ে? অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে অভিমন্যুর কাঁধে চালান হয়ে গেলো। তারপর বোঝ বেটি উত্তরা, বোঝ; শ্যাম রাখবি না কূল?'

পঞ্চুদা বললেন, 'কিন্তু উত্তরার পেটে আর যাই থাক বিন্দু ছিলো না।'

'কে জানে।' বিজয় মিত্তির হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। 'হয়তো ছিলো, কিন্তু বেদব্যাস ব্যাটা লিখতে ভরসা পায় নি। অপসংস্কৃতি বলে রুদ্রেরা তখন চেঁচিয়ে উঠতে পারতো। তাই...'

অনেক পরে এই আলোচনা থেকে যেটুকু ধরা গেলো, তা হলো, বিন্দু এখন সরাসরি সংসারে গিয়ে উঠেছে। না, কর্তার দ্বিতীয় পক্ষ হয়ে নয়। পুত্রবধূ হয়ে। এখন বাপ না তাড়াতে পারে ছেলেকে, না পুত্রবধূ বিন্দুকে। বিজয়দা বলে উঠলেন, 'মর ব্যাটা মর। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যা। নিজের হাতে বিষবৃক্ষ পুঁতেছিস এখন খাবলা খাবলা ফল তোল আর খা।' হরিপদ বললো, 'বিন্দু বদলার মতন বদলা নিয়েছে। মোক্ষম অস্ত্র ছেড়েছে বুড়োটার ওপর। রেজিস্ট্রি করে সটান উঠে এসেছে সংসারে।'

তার মানে বিন্দু যাত্রার আসর থেকে সংসার আসরের হিরোইনের পোস্ট পেয়ে গেছে।

এর দিন কয়েক পরেই মায়া এলো সকালে। মায়া চট্টোপাধ্যায়। কত্থক নৃত্যে ও তখন ভারতের সুপার স্টার। গুরু রামনারায়ণ মিশ্রের ছাত্রী। এক আসর মানেই তিন হাজার টাকা। মায়া বললো, সে একটি বিষম সমস্যায় পড়েছে। সেই ব্যক্তি অর্থাৎ বিন্দুর শ্বশুরমশাই নাকি বেশ কিছুদিন আগে একটি মেয়েকে তুলে দিয়েছে মায়ার হাতে। বলেছে নাচ শেখাতে। কত্থক। টাকা পয়সা যা লাগে তিনিই সে খরচ বহন করবেন।

'নাচে কেমন?' আমি শুধোই।

'একেবারে র।' মায়া বললো, 'কিচ্ছু জানে না নাচের।'

'নাচ শিখিয়ে কী করবে?'

'যাত্রায় নামাবে।'

আমি হাসলাম।

'শেখাবো দাদা?' মায়া আমার চোখে তাকালো।

আমি কোনো জবাব দিই নি।

এই নীরবতা মায়াকে কি কিছু বুঝতে সাহায্য করেছিলো? হঠাৎ দেখলাম অপরাধীর মতো ও মাথা নামালো। 'ব্যাপারটা আমার কাছে একদম ভালো ঠেকছে না।'

বছর তিনেক পরে, মহালয়ার পরদিন শ্যামবাজার পবিত্র পাঞ্জাবী হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম। এমন সময় কে যেন আমার পায়ের পাতা ছুঁলো। চমকে দেখি একজন মহিলা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মহিলা তাকালেন আমার মুখের দিকে। আমি ঠিক স্মরণ করতে পারলাম না।
'চিনতে পারলেন না তো?' মাহলা আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছিলো মিটিমিটি।



আমি সরাসরি অপদস্থ। হ্যাঁ বলি না, না-বলি, ভেবে পাচ্ছিলাম না।
'আমি বিন্দুবতী; বিন্দু।
'বিন্দু!' আমি আকাশ থেকে পড়ি। 'তিন চার বছরের মধ্যে তুই এতো পাল্টেছিস! চেনাই যায় না। মনে হয় পনেরো বছর ঘর-করা এক পোক্ত গিন্নিবান্নি।'
'হ্যাঁ দাদা।' বিন্দু নাক কোঁচকালো। ওষ্ঠে সেই ভুবনমোহিনী হাসিক ঝলক। 'বসেবসে খেতেখেতে গায়ে চবি জমে গেছে। আমাকে কি খুবই কুৎসিৎ দেখাচ্ছে দাদা?'
'না রে, না।'
একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো বিন্দু। বললো, 'তিনটা বছরের মধ্যে কেমন যেন অনেক বয়েস বেড়ে গেলো দাদা।'
'থাকিস কোথায়?'
'ভিলাই।' বিন্দু ঠিক তেমনি, আজ থেকে বছর সাতেক আগে দিললি কালী-বাড়িতে একগাদা মার্কেটিং নিয়ে যেমন ভাবে ঢুকেছিলো, ঠিক তেমনি কয়েকটি পেপার, প্ল্যাস্টিক ব্যাগ আর কাগজের বস্তা বুকে চেপে দাঁড়িয়ে আছে। 'আপনার ভাইপো ওখানে চাকরি করে। পুজোর ছুটিতে কলকাতায় এসেছি কেনাকাটা করতে।'

'উঠেছিস কোথায় ?'

বিন্দু কিছু বললো না।

'তোর শ্বশুর কেমন আছে ?'

হঠাৎ বিন্দুর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে গেলো মেয়েটা। অবস্থা আয়ত্তে আনতে সময় লাগলো ওর। বললো 'আমরা দু'জনেই এসেছি। ও বাড়িতে আছে। একাদশীর দিন চলে যাবো আমরা।'

'ও...'

'দাদা', বিন্দু আমাকে সচকিত করে। 'এই আমার ননদ। আর এটি এটি...' ননদের কোল থেকে সুন্দর ফুটফুটে চাঁদের মতন ছেলেটাকে ও বুকে তুলে নেয়। 'এই আপনার নাতি দাদা।' হাঁটতে পারে। কথা বলে। দেখতে ভালো হয় নি দাদা ?'

'হ্যা। বেশ ভালো। টুকটুকে, বংশের মুখ পেয়েছে।'

নয়.

আচমকা বোমা ফাটলো। নিস্তব্ধ রাত্রির বুককে ফালাফালা করে ছড়িয়ে পড়লো সেই বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ।

এখন মধ্য রাত্রি অতিক্রম করা ঘড়ির কাঁটা তিনের ঘর ছুঁইছুঁই করছে। বাইরে বরফের মতো জমাট-বাঁধা অন্ধকার। তাপাঙ্ক অস্বাভাবিক নেমে যাওয়ায় অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরেছে শীত-দানব। দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দকে জোর করেও ঠেকানো যাচ্ছে না। হাড় ভেদ করে উঠে আসছে হি হি কাঁপন। এরই মধ্যে কানের পর্দা চেরা ভয়াবহ শব্দটা আছড়ে পড়লো। শ্যামল ঘোষ বললো, 'আমাদের ধড়ের খাঁচা থেকে প্রাণপাখিটা বুঝি ফুরুৎ করে উড়ে যায় যায়।'

ঘটনাস্থল আপার আসামের একটি প্রায় শহরের মত জনপদ। খানিক আগেও এখানে হাজার হাজার মানুষের সমবেত কলরোলে হাড-কাঁপানো শীতের বুড়িটা পালাবার পথ খুঁজছিলো। এখন সেই গণদেবতা উধাও। নিবু নিবু বাতিজ্বলা গুটিতিনেক দোকানে মৌমাছির মতন ঘিরে ধরা কিছু লোকজন ছাড়া সারা প্রান্তর খুঁজলে একটি মানুষের টিকিও দেখা যাবে না। অদূরে রাস্তা থেকে মাঠে নেমে আসা ডিলাক্স বাসটা শীত-কাহিল সরীসৃপের মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

অসিত বোস বললো, 'বছর দুয়েক পরে আসামে গিয়েছি খবর পেয়ে গৌহাটি থেকে আমার দিদি জামাইবাবু সপরিবারে এসেছেন। উদ্দেশ্য বহুকাল না দেখা ভাই ও তার অভিনয় দর্শন। আসাই যখন ভাইয়ের কাছে, খালি হাতে কেন? তাই জনা চারেকের পেট ভরতে পারে এমন নানা ধরনের খাবার এনেছে সঙ্গে করে। পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবে ভাইকে। যাত্রা শেষেও থাকতে চেয়েছিলো কিন্তু আমিই জোরজার করে পাঠিয়ে দিলাম। ছেলেমেয়েগুলোর চোখে ঘুম নাচছিলো, শীতে বিবর্ণ হয়ে আসছিলো ওদের ওষ্ঠ, গাল। থাকলে কা হতো ভাবুন একবার।'

যাত্রা শেষ হয়েছে মিনিট চল্লিশ আগে। সাজঘরে লোকের সংখ্যা গুটিকয় মাত্র। বাক্সের আড়ালে বিছানা পেতে দল-ম্যানেজার দফতর খুলে বসেছিলো। শিল্পী ও কলাকুশলীদের রাত্রির জলপানি দেওয়ার পর্ব শেষ। বিছানায় তখনও পড়ে আছে কিছু খাতাপত্র, এলোমেলো কিছু প্রোগ্রাম, প্রোগ্রাম বিক্রির খুচরো পয়সার টাল, খোলা পেন, লেপ ও বালিশ। মহিলা শিল্পীরা মেয়েদের মেক-আপের ঘেরাটোপের মধ্যে মেক-আপ তুলে চাকর বাকরদের দিয়ে আনানো রাত্রির স্বল্পাহার পর্ব সমাপ্ত করছিলো। জনা তিনেক চাকর গোছগাছে ব্যস্ত। অল্পদাম' মেক-আপ বক্সগুলো একজন তুলছিলো বাক্সে। অন্যজন আগুন জ্বেলে বাটি থেকে নারকেল তেল গলিয়ে কৌটোতে ভরছিলো। এবং বাটিগুলো মুছে নিচ্ছিলো টাওয়েলে। অন্যজন পোশাক-আসাক বাক্সজাত করতে ব্যস্ত। বেশকারী উপস্থিত সেখানে।

শ্যামল বললো, 'আমি আর অসিত মুখোমুখি বসে সবে খাবারগুলো সাজিয়ে বসেছি। পাশেই রয়েছে প্লাস্টিকের বালতি ব্যাগ ভরতি কয়েক বোতল ফোটানো জল। পালার দৈত্য মৃত্যুঞ্জয় দে-কে যত ডাকছি খাদ্যের ভাগ নেবার জন্য ও ততো লজ্জায় না না করে যাচ্ছে। ঠিক এমন সময় আকাশ ফাটানো হুঙ্কারের বোমা ফাটলো, 'কাটিম!'

লহমায় চারদিকে দুদ্দার ব্যস্ততা, ছোটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি। দু'জন চাকর পলকের মধ্যে ছিলামুক্ত তীরের মতো বেরিয়ে গেলো ব্যাকডোর দিয়ে। আর একজন ঘ্যাচ করে ত্রিপলের বেড়ার বাঁধন কেটে সুরুৎ করে হাওয়া হয়ে গেলো। মানুষের গন্ধ পাওয়া হরিণের মতো কান সজাগ করে সন্ত্রস্তভাবে ইতিউতি তাকাচ্ছিলো মৃত্যুঞ্জয়। দলের ছোট ম্যানেজার নিখিল, তার বস গুরুদাসের অনুপস্থিতিতে হঠাৎ এসে অফিস গোছগাছ করতে লেগে গিয়েছিলো, সেও 'ওৎ' শব্দ করে আৎকে উঠলো। অসিত বললো, 'আমি আর শ্যামলদা সামনে বেড়ে নেওয়া লোভনীয় সব খাবার থেকে কোনটা আগে তুলে নেবো ভাবছি, এমন সময় আবার সেই হুঙ্কারের বোমা : কাটিম···। অমনি দেখলাম আমাদের পালার বড় জিন্ মৃত্যুঞ্জয় সাড়ে তিনহাতো কাঁইকে নিমেষে নিষ্ক্রান্ত। নিখিলের চোখ দু'টি সাজঘরের গেটে ফিক্সড্। খুব দ্রুত সে ক্যাশবাক্স গুছিয়ে নিচ্ছিলো। দেখা-না দেখার মধ্যিখানে থেকে কাজটা এমনভাবে সে করে যাচ্ছিলো, যেন বাক্সে তালা পড়ার সঙ্গেসঙ্গে সে হাওয়া হয়ে যাবে।'

দল-ম্যানেজার গুরুদাস দফতর খুলে বসেছিলো অনেকক্ষণ কিন্তু নায়কের দেখা নেই। মাঝে একজন চাকর পাঠানো হয়েছিলো, সে ফিরে এসে রিপোর্ট দিলো, টিকিট ঘরে এখন জোর মহফিল চলছে। বোতল গড়াগড়ি যাছে মেঝেতে। কিন্তু পাওনা-গণ্ডা হাতে না এলে দল ছাড়ারও উপায় নেই। অগত্যা গুরুদাসকেই যেতে হলো নায়কের সন্ধানে। তারও আধঘণ্টা পর এই ভয়াবহ বজ্র নির্ঘোষ। বাজখাই গলার গগনভেদী বজ্র তৃতীয় দফে যেই না পড়া, অমনি কৎ করে ঢোঁক গিললো নিখিল। তার চোখ দু'টি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইলো। তড়িঘড়ি পালাতে গিয়ে একটা আছাড় খেলো নিখিল এবং নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে। কেবল দেখা গেলো নিখিলের চশমাটা তার পলায়ন পথের ওপর পড়ে আছে।

কাটিম বোমার গগণ-বিদারী বিস্ফোরণের শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিলো। শ্যামল আর অসিত তাকে আমল না দিয়ে অথবা পাতে বাড়া লোভনীয় খাদ্যবস্তুর গন্ধে চনমনে হয়ে ওঠা খিদের তাড়নায় দু'খানা চিকেন ওমলেট যেই না মুখের কাছে তুলেছে, অমনি ফ্রিজ হয়ে গেলো। প্রবল আক্রোশে ছুঁড়ে দেওয়া পোটলার মতো সাজঘরে কী যেন একটা ভারী বস্তু পড়লো ধপাস্ করে। প্রথমে ওরা বুঝতে পারে নি। বুঝলো যখন এটা আদৌ কোনো ভারী পোটলা নয়, গুরুদাসের দেহ, অমনি অন্য একটা মানুষ ডাইভ মেরে জলে ঝাঁপ দেওয়ার মতন ছিটকে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো গুরুদাসের দেহের ওপর। সঙ্গেসঙ্গে আগ্রাসী কাইজাদারদের গলার সমস্বরের জিগির স্টেনগানের গুলির মতন বেরিয়ে এলো, 'কাটিম, কাটিম; ক্যালা কাটিম।'

শ্যামল বললো, 'তাকিয়ে দেখি ষণ্ডামার্কা একদঙ্গল যমদূতের মতো অনেকগুলো লাল-দৃষ্টির মানুষ সাজঘরের ফটক পেরিয়ে সোজা ঢুকে পড়েছে ভেতরে। মেয়েরা ততক্ষণে ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে টাল-করা বাক্সের ওপাশে দলবেঁধে মাথা গুঁজে আত্মগোপন করেছে।' শ্যামল বললো, 'আমাদের আর প্রাণপণে লুকনো মেয়েদের মধ্যে ব্যবধানমাত্র একটাল বাক্স। আমরা অনেকগুলো ভয়ার্ত নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পারছিলাম। ওরই মধ্যে খুব চাপা এবং মিহি গলায় কেউ কাঁদছে বলেও মনে হলো।'

নিরঞ্জন ঘোষ বললো, সে নাকি আগেই বুঝতে পেরেছিলো। অমনি এক ধমক। শ্যামল বললো, 'গুল মারার জায়গা পাওনি? তুমি ব্যাটা এসেছিলে চিকেন

বিরিয়ানীর গন্ধ পেয়ে। গুরুদাসকে যখন ওরা ছুঁড়ে দিয়েছে এবং জিগির মারছে, তখন তোমার মুখ সাদা কাগজ হয়ে গেছে। পালাবার পথ না পেয়ে তুমি ত ·ত···ত···ত করছিলে না?'

নিরঞ্জন প্রতিবাদ করলো, 'কভি নেহি। বিপদ বুঝে আমি এসেছিলাম মোকাবিলা করতে। মারছে মারছে বলে চেঁচাতে চেঁচাতে যখন চাকরগুলো পালাচ্ছিলো তখন আর আমার পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব ছিলো না। তাই···।' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অসিত বললো, 'থাম। এটা চাচার ম্যাজিক নয় যে, থলে থেকে যা খুশি বের করে ভাঁওতা দিবি। আমি স্পষ্ট দেখেছি, তুই মেয়েদের সাজঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিলি।'

১৯৬৯ সনের এক সন্ধ্যায় অহোম-বিহার প্রসঙ্গিত আলোচনার আসর বসেছিলো। তর্কবিতর্কে সেই আসর জমজমাট। অসিত বললো, 'ত্রিপল ছিঁড়ে পালাবার মুহূর্তে পঞ্চা একবার অবশ্য কোনোরকমে বলতে পেরেছিলো, মারছে। কিন্তু তখনও আমি বুঝতে পারিনি কাকে মারছে, কেন মারছে! এবং কেইবা মারছে। ঠিক কোনদিকে যে মারামারিটা হচ্ছে তাও বুঝতে পারছিলাম না।'

গুরুদাসের দেহটা একটা ভারী পোটলার মতন যেই না সাজঘরে এসে ধপাস করে পড়া, সঙ্গে সঙ্গে তরাসে চোখ বন্ধ। মেয়েগুলো দমবন্ধ করে পরবর্তী শব্দের জন্য প্রতীক্ষা করছিলো। শ্যামল আর অসিতের দৃষ্টিও হারিয়ে গেলো চোখবন্ধ অন্ধকারে। চোখ খুললে দেখলো, গুরুদাসের ওপর ছিটকে এসে পড়া বস্তুটা আসলে মানুষ। চোঙ্গা প্যাণ্ট আর চাইনিজ শার্ট পরা, মাথা ভরতি স্যাম্পু-করা ফোঁপানো চুল এবং মুখময় সুন্দর করে ছাঁটা দাড়িগোঁফ। চোখের পলক আর একবার ফেলবার অবকাশ মিললো না, দেখা গেলো ঝাঁপিয়ে-পড়া মানুষটি গুরুদাসের গায়ের জাম্পারের পেছন দিক খাবলা দিয়ে ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে তুলে দাঁড় করালো এবং তার থুতনির ওপর মারলো বিরাশী কেজি ওজনের একটি লাগসই ঘুসি। গুরুদাস একটা আর্ত চিৎকার করে ছিটকে গিয়ে পড়লো ওর বেডিং কাম দফতরের মাঝখানে। ষণ্ডামার্কা আগন্তুকের দল সঙ্গেসঙ্গে দোহার গেয়ে উঠলো 'কাটিম, কাটিম।'

কাটিম মানে কাটবো। যাত্রা দলের অধিকাংশ পুরনো লোক অবশ্যই জানেন এই শব্দার্থ। কিন্তু শ্যামল ঘোষ আর অসিত বোস—ওদের জানবার কথা নয়।

কারণ যাত্রায় ওরা জয়েন করেছে বছর চারেক হলো। এবং তার মধ্যে আসামে এক আধবারের জন্য ওরা আসার সুযোগ পেয়েছিলো।

বাক্সের ওপাশে মেয়েগুলো জড়াজাপটি করে মাথা গুঁজে ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। শ্যামল আর অসিতের হাতে তোলা খাবার রয়ে গেছে হাতেই। একদল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতন ষণ্ডামার্কা আগ্রাসী যতবার জিগির তোলে, ততবার খোদ যমের মতন দেখতে কালো মোটকা পুরোভাগে দাঁড়ানো লিডার হাত বাড়িয়ে আশ্বাস দেয়, 'খারাপ পাইবেন না' অর্থাৎ খারাপভাবে নেবেন না বা ভয় পাবেন না।

ও যতবার এই কথা বলে ততবার গুরুদাসের দেহটাকে নিয়ে ওরা বলের মতন লোফালুফি করে। যার যেমন খুশী মারে। বেদম প্রহারে গুরুদাস এমন করছিলো যে, সে কাঁদতে পর্যন্ত পারছিলো না। তার গলা থেকে কেমন চিঁ-চিঁ শব্দ উঠছে।

এর মধ্যে একজন দলছুট ছোকরা একলাফে হাজির হলো অসিত আর শ্যামলের কাছে। তার চোখ দু'টি সদ্য জল থেকে তোলা চাঁদা মাছের মতো চকচক করছিলো। যেমন পড়া অমনি অসিতের বালতি-ব্যাগে হাত চালান করা। 'মা—ল', লহমার মধ্যে ওই ব্যাগ থেকে ঝাঁ করে একটা বোতল তুলে নিলো লোকটি, 'কতো মা-ল রে' বলেই আলগা ছিপিতে দাঁত বসাতেই বোতলের মুখটা খসে পড়লো। ততক্ষণে গোটা দলটাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর বোতল কাড়াকাড়ি করতে। লিডার মশাই মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে বলে যাচ্ছে 'শিল্পীরা খারাপ পাইবেন না।'

বোতলটা উপুর করে গলায় ঢালার সঙ্গেসঙ্গে প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়া ছোকরাটির গোটা মুখখানা বিকৃত। ফুঁৎ ফুৎ করে মুখ থেকে তরল পদার্থ বের করে দিয়ে লিডারের দিকে তাকালো, 'মাল না হয়', ছোকরা অদ্ভুতভাবে ঠোঁট উলটে বললো, 'জ-ল।' বলেই ঠকাস করে বোতলটা রেখে দিলো যথাস্থানে। বাকি সকলের মুখেই দেখা গেলো বিকৃতি। এবং একএক করে সবাই অসিতের বালতি ব্যাগে ফেরৎ দিলো বোতলগুলো। এরই মধ্যে একজন শ্যামলের সামনে থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিলো কিছু খাবার।

গোটা সাজঘর জুড়ে ভয়াবহ লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। ক্যাশবাক্সের তালা ভাঙা হয়েছে, কিছু পোশাক-আসাক, হাতের কাছে যা পেয়েছে হাতড়ে নিয়েছে। এবং এরই

মধ্যে পালা করে অত্যাচার করে যাচ্ছে গুরুদাসের ওপর। অহমিয়া ভাষা জানলে কথাগুলো হুবহু লাগাতে পারতাম। জানি না বলে বলছি বাংলাতেই।

'ভাঁওতা মারার জায়গা পাওনি বলদের ছাও। কোথায় সেই দৈত্য? নিয়ে আয় তোর বাবা সেই আঠাশ ফুট দৈত্যকে।' বলার সঙ্গেসঙ্গে কাহিল, মুমূর্ষু, অচল গুরুদাসের দেহটাকে হ্যাঁচকা টানে তুলে আনছে আর হাত এবং পায়ের আঘাতে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে নীচে। 'কাটিম, শালাকে কাটিবার হয়—' দলের লিডার এবার খামচা দিয়ে ধরেছে গুরুদাসের চুলের মুঠি। এবং হ্যাঁচকা টানে এনেছে উঠিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটাকে তুলেছে উর্ধ্বে, খড়্গের মতন। জাইঘান্টিক ওই দানবের হাতটা যদি সত্যিই আছড়ে পড়ে গুরুদাসের ওপরে তা হ'লে ওর পক্ষে আর ইহজগতে থাকা সম্ভব হবে না। এমন সময় ঘাড় গুঁজে লুকনো মেয়েদের মধ্য থেকে কে যেন ডুকরে কেঁদে উঠলো।

উনিশ শো উনআশিতে ঘটনাটি ঘটেছিলো। এর আগের বছর উত্তরের শিকার হয়েছিলো কলিকাতা যাত্রা সমাজ। উনিশ শো আটাত্তরে, 'হ্যামলেট' অভিনয়ের যশ যখন গগনস্পর্শী, তখন অদ্ভুত এক চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে এই দলকে আসামের সীমা অতিক্রম করে চলে আসতে বাধ্য করা হয়। গত কুড়ি বছরের এমন একটি মরশুমের কথা মনে পড়ে না, যে মরশুমে আসামের মাটিতে দু' একটি দল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়নি। পঞ্চু সেন যে-বছর মাধবী নাট্য কোম্পানীতে, সে বছর কিরণ মৈত্র, সমর মুখার্জি, অঞ্জলি ভট্টাচার্যও ছিলো ওই দলে। অনাদায়ের আঘাতে বিপর্যস্ত দলটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার মতো অর্থবল ছিলো না জয়গোবিন্দ রায় চৌধুরীর। আজকের যে কটি বড় দল তাঁরাও এই ভয়াবহ চক্র থেকে অতীতে রেহাই পায় নি।

নায়েকদের এই অত্যাচার হাল আমলের নয় কিংবা নির্দিষ্ট নয় কেবল আসামের ক্ষেত্রেই। এই বঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রতি মরশুমে এ-ধরনের ঘটনা ঘটে, ঘটছে। বছর সাতেক আগে এ-প্রসঙ্গে সূর্যকুমার দত্তর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিলো। সূর্যবাবু বলেছিলেন, সুদূর অতীতে যাত্রাগান যখন কেবল বিত্তশালী ব্যক্তি বা জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় চলতো তখন এমন ঘটনা ঘটবার অবকাশ ছিলো না। কিন্তু জমিদার বাড়ির অঙ্গন থেকে যাত্রাগান নায়েকদের ব্যবসায় মাধ্যম হওয়াতে অবস্থার পরিবর্তন হ'তে লাগলো। ব্যবসায় মানেই মুনাফা অর্জনের উদ্যোগ। সুতরাং শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা—অর্থাৎ পাওনায় ফাঁকি দেবার নতুন নতুন

ফন্দিফিকির আবিষ্কৃত হ'তে থাকলো। গত কুড়ি বছরে এ-রকম হাজার হাজার ঘটনার সাক্ষী আমি। তবে উত্তর এ-ব্যাপারে বরাবর অগ্রণী।

যাত্রার কয়েক শো দালাল, যাদের আমি ফিল্ড অফিসার বা লর্ড আখ্যা দিয়েছি তারাই কি সকলে সৎ? উত্তরবঙ্গে প্রতি মরশুমে একটা শয়তানী চক্র ওৎ পেতে থাকে। এবং এই সর্বনাশী চক্রে পড়ে কত দল যে সর্বস্বান্ত হয় তার ইয়ত্তা নেই। ভয়াবহ ওই চক্রব্যূহের কথা পরে বলছি। আপাততঃ এই বঙ্গের দুষ্টচক্রের কিছু নমুনা দেওয়া যাক।

১৯৬৮ সনের কথা। জলপাইগুড়ি জেলার একটি পুরনো আসরে নট্ট কোম্পানীর গান। সে বছর যেমন ডাক উঠেছে 'সুলতানা রিজিয়ার',- তেমনি বাজার ধরেছে 'মহিয়সী কৈকেয়ী', চারদিনের বায়না। মোট ফুরান বারো হাজার সাতশ চুয়াল্লিশ। দল গিয়ে পৌঁছলো সকালে। একটা স্কুলবাড়ি নায়েকরা বরাদ্দ করেছিলেন বাসাবাড়ি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। পল্লী এলাকা, রেসিডেন্সিয়াল হোটেল বলতে কিছু নেই বলে, সবচেয়ে দক্ষিণের রুমটা দেওয়া হলো আমাদের তিনজনের জন্য। মহেন্দ্র গুপ্ত, আমি এবং মাখনলাল নট্ট। বেঞ্চ সাজিয়ে বেড তৈরি হলো। চাকরেরা ঝাড়পোঁচ করে বিছানা পেতে দিলো। বাকি ঘর-গুলোতে যে যেমন খুশি ছড়িয়ে পড়লো। পাশেই ত্রিপল দিয়ে বানানো ছিলো রান্নাঘর। নট্ট কোম্পানীতে তখনও হি উইমেনদের সমাদর। অর্থাৎ গুঁফোরাণী। সুতরাং খুব একটা ঝঞ্ঝাট নেই। প্যাণ্ডেল ছিলো দশ হাজারী। গান হলো যথাক্রমে সুলতানা রিজিয়া, দাদাঠাকুর, সিংহগড ও মহীয়সী কৈকেয়ী। শেষ দিনের শেষ শো সমাপ্ত হবার পর আমি আর মহেন্দ্রবাবু একসঙ্গে আসর থেকে ঘরে ফিরে কাপড়-জামা ছাড়লাম। বসে গল্প করছি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো নবকুমার। হাঁপাতে হাঁপাতে সে যা বললো, তা সংক্ষেপে করলে এই দাঁড়ায় যে, আসল নায়েক পালিয়েছে। কতগুলো ছেলে-ছোকরা অনেক কম পেমেণ্ট নেবার জন্য মাখনকে প্রথমে পীড়াপীড়ি করেছিলো, এখন রীতিমতো শাসাচ্ছে। সুতরাং এখনই আমার এখানে যাওয়া উচিৎ। মহেন্দ্রবাবু বললেন, 'যান একবার, দেখে আসুন—ওখানে কী হচ্ছে।'

স্কুলের দু'টি ক্লাসের মধ্যেকার পার্টিশন সরিয়ে সাজঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন নায়েকরা। তার মধ্যেই বাক্স-প্যাটরা, তার মধ্যেই সাজ-পোশাকের আয়োজন। গিয়ে দেখি ঘরে একদল যুবকের ভিড়। মাখন গুম হয়ে বসে ফুলছে। তার

পাশেই টাকার বাণ্ডিল। আমি ঢুকতেই কেমন একটা চাপা গুঞ্জরণ উঠলো যুব-নায়েকদের মধ্যে। ভাবটা এই. যেন আমি অবাঞ্ছিত। সামনের দিকে দাঁড়ানো একটি ছেলের হাতে চেকমুড়ির অংশ—যেটা নায়েকরা পেয়ে থাকেন। ওই কাজটা মাখনের দিকে বাড়িয়ে শাসাচ্ছে। অর্থাৎ বলতে চাইছে পুরো আদায়ের বয়ান লিখে না দিলে নট্ট কোম্পানীর এস্টেট ওরা আটকে দেবে।

আমি ঢুকলাম। মাখন এক পলক আমাকে দেখে নিয়ে আবার গোঁজ হয়ে বসে থাকলো। যেন বায়নাটা আমিই ওকে নিতে বাধ্য করেছি। 'কী হয়েছে ? বলতে বলতে আমি মাখনের পাশে বাক্সের ওপর বসলাম। মাখন তার সামনে ভিড় করা যুবকদের দেখিয়ে দিলো ইশারায়। 'ব্যাপার কী ?' আমি যুব নায়েকদের শুধোলাম। ওরা বললো, টাকা দিয়েছে কিন্তু মাখনবাবু নাকি প্রাপ্তি-স্বীকার করছে না। আমি বাড়ানো চেকমুড়িটা হাত বাড়িয়ে নিলাম। বায়না লেখা হয়েছে কৈলাসচন্দ্র দাসের নামে। 'কৈলাসবাবু কে ?' আমি প্রশ্ন করি। ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। একজন বললো 'তিনি অসুস্থ।' আবার প্রশ্ন করি, 'কত দিয়েছেন ?' ওরা জানালো, বায়না, এ্যাডভান্স, ঠাকুরকে দেওয়ার হিসাব যোগ করলে হয়, দু'হাজার তেতাল্লিশ। আর এখানে আছে পুরো পাঁচ। তার মানে পাঁচ হাজার সাত শো এক টাকা কম। 'এতো কম !' আমি বিস্ময় প্রকাশ করি। ছেলেরা বললো, এক্সপেকটেড সেল পাওয়া যায় নি। 'সেকি !' আমি অবাক হই। 'রোজ হাউস ফুল টাঙিয়েছেন তবু বলছেন…'

'আমরা কি তা হ'লে মিথ্যে বলছি ?' একজন দেখলাম গলা চড়ালো।

'কী বলছেন আপনারাই ভালো জানেন।' আমি বললাম। 'কিন্তু এটাও তো ভাবতে হবে এত বড়ো একটা দল, তার খরচ পোষানোর একটা ব্যাপার রয়েছে। এত টাকা কম দিলে দলটাই বা চলে কী করে ?'

'তা আমাদের জানবার কথা নয়।' সবার আগে দাঁড়ানো ছেলেটি ঝাঁঝিয়ে উঠলো, 'সেল না হ'লে কি ঘর থেকে টাকা দিতে হবে ?'

'সেল তো খারাপ হয় নি !'

'নট আপ টু দি এক্সপেকটেশন।'

'এক্সপেকটেশন মানে কি দশ হাজারী প্যাণ্ডেলে কুড়ি হাজার লোক ?'

ভিড়ে মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠলো, 'মাসীটা কে র‍্যা ?' অমনি আর

একজন বললো 'পোঁচ মার।' কথাটা শেষ হলো কি হলো না মাখন বাঘের মতন গর্জে উঠলো 'স্টপ, স্টপ ইট।' ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়েছে মাখন। ভয়ানক কাঁপছে রাগে, উত্তেজনায়, আক্রোশে। ওর চোখ দুটো বুঝি ঠিকরে বেরিয়ে আসে আর কি। 'টাকা দেবেন না দেবেন না—তাই বলে অপমান করার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে! জানেন উনি কে?'

আমি মাখনের মুখটা চেপে ধরলাম। কিন্তু ওরই মধ্যে মাখন টাকার বাণ্ডিলটা তুলে সামনে দাঁড়ানো ছেলেটির মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরেছে। একটা শব্দ হলো ওফ্। দেখলাম ছেলেটি দু'চোখ চেপে বসে পড়লো। সঙ্গেসঙ্গে লঙ্কাকাণ্ড। সকলের হাতের আস্তিন গোটানো হয়ে গেছে, 'কী, এতবড় অসম্মান! গোপলা, সব ঘরে তালা মেরে দে। দেখি শালারা দল নিয়ে যায় কী করে।' মাখনও থামবার পাত্র নয়। এই ফাঁকে চশমাটাকে সে বুলেটের মতন ছুঁড়ে দিয়েছে, হাতের ঘড়িটাকেও মেরেছে বোমার মতো এবং পেটমোটা পোর্টফোলিও ব্যাগটা যে ছুঁড়ে দিয়েছে কোনদিকে কে জানে। 'আসেন, আওগাইয়া আসেন। দেখি কোন বাপে জন্ম দিচে। ভাবছেন মগের মুল্লুক! চোরের মা-র বড় গলা!'

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে দলের কিছু লোক ছুটে আসে। সতীশ নন্দী আর নবকুমারকে আমি ইশারা করি। ওরা মাখনকে টেনে নিয়ে যেতে বেশ হিমসিম খায়।

মাখনের এই ধরনের কর্মকাণ্ডে ষণ্ডামার্কা ছেলেগুলো থক খেয়ে গিয়েছিলো। আমি বললাম, 'পুরো টাকা না পেয়ে কি ফুল পেমেন্টের প্রাপ্তি স্বীকার করা যায়? বরং আপনারা যতটা দিচ্ছেন ততটা লিখে দেবার বন্দোবস্ত আমি করে দিচ্ছি।' ওরা কিন্তু আমার প্রস্তাবটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না। চলে যাচ্ছিলো সবাই মিলে। যাওয়ার সময় বলে গেলো এস্টেট তো থাকলোই, একটি লোকেরও সাধ্য নেই এই স্কুলবাড়ি থেকে পালায়। পালাবার চেষ্টা করলে লাশ পড়ে যাবে।

রাত্রি তখন অনেক। গান শেষ হয়েছিলো রাত একটায়। দু'টো তেইশ মিনিটে আমি ফিরে এলাম। দেখি পদ্ম ঠাকুর দরজায় দাঁড়িয়ে। সকলের খাওয়া-খাওয়ার পাট চুকে গেছে, এবার আমরা তিনজন। কিন্তু এই অবস্থায় কি ভাতের গ্রাস মুখে উঠবে? লোকাল থানার ও. সিকে আমি একটি চিঠি লিখলাম। সতীশ নন্দী চিঠি ট্যাঁকে নিয়ে ওই অন্ধকারে বাঁশ-বাদাড়ে ঢুকলো। তার পরনে ছিলো শুধু গামছা। সারা গা আদুল। সুতরাং সন্দেহ হবার কথা নয়।

রাত পৌনে তিনটা নাগাদ ও. সি এলেন। সঙ্গে পুলিশ। মূল নায়েক গা ঢাকা দিয়ে কিছু ছেলেকে এগিয়ে দিয়েছে শুনে, এগ্রিমেণ্টের সেই অংশটা চাইলেন—যা দলের হাতে থাকে। জনা-চারেক কনস্টেবলকে পাঠানো হলো আসামীদের পাকড়াও করতে। আধঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করে কারও টি কি পাওয়া গেলো না। হতাশ কনস্টেবলরা ফিরে এলে ও. সি নিজেই উঠলেন। বেরিয়ে গেলেন জীপ নিয়ে। এবং মিনিট কুড়ির মধ্যে নায়েক কৈলাশ বুড়োকে ফিরে এলেন। কান টানলে মাথা যে আসেই সেটা বুঝলাম তখন। দেখি পলাতক ছেলে-ছোকরারা একে একে হাজির হতে থাকলো। ও. সি কৈলাসচন্দ্র পালকে পুরো টাকা সামনে রাখতে বললেন। যুবকদের মধ্যে আপত্তির গুঞ্জন ফুটিফুটি হতেই যম চমকানো এক ধমক। ও. সির ওই ধমকে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। এবং এই শাসন যে আমাদের সমাজ জীবনে কী অভাবিত সমাধান করতে পারে সঙ্গে সঙ্গেই তা দেখতে পেলাম।

পনেরো মিনিটের সময় দিয়েছিলেন ও. সি, মিনিট দশেকের মধ্যে দেখি পুরো টাকা উপস্থিত। টাকাগুলো মাখনের হাতে তুলে দিয়ে একগাল হাসলেন ও. সি সাহেব। বললেন, 'এবার আমার একটা আর্জি শুনতে হবে।'

'বলুন।' মাখন বললো।

'স্কুলফাণ্ডের জন্য কিছু চাঁদা দিয়ে গেলে ভালো হয়।'

মাখনলাল নষ্ট হাতের সবগুলো টাকাই বাড়িয়ে দিলেন ও. সির দিকে। ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন :

'কী!'

'চাঁদা!' মাখন বললো।

'যাঃ!' ভদ্রলোক কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন ; 'ঠাট্টা করছেন?'

মাখন বললো, 'পুলিশের সঙ্গে কেউ ঠাট্টা করে?'

ঝটিতি আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন। কৈলাশবুড়ো মাখনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলো। মস্তানেরা দেখি করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে পরম করুণা প্রাপ্তির আনন্দে। ও. সি মশাইয়ের হাতে টাকা, চোখে অবিশ্বাস। তারপর আচমকাই একটি জব্বর হুমকি, 'ছাড়ুন!' কৈলাশবুড়ো ছিটকে সরে গেলো। যুবকেরা কাঁপছিলো। দারোগা বললেন, 'শিগগীর রসিদ লিখে দিন।'

প্রায় মুমূর্ষু গুরুদাস ভক্ত হনুমানের মতো তার বিছানায় করজোড় বসে কষ্টের হাঁপানি হাঁপাচ্ছে। তার গলার শব্দ ভেঙে খানখান। সামনে দাঁড়িয়ে আছে যমালয় থেকে নেমে আসা জনাকুড়ি যমদূত। ওই হাড়-কাঁপানো শীতেও তারা ঘর্মাক্ত। ওরই মধ্য থেকে একজন ঝাঁ করে মুঠি-ধরা ধরলো গুরুদাসের প্রায় ফালা ফালা হয়ে আসা জাম্পারের বুকের দিক, 'কাটিম।' আর বসে থাকতে না পেরে অসিত ঝাঁপিয়ে পড়ে গুরুদাসকে আড়াল করে দাঁড়ালো, 'ব্যাপার কী! ছেলেটাকে কেন মারছেন ? ওতো এক্ষুনি মরে যাবে!'

'মরিবার লাগে।' ভিড়ের মধ্য থেকে দু'তিন জনার গলা শোনা গেলো। বাকি সবাই সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, 'কাটিবার হয়।' পলক ফেলবার অবকাশ মেলে না, অসিত ছিটকে এসে পড়ে তার জায়গায়। সঙ্গে সঙ্গে দলপতির বরাভয়, 'আপনেরা আর্টিস্ট—খারাপ পাইবেন না।' কিন্তু চোখের সামনে যা ঘটছে তাতে খারাপ না-পাওয়ার কথা কী ? দেখা গেলো বেতস লতার মতন ল্যাকপেকে দেহ থেকে গুরুদাসের মাথাটা বোঁটা মোচড়ানো ফলের মতো ঝুলে পড়েছে। খুব মিয়নো গলায় টানা কেঁদে যাচ্ছে, হেঁচকি তুলছে। যে কোনো মুহূর্তেই আত্মা নামক পাখিটা ওর দেহের খাঁচা থেকে শূন্যে হাওয়া হয়ে যেতে পারে।

'শালা!' স্বয়ং সর্দারের গলা। 'ভড়কি মারার জায়গা না হয় ?' কথাটা শেষ হতে পারে না। মোটাসোটা কালো, খাড়া খাড়া চুলঅলা একজন লোক এক আঁটি শাক শূন্যে তোলার মতন ঝপাং করে তুলে নিলো গুরুদাসকে, 'কোথায় তোর সেই আঠাশ ফুট বাপ ?' তারপর কাঁচা খিস্তি। প্রতারককে যত খারাপ ভাষায় ভূষিত করা যায় তার কিছুই বাদ থাকলো না। অসিত বললো, 'দাদা, দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো আমাদের। কিন্তু চোখটা বন্ধ করতে পারছিলাম না। জানতাম ওটা যখন বন্ধ না করে পারবো না, তখন এই পৃথিবী থেকে একটি আত্মা উধাও। তারপর যখন চোখ খুলবো, দেখবো প্রাণহীন একটা নিস্পন্দ দেহ পড়ে আছে। বিপুলা পৃথিবীর বিপুল জনসংখ্যা থেকে একজন কমে গেছে।'

গুরুদাসকে শূন্যে তুলে তখনও লোকটা চেঁচাচ্ছে, 'আনিবার হয়। তোর আঠাশ ফুট বাপকে আনিবার লাগে।' আর দোয়ার-গাইয়েরা যেমন করে মূল গায়কের শেষ কলিটি সমবেত কণ্ঠে তারস্বরে পরিবেশন করে, তেমনি এই দলের বাকি গায়কেরা গেয়ে যাচ্ছে, 'কাটিবার হয়, কাটিবার লাগে।' দলপতির বরাভয় : আর্টিস্টরা খারাপ পাইবেন না।

অসিত বললো, 'দল পৌঁছবার পর, বাস থেকে নেমে দেখি জীপগাড়ি, রিকশা করে অসংখ্য পাবলিসিটি গ্রুপ বেরোচ্ছে প্রচারে। এমন সময় আমাদের কানে এলো, 'সে এক ভয়াবহ ভয়ঙ্কর আঠাশ ফুট দৈত্য। আকাশ থেকে সে লাফিয়ে পড়বে আসরে। আলাদিনকে পিঠে নিয়ে উড়ে যাবে আকাশ-পথে। সুলতানী ফৌজের সঙ্গে শূন্য থেকে লড়াই করবে এবং নিমেষে এনে দেবে সোনার অট্টালিকা। আসুন, আলাউদ্দিনো আশ্চার্য্য প্রদীপ অবশ্য দেখিবার লাগে।' অসিত তাকায় শ্যামল ঘোষের দিকে, শ্যামল অসিত বসুর দিকে। দু' জোড়া চোখই ছানাবড়া। কিন্তু কোন সাহসে প্রতিবাদ করবে? কোচবিহারে বসে বায়না করার সময় দলের প্রতিনিধি কোন অস্ত্রে বধ করেছে এই নায়েককে, কে জানে। এটাও একটা অস্ত্র হতে পারে। নিরঞ্জন মুখ কাঁচুমাচু করে এসে দাঁড়ালো শ্যামল ঘোষের সামনে, 'অভয়বাবু দাদা এমনি করে আমাদের মারার আয়োজন করলো!'

বাসাবাড়ির ব্যবস্থা ভালো। দুই টপ শ্যামল আর অসিতকে দেওয়া হয়েছে একটি ডাকবাংলো। 'তোফা ব্যবস্থা। কোথাও ত্রুটি নেই। ভেরি আরাম-দায়ক বন্দোবস্ত।' অসিত বলছিলো, 'সারা দুপুর ঘুম এলো না দুশ্চিন্তায়। বিকেলের দিকে ঘুরতে গিয়ে দেখি বিশ হাজারী এক বিশাল প্যাণ্ডেল। আর তার মাঝখানে ব্রডগেজ স্লিপার দিয়ে বানানো হয়েছে আসর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অসহায়ের মতো তাকাই শ্যামলদার দিকে। শ্যামলদা বললো, আঠাশ ফুট দৈত্য লাফালে ব্রডগেজই তো চাই। ওপরে তাকাই প্রায় চল্লিশ ফুটের মতো হাইট। আমার নার্ভ পড়িপড়ি অবস্থা। শ্যামলদা তো তো তো তো করে বললো, 'আকাশ থেকে লাফাবে তো।' ভালো করে তাকিয়ে দেখি শ্যামলদার চোখেও ভয়ের তিতির নাচছে।

তখন কিছু বলতে যাওয়াই মূর্খামি। আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ পালার জীন তো সত্যি সত্যি আঠাশ ফুট নয়। কত হাইট হবে মৃত্যুঞ্জয় দে-র? বড় জোর ছ-ফুট। তাকে চারগুণ করলেও প্রচারিত দৈত্যের কাছাকাছি পৌঁছচ্ছে না। আসল সত্য প্রকাশ পেলে তখনই গান ক্যানসেল করে দিতে পারে নায়েক।

যাত্রা আরম্ভ হলো যথা সময়ে। প্যাণ্ডেলে পিন রাখবার জায়গা নেই। কনসার্ট বাজলো, নাচ হলো, পালা হলো শুরু, শেষও হয়ে গেলো নির্বিঘ্নে। গুরুদাস ছুটে এসে বললো, 'শ্যামলদা, দেখেছেন কী এ্যাপলজি?'

শ্যামল ঘোষ বললো, 'এ্যাপলজি মানে এ্যাপ্লজ। ডোণ্ট মাইণ্ড। তখনও বুঝতে পারিনি, সত্যি সত্যিই এ্যাপলজি নামক ঈশ্বর আমাদের দৃষ্টির অগোচরে হাসছে।'

'মরে যাবো। দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার…' গুরুদাস সদ্যোজাত পক্ষি-শাবকের মতো চিঁ চিঁ করে।

'কোথায় গেলো তোর বাপ আঠাশ ফুট দৈত্য?' বলার সঙ্গেসঙ্গে চুরাশি কেজি ওজনের এক থাবড়া।

'রাইটারে…রাইটারে · রাইটারে…' গুরুদাস হেঁচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'রাইটারে লিখেছে, অথরে কেটেছে…আমি কী করবো বলুন?'



রাইটার বলুন, অথর বলুন অথবা বলুন পালাকার কি ড্রামাটিস্ট—যাত্রা যখন নায়েকের এলাকায় ঢোকে তখন খোদ মালিক, মহান টপাটপী এবং প্রগতিশীল নির্দেশক সেখানে কালকের শিশু। একমোদ্বিতীয়ম ঈশ্বর তখন নায়েক। তা ছাড়া আছেন গণদেবতারা। আমি এমন প্যাণ্ডেলও দেখেছি যেখানে একজন অমত্তপ দর্শককেও খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। যাত্রা হবে কি, ঘন ঘন নাচ চাই। সিন ক্লাইম্যাকসে উঠি উঠি করছে হঠাৎ গণদেবতারা চেঁচিয়ে উঠলেন, নাচ চাই নাচ। বামপন্থী আন্দোলন গড়ার প্রতিজ্ঞায় সংকল্পবদ্ধ একটি দলের সঙ্গে আমার প্রিয়বর জুলেন্দ্র ভৌমিক গিয়েছিলো মফঃস্বলের এক অভিনয় আসরে। জুলেন্দ্র বলেছিলো, এ-দলটির শ্লোগান ছিলো নাট্যে গ্রামীন জীবন অবশ্যই প্রদর্শিতব্য। সুতরাং গ্রামের ওপর লেখা হয়েছিলো নাটক। অভিনয়ারম্ভে বোতল ভাঙার গান গাওয়া হলে গণদেবতারা মারমুখী হয়ে ওঠে, 'তেলের শিশি আবার ভাঙলে তোদের ভাঙা হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। প্যাণ্ডেলে আগুন।

অতো বিশদে নাই বা গেলাম। ১৯৬৭ সনে নাট্যভারতীর সঙ্গে এক আসরে উপস্থিত হই। ওখানকার এক ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয় বড় ফণিবাবু ও আমাকে। কিষাণবাবু তার যাত্রাকন্যা আরতিকে নিয়ে উঠলেন অন্য এক বাড়িতে। বাকি সবাই এক বাসা-বাড়িতে। দুপুরে রান্নাবাড়ি থেকে খাওয়া দাওয়ার পাট সেরে দু'জনে ঘুমোতে যাবো, বড় ফণিবাবু বললেন, 'এ এক বিচিত্র স্থান!'

'কী রকম?'

বড় ফণিবাবু বললেন, 'আজ রাত্রেই বুঝতে পারবেন কোন রাজত্বিতে এসে পৌঁছেছেন।'

রাত্রে পালা শুরু হবার আগে ঠিক আগে, দু' নম্বর ঘণ্টা পড়লো কি গুটিপাঁচেক স্যাঙাত নিয়ে এক ভয়াবহ মূর্তির আবির্ভাব। হ্যাঁ সাজঘরে। সে লোকটা যেমন চওড়া, তেমনি লম্বা। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, দু'টো চোখই সদ্য ফোটা টকটকে রক্তজবা। স্যাঙাতসহ সে অদ্ভুত দোলন দোলায় দুলছিলো। সোজা হয়ে কেউই দাঁড়াতে পারছিলো না। দেখলাম কিষাণবাবু মেয়েদের মেক্-আপ ঘরে ঢুকে পড়লেন। রাজেন মণ্ডল একছুটে গেলেন সেখানে। দলের সহকারী ম্যানেজার অনিল হঠাৎ স্ট্যাচু হয়ে গেলো। মনে হলো ওর চোখ দু'টি বুঝি এখনই কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে। ছোট ভোলা পাল, যাকে আমি ভোলেনাথ বলি—একটা বাক্সের ওপর বসে সে মেক-আপ করছিলো। হঠাৎ তাকে উঠতে দেখলাম।

আমি বসেছিলাম দল-ম্যানেজারের বিছানায়। দেখলাম সকলের মুখেই থমথমে আতঙ্কের ছায়া। ভোলেনাথ বোধ হয় আমার তাকানোর ভঙ্গি দেখে অনুমান করে থাকবে, আসল ব্যাপারটা আমি একদমই আঁচ করতে পারছি না। সুতরাং ও সোজা এসে বসলো আমার সম্মুখে। হাঁটু গেড়ে বসে মুখটা বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে। 'দিগম্বর সা…' ভোলেনাথ ফিসফিস করে বললো। বুঝতে না পেরে আমি ভোলেনাথের চোখে তাকাই। ও চোখ টিপে ইশারা করে, যেন মুখে কোনো শব্দ উচ্চারণ না করি। 'টেরর…' ফিসফিস করে ভোলেনাথ বললো, 'ডাকসাঁইটে মাস্তান। দেখছেন না মাল টেনে শালা স্বয়ম্ভু বনে গেছে?'

ভোলেনাথ বোধ হয় আরও কিছু বলতো। কিন্তু সে অবকাশ সে পেলো না।

হঠাৎ দেখি দাগী অপরাধীর মতো পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলেন কিষাণ দাশগুপ্ত। তাঁর মুখে বিনয় এবং ভয় মিলেমিশে গেছে। করজোড়ে পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছেন মাননীয় নায়েক দিগম্বর সা-র দিকে। পোশাকের কাজ শেষ না করা প্যাকাটির পুতুলের মতো এগিয়ে আসতে আসতে ঘনঘন নমস্কার করছেন। এই টেরিটোরির টেরর সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। তার টলোমলো স্যাঙাতদের সাহায্যে সে পতন থেকে রক্ষা পেলো। 'কিচাইনবাবু!' লোকটির কণ্ঠস্বর জড়ানো যেন ভেজাল সিমেণ্টের গাঁথনি আপনি আলগা হয়ে আসার মতো ঝরো ঝরো। 'বলুন।' জাঁদরেল দারোগার সামনে হাজির করা আসামীর মতো অবস্থা কিষাণবাবুর। হাত দু'টো তখনও প্রার্থনার ভঙ্গিতে এক-করা। ঘাড় ঘুরিয়ে কিষাণবাবু বললেন, 'গোপলা, বাক্সের ওপর চাদর পেতে দে।' কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বিনয় করার সিচুয়েশনে ফিরে যান 'বসুন স্যার, গরীব দলের সাজঘরে একটু উপবেশনের দয়া হোক।'

টেরর দিগম্বর সা ততক্ষণে একটা সিগ্রেট চেপে ধরেছে আঙুলে। এবং সেই সিগ্রেটটা যতোবার সে ঠোঁটে প্রেস করতে যাচ্ছে, ততবার ঢুকে যাচ্ছে নাকের ফুটোয়। কাঁপা হাতে লক্ষ্য স্থির থাকছেনা। হ্যাচ্চো শব্দে হেঁচেই ফেললো একবার। তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলো স্যাঙাত। গুরুর হাতটা চেপে ধরে সিগ্রেটটা যথাস্থানে প্রেস করতে চেয়েছিলো সে। কিন্তু দিগম্বর সা এক ঝটকায় তাকে ছিটকে ফেলে দিলো, 'হাট শালা, আমাকে মাতাল পেয়েছিস?' সিগ্রেট ধরা হাতে নিজের পঞ্চাশ ইঞ্চি বুকের থাতির ওপর দমাদম কয়েকটি থাবড়া মারলো, 'আমি শালা মদ খাই, মদ খাবে আমাকে? কভি নেই।' বুক থাপড়াতে গিয়ে সিগ্রেটটা দুমড়ে মুচড়ে পড়ে গেছে নীচে। কিন্তু আঙুল দু'টো তখনও চাপাই আছে। সেই আঙুল দু'টোই এগিয়ে এনেছে ঠোঁটের ওপর, 'আগুন দে।' মুখ ফসকে কথা বেড়োবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ স্যাঙাত পাঁচ পাঁচটি দেশলাই বাক্স এগিয়ে দিলো গুরুর দিকে। জোর থাবা মেরে একটা দেশলাই কেড়ে নিলো দিগম্বর সা। 'কিচাইনবাবু—'টলোমলো মাথাটাকে আয়ত্তে আমার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো। কিন্তু লাই পেয়ে মাথায়-ওঠা বউয়ের মতন আহ্লাদী মস্তক বেচারী কিছুতেই সোজা হচ্ছে না। 'নাচ দিচ্ছেন কটা?'

'নাচ!' কিষাণবাবু ধপাস করে যেন পড়ে গেলেন ভুঁইয়ের ওপর। 'সাবজেক্টটা দিগম্বরবাবু সিরিয়াস কিনা...'

'সিরিয়াস লাচ লাগান।'

'মানে—' কিষাণবাবু আতঙ্কে ঢোঁক গেলেন। খচখচ করে মাথা চুলকোতে থাকেন, 'মানে, মানে রিভলিউশনারি ড্রামা বলে...'

'ঠিক আছে।' দিগম্বর সা ততক্ষণে একটা দেশলাই কাঠি চেপে ধরেছে ঠোঁটে। তার আগাটা নাচছিলো। 'লাগান রিভার বেডিং লাচ।'

একজন স্যাঙাত একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে দিলো গুরুর দিকে। খপ করে দিগম্বর কেড়েও নিলো সিগ্রেটটা। হঠাৎ দেখি সিগ্রেটটাকে দেশলাই কাঠি মনে করে বারুদের ওপর মারতেই বারো আনা ভেঙে পড়লো মাটিতে। সেদিকে দিগম্বরের দৃষ্টি নেই। সে ভেবেছে বুঝি কাঠি জ্বলেছে। সুতরাং আগুনটা দু'হাতে আগলে নিয়ে যাচ্ছে মুখের কাছে।

কোন ফাঁকে অনিল সরকার ছুটে গিয়েছিলো আসরে, খোকা মল্লিকের কাছে। দেখি অসময়ের পরিত্রাতা খোকা মল্লিকের সদম্ভ প্রবেশ। 'কিছু ভাববেন না সা-সময়, লাচ হবে।'

'হবে?'

খোকা॥ আলবাৎ হবে। আপনার তো নাচেরই আসর। কিষাণদার মেয়ে আরতি? আরতি নাচবে সর্পনৃত্য।

'লাচবে?' দিগম্বর বোঁটা মোচড়ানো ফলের মতো ঝুলে-পড়া মথাটাকে তোলবার চেষ্টা করে, 'ব্যাটাছেলে না মেয়ে?'

খোকা॥ মেয়ে মেয়ে, যেমন খাসা দেখতে তেমনি প্রাণ জুড়নো নাচ।

দিগম্বর॥ ছোবল মারবে নাকি? আঁয়ি আবার···

খোকা॥ না না, সর্প নৃত্য একটা নাচের নাম।

'ব্যাস ব্যাস', মুখে বুরবুরি তোলে সাক্ষাৎ যম-সদৃশ দিগম্বর নায়েক। 'ভজন তুই লাচ লাগাও। ব্যাস পয়সা হজম, খেল ভি খতম।'

কিষাণবাবুর কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম জমেছিলো। এখন দেখি স্রোতের মতো তা নামছে। চোখ দু'টো ঠেলে উঠছে কপালের দিকে। হঠাৎ থরোথরো কাঁপন সারা অঙ্গে! এবং নিমেষে সটান পতন। 'জল জল' গাইয়ে ভক্ত মল্লিক চেঁচিয়ে উঠলো। একটা খবরের কাগজ নিয়ে খোকা মল্লিক হাওয়া করতে শুরু করে দিয়েছে। বড় ফণিবাবু, ভোলা পাল আধা মেক-আপ অবস্থায় বাক্স থেকে নেমে এলেন। মেয়েদের সাজঘর থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে এসে দাঁড়ালো জয়শ্রী

মুখারজি। একটা সায়া আর ব্রা-পরা অবস্থায় ছুটে এসে কিষাণবাবুর ওপর আছড়ে পড়লো আরতি। ডুকরে কাঁদতে শুরু করলো, 'অ কাকামণি গ—তুমি কোথায় আমাকে রেখে যাচ্ছ গ…'

সত্যি এই পৃথিবীতে আরতির আপন বলতে কেউ ছিলো কিনা, অথবা বর্তমান আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। থাকলে এতদিনের কোনো না কোনো দিন নিশ্চয় কাউকে দেখা যেতো। সমগ্র যাত্রাশিল্প জানতো, আরতির ইহকাল এবং পরকাল বলতে কিষাণবাবুকেই বোঝায়। কিষাণ দাশগুপ্ত তাঁর আবিষ্কার করা এই মেয়েটিকে নিজের বাসাতেই নিয়ে তুলেছিলেন শেষদিকে। সংসারেও সমাদর ছিলো আরতির। যাত্রাদলের একটি মেয়েকে ঘরে তুলে আনা নিয়ে পরিবারের অন্যান্য লোকের নানা মত থাকাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। অথবা কিষাণ-বাবুর নিজের দুই কন্যা এবং স্ত্রী এই পাতানো সম্পর্ককে কোন চোখে দেখতেন তাও আমাদের ছিলো অজানা। কিন্তু কিষাণবাবু যে সত্যি কন্যাস্নেহে আরতিকে লালন করেছিলেন তার সাক্ষী আমি নিজে। আপাতত ও-প্রসঙ্গ থাক।

কিষাণবাবুর অচৈতন্য দেহটা সকলে ধরাধরি করে লম্বার দিকে এককরা দু'টো বাক্সের ওপর শুইয়ে দিলো। মাথার নীচে রাখা হলো বালতি। জয়শ্রী কেটলি কেটলি জল ঢালতে লাগলো কিষাণবাবুর মাথায়। রাজেনবাবু আঁজলা-ভরা জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন অচৈতন্যের মুখে। খোকা মল্লিকের হাতে ততক্ষণে তালপাখা এসে গেছে। ই ই ই ই করে কেঁদে চলেছে আরতি। সীমা সরকার কিষাণবাবুর পা দু'টি জড়িয়ে ধরে মাথা ঠুঁকে ঠুঁকে কাঁদছে।

আকস্মিক কাণ্ডকারখানা দেখে আমার নিশ্বাসটাও আটকে গেলো বুকের কাছে। দাঁড়িয়ে আমি কাঁপছি। খোকা গামছায় চোখ মুছতে মুছতে বললো, 'বাড়ির কেউ দেখতে পারলো না দাদা!' ভোলেনাথ বললো, 'কপাল।' আমি অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে এই নরহত্যার নায়ক নেশাগ্রস্ত যমদূতের দিকে তাকিয়ে দেখি, সে সদলে হতভম্ব। জোঁকের মতন জড়িয়ে ধরা নেশা কখন যেন পালিয়ে বেঁচেছে। ওরা পালাই পালাই করছে। অনেকক্ষণ গলার কাছে আটকে থাকা কথাটা হঠাৎ মুক্তি পেলো, 'ডাক্তার।' সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকে ঢিল পড়ার অবস্থা। নায়েক-মশাইয়ের স্যাঙাতরা ভোঁ ভোঁ দৌড় মারলো, দিগম্বর সাও দেখলাম কেটে পড়লো। অবাক চোখে কাণ্ডকারখানাগুলো দেখছিলাম। তীব্র বেদনা কোথায় যেন চিরল পাতার মতো কাঁপছে। গলার কাছে যেন একটা ভারী বস্তু জমে

আছে। কিষাণবাবুর এই আকস্মিক পরলোক গমনের সংবাদ অফিসে আমার হাতে পৌঁছলে হয়তো আমিই লিখবো : তাঁর মহাপ্রয়াণে যাত্রাজগতে যে অভাব নেমে এলো তা পুরণ হবার নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে পড়লো, তাঁর থাকাতে না থাকাতে বাস্তবিক এই শিল্প প্রবাহের কিছুমাত্র লাভক্ষতি নেই। আমরা যাঁরা তাঁর গুণমুগ্ধ এবং অন্তরঙ্গ—কেবল তারাই দুঃখ প্রকাশ করবে, চিৎপুরে হয়তো চলবে শোকের অভিনয় কিন্তু পরদিন যেমনভাবে চলছিলো যাত্রাজগৎ তেমনিই চলবে। এ-দলের শিল্পীরা দল না চললে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার শোক করবেন মাত্র।

চিন্তানায়কদের অমোঘ বাণী দেখলাম মিথ্যে হবার নয় : রাখে কৃষ্ণ মারে কে? আমাদের সকলকে বিস্মিত করে হঠাৎ প্রায়-শব-হয়ে-আসা কিষাণবাবু সটান উঠে বসলো। মাথার জল গড়িয়ে প্রায় নেয়ে ওঠার অবস্থা তাঁর। খোকার হাত থেকে হাতপাখাটা ধাঁ করে কেড়ে নিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'হালার গবায় আমারে মাইর‍্যা ফ্যালাইবো দেহি।' বাক্সের ওপর থেকে একটা পোশাক টেনে নিয়ে খসখস করে গা-মাথা মুছে নিলেন, 'হালারা ভাগচে?' রাজেন মণ্ডল মাথা নেড়ে সায় জানালেন।



সাজঘরের অবস্থা তখন ধমক খেয়ে ভড়কে যাওয়া মানুষের মতন। আরতির কান্না থেমে গেছে, জয়শ্রী স্থানু, খোকা কাঠ, ভোলেনাথের চোখ দু'টো বিস্ফারিত। পালা হলে এখানে একটা জুৎসই গেট নেবার কথা ভাবতো ভোলা পাল। 'কনসার্ট' —কিষাণবাবু খোকার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন। খোকা একছুটে পালালো আসরের দিকে। আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে কিষাণ দাসগুপ্ত তাকালেন আমার দিকে, 'হালার পুতরে কেমুন লাচ লাচাইলাম কন? মারানীর পুতে কয় রিভারবেডিং লাচ? হালারে পাঠাইয়া দিলাম বৈতরণীর পারে।'

ঘণ্টা পড়লো, কনসার্ট বাজলো, শুরু হয়ে গেলো যাত্রা। আসরে যাচ্ছি, ভোলেনাথ বললো, 'কিষাণবাবুর গেটটা কেমন হলো দাদা ?'
আবার শুয়ে পড়লেন কিষাণবাবু। বললেন, 'পালা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার কিন্তু যাই যাই অবস্থা।'
বড় ফণিবাবু হাসলেন। রাজেন মণ্ডল তাড়াতাড়ি জলের বালতিটা ঠিক করে বসালো। বড়ফণিবাবু বললেন, 'দেখলেন এ্যাকটিং ?'

শৈলেশ গুহ নিয়োগীকে দিয়ে যখন 'এক দিনরাত্রে' লিখিয়েছিলাম, সেই সময়েই আমি মোটামুটি মনস্থির করে নিয়েছিলাম যে, 'আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ' পালার আকারে আসরে নামাতে হবে। ১৯৬১ সনে শোভাবাজার রাজবাড়ির যাত্রা উৎসবের সিম্পোজিয়ামগুলোতে আমি বলেছিলাম, 'যাত্রা মানুষের মধ্যেই আছে ঠিক, কিন্তু অতীতের সঙ্গে বর্তমান বা সমসাময়িক কালকে পালায় ধরতে না পারলে যাত্রার অস্তিত্ব আরও মুমূর্ষু হয়ে আসতে বাধ্য। যে-শিল্প জীবন-প্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারে তার গতি এই হয়। সুতরাং যাত্রায় আজকের সমাজ ও মানুষ, আজকের দুঃখ দৈন্য দারিদ্র্য সংগ্রাম আনন্দ বেদনা ব্যর্থতা সাফল্য যদি আসে তবেই এর অগ্রগতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। দেখতে হবে সকল প্রযোজনা, পালা পাণ্ডুরচনা, অভিনয় যেন পুরনো খাতে না বয়। বিষয় বৈচিত্র্য চাই, সহযাত্রী শিল্পমাধ্যম অর্থাৎ চলচ্চিত্র, পারমানেণ্ট ও গ্রুপ থিয়েটার, সার্কাস, ম্যাজিক—যে-শিল্পের যেটুকু প্রয়োজন ও গ্রহণযোগ্য, তা অবশ্যই নিতে হবে। বিদেশী কাহিনী ও জীবনকে আমাদের স্বাগত জানাতে হবে। কারণ যাত্রা হচ্ছে ম্যাস এডুকেশনের সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম। প্রতিবাদের ঝড় অবশ্যই উঠেছিলো। আমার সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র ব্রজেন্দ্রকুমার দে আমার বিপক্ষে বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিলো, এতে যাত্রার চরিত্র নাকি নষ্ট হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত ইছাপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পালা-সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে আমার সঙ্গে একমত হন। আমার ঠাকুর্দা যেহেতু বিদ্যাসাগরের চটি পরতেন, গায়ে দিতেন চাদর, খাটো ধুতি পরতেন—অতএব আমাকেও তাই পরতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকা মানেই সভ্যতার অগ্রগতিকে প্রতিহত করা। আমার যাত্রায় প্রয়োজনমাফিক যেমন মাইক, টেপ রেকর্ডার, স্বদেশী ও বিদেশী বাজনা আসবে, তেমনি আসতে পারে নানা বিষয়ও। ১৯৬২ থেকে এই বৈপ্লবিক

পরিবর্তনে নেমে পড়ে যাত্রা। বছর বারো নানা এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়ে দেখলাম, যাত্রা এতো বেশি সমাজ ও বাস্তব নির্ভর হয়ে পড়েছে যে, নাচ গানের দিকটা প্রায় উঠে যেতেই বসেছে। সুতরাং শৈলেশ গুহ নিয়োগীকে নিয়ে আসতে হলো অপেরা রিভাইভ্যাল করার জন্য। কী ভাবে সে এলো, এবং কী ভাবে 'এক দিনরাত্রে' বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করলো, সে প্রসঙ্গটি আপাততঃ উহ্য থাক। কলিকাতা যাত্রা সমাজ ও 'মরুতীর্থ হিংলাজ' প্রসঙ্গের কাহিনীটাও পরে বলবো।

আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ যাত্রা করার কথা আমি ভেবেছিলাম এ-কারণে যে, এখানে অপেরার সঙ্গে তাক লাগানো ম্যাজিক এবং চরম ফ্যানটাসি দেখানো যাবে। জাদুসম্রাট পি সি সরকারের ছোট ভাই এ. সি. সরকার আমার বিশেষে বন্ধুস্থানীয়। ওঁকে ডাকলাম। শুধোলাম চারপাশ খোলা জায়গায় কতগুলো ম্যাজিক দেখানো যেতে পারে। ওঁ আমাকে উনিশটি খেলার বিবরণী দিয়েছিলো। বাংলা চলচ্চিত্রের কানু মুখার্জিকে আমি দৈত্য সাজাবো ঠিক করলাম। আলাদীনের কাকার ভূমিকায় স্বয়ং এ. সি সরকারকে নামাবার চিন্তা করেছিলাম। 'আলাদীন' ও 'বুদুর' হবে নাচিয়ে গাইয়ে। কলিকাতা যাত্রা সমাজ-এর মালিক বীর সেনের সঙ্গে কথাও হয়ে গেলো। পালার নামকরণ করা হয়েছিলো 'অবাক প্রদীপ.' কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালাটি না হলো দেখানো, না অভিনয়।

আনন্দলোক দলের চন্দন মিত্রের এই বিষয়টির প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিলো। অবশেষে ওরিজিন্যাল নামেই ও বিজ্ঞাপন করলো। অসিত বসু প্রদীপ অপেরা থেকে ফিরে এলো চন্দনের কাছে, শ্যামল ঘোষ কলিকাতা যাত্রা সমাজ থেকে। পালা রচনার ভার পড়লো অসিতের ওপর। ঠিক হলো গরীবী রাজ প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেওয়া হবে। আমরা এখন সেই পালা অভিনয়ের একটি বিশেষ দিনের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। 'আলাদীন' সেজেছে শ্যামল ঘোষ, 'বুদুর' রীতা মুখারজি, 'বুদুরের পিতা' অসিত বসু, 'আলাদীনের কাকা' নিরঞ্জন ঘোষ, উজিরে আজম— কুমারেশ ব্যানারজি, 'তার পুত্র' শ্যামল দাস, 'দৈত্য' মৃত্যুঞ্জয় দে, আংটি দৈত্য নিখিল (উচ্চতা ২ ফুট ৩ ইঞ্চি) এবং 'বিলকিস বেগম' ছন্দা মল্লিক।

শ্যামল ঘোষ বললো, 'আ - ই—ই - ই…শব্দের একটা ভয়ঙ্কর জিগির উঠলো আসরে। যেন একদল লুটেরার উন্মত্ত উল্লাস। এখনই বুঝি গুরুদাসের

প্রাণটা দেহত্যাগ করে—এই ভেবে আর একবার প্রাণপণে চোখের পাতা বন্ধ করলো সাজঘরের শিল্পীরা। তারপর সব চুপচাপ। ভয়ে ভয়ে চোখের পাতা ফাঁক করে দেখি গুরুদাস তার বিছানাতে আধশোয়া অবস্থায় আধা-চিৎ। আর দৈত্যবৎ নায়েকের দল একসঙ্গে গলা বাড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গুরুদাসের দেহের ওপর। দৃশ্যটা ঠিক একদল নেকড়ের মানুষ নিয়ে খেলার মতন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেবল মূল নায়েক। তার হাতে যাত্রাদলের প্যাড। নিজের জামার বোতাম ঘরে গোঁজা পেনটা সে খুলছে। বোঝা গিয়েছিলো রক্ষ স্বয়ং রাখলেন গুরুদাসকে। নায়েকরা এবার ক্ষতিপূরণের খত লিখিয়ে নেবে গুরুদাসকে দিয়ে। তারপর শাস্তি।

মূল নায়েক ডিকটেশান দিচ্ছিলো: আমি শ্রী—'নাম কী?' গুরুদাস নাম বললো—গুরুদাস মজুমদার, পিতা শ্রী··'তর বাপ আছে?' গুরুদাস অবাক হয়ে তাকালো, 'মানে বাঁ্যাইচ্যা আচে?' গুরুদাস বললো, 'আছে'। 'নাম কী?' গুরুদাস নাম বললো—মহিমকান্ত মজুমদার, সাকিম—'লেখ'; থানা 'লেখ', জেলা 'লেখ' কলিকাতার আনন্দলোক দলের দল-ম্যানেজার সজ্ঞানে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় লিখিতেছি যে, নায়েক শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস এর সঙ্গে চুক্তি রক্ষা করিতে না পারায় এবং নায়েক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় ষোলো হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিলাম। যতক্ষণ এই টাকা শোধ না করিব, ততক্ষণ এই দল এবং দলের লোকেরা নায়েকের হেপাজতে থাকিবে। টাকা পরিশোধ করিলে নায়েক সবকিছু প্রত্যর্পন করিতে বাধ্য থাকিবেন।'

লেখা শেষ হলে রেভিনিউ স্ট্যাম্পের ওপর গুরুদাস স্বাক্ষর করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। মূল নায়েক খপ করে কেড়ে নিলো কাগজটা এবং লহমায় মেলে ধরলো চোখের সামনে। 'বাঁচা গেলো।' অসিত বললো, 'ওয়ার অব দি ওয়ার্লড শেষ। খাবারগুলো তখনও সামনে। মনে মনে ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি উচ্চারণ করে আলাদীনের কাকা নিরঞ্জনকে ডাকি। মেয়েদের সাজসজ্জার ঘেরাটোপ থেকে একটা ভীরু উত্তর আসে। 'চলে আয়—সব মিটমাট হয়ে গেছে।' কথাটা বোধ হয় ত্রিপলের বেড়া টপকে বাইরেও গিয়ে থাকবে। নইলে হঠাৎ পালার দৈত্য মৃত্যুঞ্জয় ত্রিপলের তলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেবে কেন? বললাম, 'আয়, মিলেমিশে খাই। খেতে যাবো এমন সময় আবার সেই বোমা: কাটিম। এবং সঙ্গেসঙ্গে গুরুদাসের ওপর পড়লো আধ কুইণ্টালী ওজনের এক

থাবড়া। ব্যস, সুরুৎ করে মাথা সরিয়ে হাওয়া হয়ে গেলো মৃত্যুঞ্জয়। নিরঞ্জনও নেই।'

'শালা ইতর।' লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো। 'তুই কী রে! কোন দেশের জন্তু! হয় তুই বাংলা লেখ, নয় লেখ হিন্দী, নয় সংস্কৃত, ইংরেজি যা খুশী। কিন্তু একটা ভাষা লেখ। একটা। নারায় ? আমার নাম নারায় ? বাপের দেওয়া নামটা শালা পালটে দিলি ? আবার লিখেছিস ক্ষিতিগ্রস্থ ? এটা কী র‍্যা ? এ্যাঁ, কোন দেশের ভাষা…… ?'

দশ

মহেন্দ্র মাস্টার বললেন, পাখি নাকি ফুরুৎ।

কোন পাখি, কেমন পাখি—মনে হতেই পারে এরকম প্রশ্ন, এবং কার পাখি—সম্ভবত সেটাও। কিন্তু আমি জানতাম সে-কালের বিখ্যাত সুরস্রষ্টা, এ-কালের নির্বাসিত মহেন্দ্র দত্ত মশাই যে-পাখির কথা বলছেন, সাদা চোখে তার ডানা দেখবার উপায় নেই। এ এক অন্য পাখি। এই জগতের বিভিন্ন মহলে পাখি নানা অর্থে ব্যবহৃত। আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ সুহৃৎ প্রদীপ গুহঠাকুরতা জলপাইগুড়ি ছেড়ে কলকাতায় আসার কিছুদিন পরেই একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটি মূলত ছিলো নাচ-গান, নৃত্যনাট্য পরিবেশনের প্রযোজক সংস্থা। নাম : সাংস্কৃতিকী। এদের নৃত্যনাট্য, নৃত্য-বিচিত্রা এবং সংগীতানুষ্ঠানের যশ অচিরে ছড়িয়ে পড়েছিলো চারদিকে। প্রদীপ বলেছে, তার সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন অনেক বিত্তশালী, সাংবাদিক এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা। এঁদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ জমিদারের উৎসাহই ছিলো বেশি। তিনি প্রতিটি মহলায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন এবং মহলার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। মাঝেমধ্যে প্রদীপের ডাক পড়তো তাঁর বাড়িতে। নানা কথার পর তিনি নিচু গলায় পাখি প্রার্থনা করতেন। বলতেন, 'আমার জন্য একটা পাখি নিয়ে এসো প্রদীপ। বেশ পুরুষ্টু টুরুষ্টু ডানা ঝাপটানো তেজী পাখি।' প্রদীপ বলেছে, তার দলের নৃত্যনাট্যে অনেক সুন্দরীরা অভিনয় করতে আসতেন। সুতরাং এই বৃদ্ধের আকাঙ্ক্ষিত পাখি বলতে সুন্দরী রমণীই মীন করতো।

আমি অবাক হয়ে তাকাই মহেন্দ্র মাস্টারের দিকে, 'পাখি!'

'হ্যাঁ, পাখি।' অশীতিপর বৃদ্ধ মহেন্দ্র দত্ত ততক্ষণে একটি বিড়ি ধরিয়ে টানতে শুরু করছেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'সেই যে বলেছিলাম মনিরামপুরের কথা? সেখানকার পাখি…'

স্মৃতি হাতড়াতে থাকি আমি। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছিলো না, মণিরামপুরের কোন ঘটনা কবে আমার কাছে পেশ করেছেন মহেন্দ্র মাস্টার। ধুত্তোর বলে মনেমনে স্মৃতির কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভাবতে বসি, মহেন্দ্র মাস্টার যদি পাখি অর্থে কোনো মহিলার কথা বলে থাকেন, তবে কোন সেই অভিনেত্রীর কথা বলছেন, যে মণিরামপুরে বাসা বেঁধেছে? মনে মনে মুখের মিছিল পার হই কিন্তু মনে পড়ে না।

'মাস্টারমশাই', মাথা চুলকোতে চুলকোতে ডাকি। চিন্তিত আমাকে বলতেই হয়, 'ব্যাপারটা ঠিক আমার কাছে…'

'উঠুন', মহেন্দ্র মাস্টার নিজেই উঠে দাঁড়াতে যান। 'এখনই যেতে হবে আপনাকে।' বলেই বসে পড়েন আবার। ফুকফুক করে বিড়ি টানেন। আমলেই আনেন না আমার কথা। 'গৌরাঙ্গ কাল আমার বাসায় লোক পাঠিয়েছিলো। গিয়ে দেখি মাথা চাপড়ে হা হুতোশ করছে। দোতলায় ওর শোবার ঘরে আমাকে ডেকে নিয়ে সব ঘটনা খুলে বললো। কাঁদছিলো। বললো, ওকে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে পাখিটা নাকি হাওয়া হয়ে গেছে। তারপর আমার হাত দু'টি ধরে অনুরোধ করলো, যেমন করে হোক ওকে যেন আমি বাঁচাই। আমি যেন আপনাকে হাজির করে দিই ওর কাছে।'

এতক্ষণে জট খুললো খানিকটা। গৌরাঙ্গবাবুর পারিবারিক সংকট যে ভয়াবহ, চিৎপুরী গুজবে তার আভাষ পেয়েছি অনেকবার। কিন্তু সব গুজবই ধ্রুবতারার মতো সত্য হয়ে ওঠে কি? পরে অবশ্য বিশ্বস্ত দু'একজন এ-কাহিনী বলেছেন আমাকে। যতদূর মনে পরে মহেন্দ্র মাস্টারও ওই সংকটের কথা পৌঁছে দিয়ে থাকবেন আমার কানে। কিন্তু চট্ করে বিশ্বাস করা যায় কি? গুজব আসলে বর্ষার আকাশের উড়ন্ত ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মতো। খানিকটা বারিধারা বর্ষণ করে সে উধাও।

মহেন্দ্র মাস্টার আপন মনে বলছিলেন, 'হবে না? সেই যে কথায় বলে আপনি আচরি ধর্ম—এখানেও তাই। তুই ব্যাটা অত বড় এ্যাকটর, এত বড় পজিটিভ (পজিশন) তোর কী দরকার তোর অমন ফস্টিনস্টিতে? আর তাই যদি করবি তবে এমন কিছু কি করা উচিত যাতে তামাম বিশ্বের লোক বুঝতে পারে ব্যাপারটা? না, উনি হলেন প্রেমিক লটবর। প্রেমের দাম দিতে দিতেই ফতুর। দিব্যি জায়গা জমি কিনে অট্টালিকা তুলে দিলেন

মেয়েটাকে। ব্যাস, আর কি চাপা থাকে? জানাজানি হয়ে গেলো সব…'

'মাস্টারমশাই', কথার স্রোতে বাধা দিই আমি। 'জানাজানির কথা বললেন তো? এই চিৎপুরের কে না জানে ব্যাপারটা? নিজের স্ত্রী পুত্র ফেলে ওই মেয়েটার বাড়িতে…'

মহেন্দ্রবাবু চুকচুক শব্দ করলেন মুখে। 'অসুখ বিসুখ হলে ঘরের লোকই তো জানতে পারবে সবার আগে। দল করতে হয় না ব্যাটাকে? চালাতে হয় না? এমনি করে প্রতি মরশুমে বাটজন সম্প্রদায় যদি চাক্ষুষ প্রমাণ পায়, দেখে ফেলে জব্বর প্রেমের গদগদ কারবার, তবে কেচ্ছার ঝড় উঠতে কতক্ষণ? কী বলবো আপনাকে…' মহেন্দ্রবাবু গলার স্বরটা চট করে নামিয়ে ফেলেন। আশপাশে কেউ নেই, তবু দেখেন, সত্যি কেউ কাছাকাছি আছে কিনা। এবং চাপা ফিসফিসে গলায় শোনান, 'গোটা দলটাতে কেবল ফুসুরফাসুর, হাসাহাসি, চিমটি কাটাকাটি। গরুটা ভাবে ওরা ছাড়া বাকি সবাই বুঝি বুদ্ধু, অন্ধ। দলের একটা সিসটম (সিস্টেম) আছে, এ্যাডমিনিস্টির (এ্যাডমিনিস্ট্রেশন) আছে। আপনি যাই বলুন…'

আমি যে কিছুই বলছি না সে কথাটা বোঝাবার জন্য বাধা দিতে যাই। কিন্তু তপ্ত, উত্তেজিত মহেন্দ্র সুরকারের উত্তরঙ্গ কথার স্রোত থামে না।

'ভেবেছিলো পার পাবে। তাই কি পায়? বিধাতার বিচার বলে একটা কথা আছে না? ব্যাস, তাই হলো। জ্যান্ত অভিশাপ নেমে এলো সংসারে। সতী সাধ্বীর চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো দিনের পর দিন। বছরের পর বছরও কাটলো; তারপর যা হবার তাই। দেবপুরুষ লীলাখেলা করে বেড়াবে আর দেবী বুঝি থাকবেন ধোয়া তুলসীপাতা? ওরে নরাধম, তাই কি হয়? ভগবানের বিচার নেই? বোঝ ব্যাটা, বোঝ ঠ্যালা। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। গেলো তো বৌটা…'

সুরকার মহেন্দ্র দত্তর অভিযোগ, নীতিবাক্য, পরামর্শ, বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমি ধরে নিয়েছিলাম, পাখি যদি সত্যি উধাও হয়েই থাকে তবে তো গৌরাঙ্গবাবু বেঁচেই গেলেন! কিন্তু এখন দেখছি হাওয়া অন্য পথে। পাখি অর্থে গৌরাঙ্গবাবুর দলের বউকে মীন করছেন না মহেন্দ্রমাস্টার, সরাসরি গৃহস্থ অঙ্গন ধরে টান মেরেছেন। তার মানে গৌরাঙ্গবাবুর ওরিজিন্যাল বউটাই পাখি? না হ'লে বউ

যাওয়ার কথাটা আসে কোত্থেকে। আমি অবাক হই, 'বউ যাওয়া সেটা আবার কেমন?'

মহেন্দ্রমাস্টার বিশাল মুখব্যাদন করে ফাঁ—আ করে হেসে ফেলেন। 'আপনি দেখছি সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে বলছেন লক্ষ্মণ কার দেওর!'

আমি গম্ভীর হতে চাই, 'গুজবে কান দেবেন না।'

মহেন্দ্রবাবু হেসে ওঠেন আবার। হাসতে হয় আমাকেও। হঠাৎ হাসি থামিয়ে দু'হাত জোড় করে ভক্ত-চরিত্রে অভিনয় করার মতন এ্যাকটিং শুরু করে দেন 'প্রভো, সর্বজ্ঞ আপনি এই অধমকে আর বিভ্রান্ত করবেন না।'

চা এলো, নড়েচড়ে বসলেন মহেন্দ্র মাস্টার। পেয়ালা পিরিচ হাতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই ধূমায়িত চায়ে দীর্ঘ এবং সশব্দ কয়েকটা চুমুক। তারপর ছোট ছোট ফুৎফাৎ। একটা বিড়িও ধরিয়ে ফেলেছেন এরই মধ্যে। তামাকের ধোঁয়া আর তপ্ত চায়ের মিঠে স্বাদে মুখখানিতে দেখলাম পরম পরিতৃপ্তির আভাষ। 'নেপোয় বাবু দই মারছে।' শূন্য চায়ের পেয়ালা টিপয়ে রাখলেন, 'আমি কিন্তু সুখ্যাত করি বউটার। বদলার মতন বদলা। বাড়ির চাকরের সঙ্গে......'

এবার ভাসাভাসা রহস্যটা স্পষ্ট হয়। আসল পাখির পরিচয় বেরিয়ে পড়ে। হলপ করে বলতে পারি, এই ঘটনাটা যদি পেতেন কোনো গল্প লেখক তবে অনায়াসে ফেঁদে বসতেন একটি জমকালো মনস্তাত্বিক গল্প। বছর পনেরো আগে পেলে আমিও বোধ হয় গল্প লেখার লোভ সংবরণ করতে পারতাম না! এখন মনে হয়, সব ঘটনাই গল্পের চেহারা নিতে পারে কিন্তু আর্ট হিসাবে গল্প গল্পের চাইতে কিছু ওপরের।

ঘটনা: সংসারধর্মে বিশ্বাসী এক কিশোরী একদিন নববধূরূপে গৌরাঙ্গের সংসারে প্রবেশ করেছিলো। ওর স্বামী তখন সাধারণ একজন মানুষ। ছোটখাটো ব্যবসা করেন। সংসারধর্মের টানটাও কিছু কম নেই। বিত্তের স্তূপ অবশ্যই জমেনি, খুব একটা অভাব ছিলো সে কথাও বলা চলে না। কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাবে কে? গৌরাঙ্গবাবু শখের যাত্রা থিয়েটার করতেন সুযোগ পেলেই। সেই সূত্রেই একদিন ভাগ্যের ঝাঁপি খুলে গেলো তাঁর সামনে। ডাক এলো চিৎপুর থেকে। একেবারে তরতাজা অফার। চিৎপুরী ভাষায় 'হিরোর পোস্টে জয়েন্ট' করলেন গৌরাঙ্গবাবু। অর্থাৎ জয়েন করলেন। বছর ছয়েকের মধ্যে অকুতো ফল। মানে প্রচুর সুখ্যাতি। পাঁচ বছরের মাথায় বাড়ি করলেন।

সাতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর জুটিয়ে দিলেন খরচের একটা পথ। ছপ্পর ফুঁড়ে দিয়েছিলেন বলেই নেবার একটা পাকা ব্যবস্থা তাকে করতেই হলো। গৌরাঙ্গবাবু জানতেন না, বিধি নিয়োজিত রেণুবালা রেণু রেণু করে নিতে নিতে একদিন তাকে সর্বস্বান্ত করবে।

ঘটনার কথা আপাতত শিকেয় তুলে রাখি। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম সম্পর্কে কিছু চিৎপুরী ব্যাখ্যা দেওয়া থাক। আমাদের বিজয়দা মানে বিজয় তথা তুর্জয় মিত্তির বলতেন, 'গুরু এ-কলা পূর্ণ চোষট্টি কলা নয়। এর নাম সিকি-কলা। একজন পুরুষকে কুপোকাত করতে মেয়েদের একটি পূর্ণ কলাও ব্যবহার করতে হয় না। আধ-খানা ব্যবহার করলেও ওভারডোজ হয়ে যায়। একটি কলার চারভাগের একভাগেই হালে পানি পাবে না। সটান শুয়ে পড়বে।

ওই সিকি কলার ব্যাখ্যা শুনতে চেয়েছিলাম বিজয়দার কাছে।

উনিশ শো বাষট্টি সাল। চীন ভারত যুদ্ধের কাল তখন। তেজপুরের ওধারে নাকি চীনা ফৌজ পৌঁছে গেছে। যুদ্ধ হচ্ছে প্রবল। হঠাৎ শোনা গেলো আসাম এবং উত্তরবঙ্গের সর্বত্র নাকি যাত্রাগান বন্ধ। পারমিশন মিলছে না কোথাও। এ-দিকে কোচবিহার হোটেল মশগুল হয়ে উঠেছে যাত্রার লোকে। জনা দুই মালিক, বেশ কিছু পরিচালক এবং দালালেরা দিব্যি অফিস জাঁকিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় বজ্রপাত। নবরঞ্জন অপেরার জীবন দাস গাড়ি করে সাত সকালে আমার বাসায় এসে উপস্থিত। কী ব্যাপার? না, বসতে হবে। খুঁজে বার করতে হবে সমাধানের পথ। সেদিনেই গোষ্ঠদা, গৌরদা, নারায়ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করা হলো, অগত্যা আমাকেই যেতে হচ্ছে উত্তরে। মাখনলাল নট্টও তখন ওই হোটেলে আছে। রাত্রে ট্রাঙ্ককলে জানতে পারলাম অবস্থা খুবই কাহিল। চারদিকে কেবল আতঙ্ক আর আতঙ্ক। একটা নায়েকের মুখও দেখা যাচ্ছে না সারাদিনে।

কিন্তু যাওয়া বললেই কি যাওয়া হয়? যুদ্ধক্ষেত্রটা বহুদূর হলেও, দিক হিসেবে তো উত্তরই। সুতরাং কোন স্ত্রী তার স্বামীকে উত্তরে পা দেবার পারমিশন দেয়! মহা দুর্ভাবনায় পড়লাম আমি। বেশ একটা জুৎসই কথা প্লেস করতে হবে সহধর্মিণীর কাছে। কী বলি কী বলি ভাবতে ভাবতে জট খুলে গেলো। আমি পাটনা যাচ্ছি বিহার আর্ট থিয়েটারের আমন্ত্রণে এই কথাই পেড়ে বসলাম। বিহার আর্ট থিয়েটারের অনিল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতার কথা

অজানা ছিলো না আমার স্ত্রীর। এবং ওখানে অতি সত্বর চীনাদের পৌছবার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেই অনুমতি মিললো।

কোচবিহার হোটেলে পৌছে দেখি প্রায় সকলের অবস্থাই কাহিল। বিজয়দা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। যাত্রা দলের মালিক ম্যানেজারদের হতাশা দেখলে পাষাণের চোখেও বুঝি জল আসে। হতাশ্বাসে হতাশ্বাসে এখানকার বাতাস ভারী। সারা দিন রাতে সত্যি একটি নায়েকের ছায়াও দেখা গেলো না।

পরদিন ছুটলাম আসামের রাজ্য সরকারের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। তখন ওখানে জনাব ফকরুদ্দীন আলি আমেদ-এর প্রভাব প্রতিপত্তি সর্বাধিক। অতি কষ্টে একটা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পেলাম। সাত মিনিটের। যাত্রাশিল্পের দুরবস্থার কথা বলতে যেতেই আগুন হয়ে উঠলেন আমেদ সাহেব। চীনারা প্রায় ঢুকে পড়েছে চৌহদ্দির মধ্যে। এই দুঃসময়ে কিছুতেই যাত্রাগানের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় এ-কথাই তিনি জানালেন আমাকে। আমি যত যুক্তি খাড়া করি তত বিরক্ত হন মহাশয়। ফিরে যাবো? তাই বা কী করে হয়। যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার মানুষের অন্নের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে অত সহজে ফিরে আসা সম্ভব নয়। অনেক অনুনয় করে ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলো শুনতে অনুরোধ জানাই আমেদ সাহেবকে। ততক্ষণে একুশ মিনিট পার হয়ে গেছে। বাঘের মতো মানুষটা কী ভেবে কে জানে রাজি হলেন। আমি বললাম, যুদ্ধাতঙ্ক সত্যি ভয়াবহ সংক্রামক। যত দূরেই যুদ্ধ হোক দেশবাসী ভাবে যে কোনো সময় এই যুদ্ধের বলি হবেন তাঁরা। সুতরাং সর্বাগ্রে মানুষের মনোবল ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা দরকার। ক্রমবর্ধমান আতঙ্ক থেকে মুক্ত করতে পারলে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

এতক্ষণে বোধ হয় আমেদ সাহেব একটু নরম হলেন। কী ভাবলেন। বললেন, 'তার মানে তুমি কি বলতে চাও ঢালাও যাত্রা হলেই আতঙ্ক পালাবে?'

'নিশ্চয়।' জোর গলায় আমি বলি। 'আনন্দ যদি বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধাকে ভুলিয়ে দিতে পারে তবে যাত্রা অন্তত বহু মানুষের মন থেকে যুদ্ধাতঙ্কের ভূত ভাগাতে পারবে। তা ছাড়া আপনি তো জানেনই, আসামবাসীরা যাত্রার প্রচণ্ড ভক্ত।'

গোলগাল, গম্ভীর এবং রাগে তপ্ত মুখটায় অল্প প্রশান্তির আঁচ দেখলাম। বললেন, 'কাল এসো। আমি একটু ভাবি, পরামর্শ করি।'

পরদিন ওঁর খাস কামরায় ঢুকতেই সহাস্য অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, তাঁর

সরকার যাত্রাগানের ঢালাও অনুমতি দিচ্ছে। 'কী?' আমার চোখে চোখ রাখলেন, 'খুশী তো?'

আনন্দে হাত বাড়িয়ে দিলাম। বাঘের মতন লোকটা বিশাল থাবার মধ্যে তুলে নিলেন আমার হাতটা। ঝাঁকুনি দিলেন।

ফিরে আসার পর কোচবিহার হোটেলে বিরাট জয়োল্লাস। বিজয়দা ভোজের আয়োজন করলেন। ভোজন পর্ব সমাধার পর গল্পের আসর। সেখানেই উঠলো সিকি-কলার প্রসঙ্গ। বিজয়দা বললেন, এক গ্রামে এক রাগী কৃষক ছিলো। সাত-সকালে উঠেই সে বেরিয়ে পড়াতো চাষের কাজে। ফিরে আসতো ভর দুপুরে খেতে। এবং সকালের রুটিনের মতো প্রত্যহ মাঠ থেকে ফিরে বউ পেটানো ছিল তার নিত্যকার ডিউটি। কারণে অকারণে ছুঁতো-নাতায় ভর দুপুরে সতী নারীকে করতো লাঞ্ছনা। বছরের পর বছর এই ধোলাই সহ্য করে যখন আর পারছিলো না, তখন প্রতিবাদ করলো বউটি। আর যায় কোথায়, কৃষক রেগে তেতে জবাফুল। ঘরের বউ হয়ে স্বামীর মুখের ওপর কথা! 'কী করবি তুই! মারবি?' হাতের কাছে পাওয়া একটা কাঠের চ্যালা নিয়ে এগিয়ে এলো কৃষক। 'আয়, দেখি তোর কোন বাবা তোকে বাঁচায়?' বউ রেগে বললো, 'সাবধান, বাপ মাকে ধরে টেনো না।' কৃষক তেমনি গলা চড়িয়ে বললো, 'একশোবার করবো। ছিঁড়ে খাবো তোর চৌদ্দ পুরুষকে।' বলেই ধপাস করে আস্ত চ্যালাটা সটান বসিয়ে দিলো মহিলার পিঠে। মহিলা ঝটিতি বটিখানা তুলে শ্মশানকালীর মতো এগিয়ে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। কাঁদছিলো। সখেদে বললো, সতীনারীর নাকি স্বামীর গায়ে হাত তোলা উচিত নয়। তাই হাত পা বাঁধা। কিন্তু হ'লে কি হবে মহিলাদের কাছে এমন অস্ত্র আছে যা ব্যবহার করলে পুরুষের টিকি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। চাষী বললো, 'ঘণ্টা আছে। অবোলা মেয়েরা হচ্ছে পোষা গরুর মতন। তাদের কান্না ছাড়া আর কি আছে?' মহিলা বললেন, ঈশ্বর প্রদত্ত চৌষট্টি কলায় তারা সিদ্ধ। চাষী বললে, চৌষট্টি কেন হাজার কলাতেও একগাছা চুল তোলা যাবে না। মহিলা বললেন, 'তা হ'লে শোন। একজন পুরুষকে শিক্ষা দিতে সিকি কলাই যথেষ্ট।'

ব্যাস বাজি হয়ে গেলো স্বামী-স্ত্রীতে।

পরদিন কৃষক লাঙল নিয়ে মাঠে চলে গেলে তার বউ ভাসুর-পোকে ডাকলো।

বছর বারো তার বয়স। একটি টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে কাকী বললো, মাঝিদের কাছ থেকে বেশ বড়সড় একটা ইলিশ কিনে আনতে। আট আনায় মিলে গেলো আড়াই সেরী একটা তাজা ইলিশ। কাকী বললেন, তোর কাকা খেতে আসার সময় হয়েছে। এই ফাঁকে ছুটে যা জমিতে। সেখানে জোয়াল বাঁধা গরুগুলি দাঁড়িয়ে আছে, এবং যেখানে লাঙলের মাথাটা থেমে আছে মাটির তলায়, তার ঠিক আধ হাত সামনে পাথালি করে পুতে আসবি মাছটাকে। গর্তটা হবে আঙুল ছয়েকের মতো।'

আট আনা পয়সার লোভে ছেলেটি কাকীর নির্দেশ মেনে কাজ করে ফিরে এলো। চাষী বৌ-পেটানোর পর যথরীতি খাওয়াখাদ্যি করে গেলো মাঠে। চেপে ধরলো লাঙলের বাঁট।। হেঁট হেঁট করে তাড়া দিতেই গরুরা ছুট করে যেই এগিয়েছে অমনি মাটির তলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো একটি চকচকে রূপালী ইলিশ। দেখে চাষীর চোখ ছানাবড়া। হাল-জোয়াল ফেলে মাছ হাতে সে দৌড়ে ফিরে এলো বাড়িতে। চিৎকার করে বলতে লাগলো তার জমিতে নাকি ইলিশ ফলেছে। অবস্থা দেখে বউ মুচকি হাসলো মাত্র। চাষী বললো, 'বেশ ভালো করে পাঁচ বেনুন রেধে রাখ, রাত্রিতে জমিয়ে খাওয়া যাবে।'

মহিলা সত্যি পাকঘরে যত্ন করে ভাঁজাভুজি ঝোল অম্বলে পাঁচ বেনুন রেধে ঝাপ বন্ধ করে দিলো পাকঘরের। এবং বারান্দার উনুনে ভাতে ভাত চাপিয়ে বসে থাকলো। চাষী ফিরে এলো সহাস্য বদনে। গোয়াল গাছি ঠিকঠাক করে, স্নান সেরে এলো খেতে। স্ত্রী আসন পেতে রেখেছিলেন বারান্দাতেই। স্বামী খেতে বসতে ভাতে ভাত বেড়ে দিলো। চাষীর অবস্থা তখন রাগী শুওরের মতন। 'আমার মাছ!' মহিলা আকাশ থেকে পড়ার ভান করে, 'মাছ!'

চাষী।। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাছ।

স্ত্রী।। মাছ পাবো কোথায়?

চাষী।। তার মানে। আমার চাষে ফলা বিরাট ইলিশটা যে তোকে দিয়ে গেলাম!

সশব্দে হেসে উঠলো মহিলা, 'চাষে আবার মাছ ফলে নাকি?'

যেই না বলা, লোকটা শিকারী নেকড়ের মতন লাফিয়ে পড়লো স্ত্রীর ওপর। বাঁ হাতে শক্ত মুঠোয় ধরলো বউয়ের চুলের গোছা। ডানহাতে প্রহারেন ধনঞ্জয়। ওই ভয়ঙ্কর প্রহার সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী এই প্রথম চিৎকার করে কেঁদে

উঠলো। সে জানতো এতক্ষণে কৃষক প্রতিবেশীরা সকলেই ফিরেছে বাড়িতে। সুতরাং চেঁচাতে শুরু করলো, 'বাঁচান, আমাকে মেরে ফেললো। হায় হায় আমার কী হলো গো, আমার স্বামী পাগল হয়ে গেছে ...।' পরিত্রাহি ওই চিৎকার শুনে ছুটে এলো পড়শীরা। জোর করে ছাড়িয়ে নিলো স্বামীকে। লোকটা তখনও চেঁচিয়ে যাচ্ছে' 'আমার চাষে ফলা বিরাট তাজা ইলিশটা তুই নির্ঘাৎ সেটে দিয়েছিস। বার কর, আমার চাষের মাছ শিগগীর বার কর...।' পড়শীদের উদ্দেশ্যে কৃষক পত্নী বললো, 'কী আবোল তাবোল বকছে দেখুন। চাষে কি কখনও মাছ ফলে?' চাষী আরও চিৎকার করে। বলে 'আলবাৎ ফলেছে। এই মাগীটা জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা বলছে। আমার লাঙলের ফলার মুখ থেকে ঝপাং করে একটা ইলিশ বেরিয়ে এসেছিলো দুপুরে। আমার ক্ষেতের ফসল...'

প্রতিবেশীরা উন্মত্ত চাষীকে বেদম প্রহার করে। এবং হাত পা বেঁধে ফেলে রেখে যায়। লোকটি রাগে দুঃখে বেদম প্রহারে কাহিল হয়ে ভাবতে থাকে, জমিতে ফলা মাছটা আসলে সত্য না স্বপ্ন।

খানিক পরে স্ত্রী এসে স্বামীর গলায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করে। এবং এক এক করে বাঁধন খুলে দিয়ে পাকঘরে নিয়ে যায়। চাষী অবাক হয়ে দেখে সেখানে ঠাঁইপিঁড়ি পাতা এবং ইলিশ মাছের পঞ্চ বেন্নুনসহ পাত সাজানো।

অবাক হয়ে কৃষক স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়, 'এ-সব কী?'

মুচকি হেসে স্ত্রী বলে, 'কেন সেই সিকি কলা।'



ঘটনা: অভিনেতা গৌরাঙ্গবাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর যে বিরোধ তা কোনোদিন প্রকাশ্য ঝগড়া, বিতর্ক বা মারামারির পর্যায়ে পৌঁছেছিলো কিনা সে কথা মহেন্দ্র মাস্টার বলেন নি। কিন্তু বারবার আমার মনে হচ্ছিলো, বিপথগামী স্বামী এবং

সতীসাধ্বী স্ত্রীর মধ্যে এই নিয়ে বাকযুদ্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। পাপ আর পারা কোনোদিনই শেষ পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা যায় না—এটাই নাকি জাগতিক নিয়ম। তাই যদি সত্য হয়ে থাকে তবে আসর থেকে আসরে ঘোরা যাত্রা দলের মধ্যে গৌরাঙ্গ-রেণুবালা প্রেমপর্ব নিশ্চয় পাথর চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। এবং তা কোনো না কোনোদিন নিশ্চয় গিয়ে পৌঁছে গিয়েছে যথাস্থানে। কথায় বলে নারীরা জলজ্যান্ত স্বামীকে তুলে দিতে পারে যমের হাতে কিন্তু কোনো মহিলাকে নৈব নৈব চ। সুতরাং দলের খবর দলের কীর্তি কাহিনী লোকমুখে যদি চলে এসেই থাকে গৌরাঙ্গবাবুর অন্দরমহলে, তখন কী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে স্ত্রীর মধ্যে ? হয় তিনি মরিয়া হয়ে উঠবেন এবং এই নিয়ে শুরু হবে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ—নয়তো সাক্ষীপ্রমাণসহ আসামী ও দয়িতাকে হাতেনাতে ধরে ফেলার পর আক্রমণের ব্যূহ রচনা করবেন।

মহেন্দ্র দত্তকে এ-নিয়ে প্রশ্ন করে বিব্রত করিনি। তবে মোটামুটি এ-ধরনের একটি দৃশ্য কল্পনা করতে পারছিলাম। গৌরাঙ্গবাবুর স্ত্রী যদি প্রকাশ্য সংঘর্ষে অবতীর্ণও হয়ে থাকেন, তবে তা নিশ্চয় ছিলো হঠাৎ জ্বলে-ওঠা লকলকে অগ্নিশিখার মতন। তারপর সব চুপচাপ। মহিলা নিশ্চয় মানসিক দ্বন্দ্ব ও অশান্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে এক স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মহেন্দ্রমাস্টার ঘনঘন মাথা ঝামটাচ্ছিলেন। যেন কিছু ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছেন মাথা থেকে, 'ছিঃ ছিঃ ছি !' তাকালেন আমার দিকে। সুড়ুৎ করে এগিয়ে আনলেন মাথাটা, 'কী বলবো আপনাকে, বেহায়া বউটা শেষকালে একটা চাকরের সঙ্গে ···'

চরম ক্লাইম্যাকস ! বলে কি লোকটা। মনে মনে পিছলে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করলাম আমি, 'চাকর···'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, রমানাথ।'

'রমানাথ।' অজান্তে উচ্চারণ করি নামটা। 'কিন্তু শুনেছিলাম যে, ছেলেটি গৌরাঙ্গবাবুর আপন দাদার ছেলে !'

'মজাটা তো সেখানেই।' মহেন্দ্রমাস্টার কিলবিল করে উঠলেন যেন, 'ধুলো। চারপাশের চোখে ধুলো দেবার একটি সাবেকী পদ্ধতি। আসলে ওটা ছিলো দলের চাকর। এসেছিলো অল্প বয়সে। বছর কয়েক দল আর বাড়ি করতে করতে ব্যাটা কায়েম হয়ে বসে গেলো অন্দর মহলে। সংসারের জেনারেল

ম্যানেজার আর কি। এখন বুঝতে পারছি না কে কাকে ম্যানেজ করেছে। এবং কী ম্যানেজ করেছে।'

সরাসরি তাকালাম মহেন্দ্র মাস্টারের দিকে। কারণ রহস্যটা ছালুনের মতো দরদর হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত···, 'গৌরাঙ্গবাবু জানতেন না?'

'জানতো জানতো, আলবাৎ জানতো। গরু মরলে আকশের শকুন জানতে পারবে না?' পকেট হাতড়ে বিড়ি খুঁজছিলেন মহেন্দ্রমাস্টার। নেই। আমি সিগ্রেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিই। মুখময় প্রশান্তির ছটা ফুটে ওঠে মহেন্দ্রবাবুর। আয়েস করে একটা সিগ্রেট ধরায়। প্রাণপণে টানে।

'যেমন করে ওর কেচ্ছা ঘরে এসে পৌঁছোচ্ছিলো, তেমনি করেই ঘরের নরকের গন্ধ পেয়েছিলো ও। তাছাড়া সেই যে একটা কথা আছে না: হিন্দু যদি মোছলমান হয় তবে সে হয় গরু খাওয়ার রাক্কস। ঠিক তেমনি পরকীয়া প্রেমের ভূত যদি একবার চড়ে বসে ঘাড়ে, তবে তা বাড়তে বাড়তে এমন স্তরে পৌঁছে যায়, যখন লাজলজ্জা বলে কিছু থাকে না। পাপের প্রতি একটা মোহ থাকে না? ওই মোহই বুঝতে দেয় না পাপীর চলাফেরা, কর্মকাণ্ড অন্যের চোখে দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে।'

বিজয় মিস্ত্রির বলেছিলেন, 'বিবাহিত মেয়ে কি পুরুষ আসলে সোঁদর বনের মানুষখেঁকো বাঘ। একবার মানুষের রক্ত পেটে গেলে আর রক্ষে নেই। তারপর খালি মানুষের খোঁজ আর মানুষের খোঁজ।' একদিন অগ্রগামী দলের গদীতে বসে প্রসঙ্গটা উঠলো। বিজয়দা বললেন, 'ফেলে-ছড়িয়ে এই একটা জীবনে আমি হাজারটা আফার পেয়েছি। এ বলে এসো, ও বলে এসো— তেতাল্লিশটা বছর ওই টানাটানির মধ্যে কেটে গেলো। ঘোমটার আড়ালে শালা জ্যান্ত বাঘিনীর দল। ছুঁলেই জানবে ছত্রিশ ঘা। এই সব দেখেশুনে না, বিয়ের শখটা পালিয়ে বাঁচলো। কে বলতে পারে শালা, আমার বউটাও চান্স পেলে অন্যের ল্যাঙটে হাত দেবে না। তবে হ্যাঁ, আমি না হয়ে যদি অন্য কেউ হতো, তবে তাকে হাড় কখানা রেখে স্বর্গে পালাতে হতো।'

বিজয় মিস্ত্রিরকে শুধিয়েছিলাম, বিয়ে না করার অটল প্রতিজ্ঞাটা কি শুধুমাত্র এই কারণেই? গৌরব এবং কৃতিত্বের একগাল হাসি হাসলেন বিজয়দা। মুখের কষ দিয়ে পিছলে বেরিয়ে পড়া পানের পিক জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে চমচম চমচম শব্দ করলেন মুখে! তারপর একটা চোখ বড় করে, অন্যটা ছোট করে অদ্ভুত

কায়দায় তাকালেন, 'সে অনেক ব্যাপার।' অগ্রগামীর সরকার হারু মজুমদার ছোট্ট একটা কথার ঢিল ছুড়ে মারলো, 'শুনলাম ল্যাণ্ড খেয়েছিলেন!' বিজয়দা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'খামোস।' তারপর কণ্ঠস্বর নামিয়ে আনলেন খাদে। সে এক অদ্ভুত মডিলিউশনের নমুনা, সঙ্গে বাচন-প্রতীক মুখভঙ্গি। হঠাৎ দেখলাম উদাসী বৈরাগী বাবার সৌম্যতা নেমে এলো বিজয় মিত্তিরের মুখে, 'বিবেকানন্দকে দেখেছিস? বিলেকে?' আমরা নীরব, অবাক। 'এই বান্দা দেখেছে সেই মহাপুরুষকে। সর্বত্যাগী এক মহান পরিব্রাজক। যেই না দেখা, ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা। বিবাহ? কভি নেহি।' আবার অন্য ধরনের এক এমফ্যাসিস। লহমায় একপ্রেশন চেঞ্জ। হরিদ্বার থেকে সটান চিৎপুরে প্রত্যাবর্তন। 'তা ছাড়া খিতখিতে অভিজ্ঞতার কথা তো আগেই বলেছি।'

জনতা অপরার সিঙ্কিং প্রোপ্রাইটর প্রফুল্ল রায়, যাকে আমি ভলিরাম বলে ডাকি, সে বললো, 'কোথায় আর বললেন দাদা। একটা ঘটনা নমুনা অন্তত দিন।'

'তবে শোন।' বিজয় তথা দুর্জয় মিত্তির পরনের ধুতিটা হাঁটুর ওপর কাচিয়ে নিয়ে আয়েস করে বসলেন। বললেন, 'সে বছর রঞ্জন অপেরা আমার হাতে। বায়না ধরতে গেছি তুরা পাছাড়ে। সে বড়ো কঠিন নায়েক। পৃথিবী টলে তো নায়েক নড়ে না। ব্যাটা কারবারীর কারবারী। গেলে আদর, যত্ন-আত্তির শেষ নেই। খাওয়াবে, ছেলের মতন পরম যত্নে ঠাঁই দেবে অন্দর মহলে। কিন্তু গাহনা চুক্তির টাকার কথা বললেই শালা সটান সাধু বনে যায়। তা আমি দেখলাম, দিন চারেক যখন বসতিই যাচ্ছে দলটার, গদাই গানের মতো যা পাই তাই লাভ। লাইনটাও ছিলো ঠিক। তাই ভাবলাম দিই খাপিয়ে। কিন্তু বায়না নামা লিখবো কি, খাই দাই ঘুমোই—কর্তা বাড়ি ফিরলে এগিয়েও যাই—ব্যাটা এমন প্যাঁচ মারে যে লাইন টপকে নিয়ে যায়। আসল কড়িকাঠে ঘাড় পাতে না। একদিন বেশ চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খেয়ে ভর-দুপুরে দিয়েছি এক টানা ঘুম। হঠাৎ ঘুম পাতলা হয়ে এলো। গালের ওপর গরম গরম ভেজা ভেজা কী যেন লাগলো! হঠাৎ দেখি নীচের ঠোঁটটাও কেমন রবারের মতন ছোট বড় হচ্ছে। তাকিয়ে দেখি, ওমা! এযে কর্তার ছোট-গিন্নি গো! গায়ে ভুরভুর করছে আতরের গন্ধে। আমাকে জাপটে ধরে মহিলা শুয়ে পড়েছে পাশেই। যত বলি ছাড়ুন, তত বাঁধন শক্ত হয়। কেমন অবশ অবশ আনন্দ

সারা গায়ে। হঠাৎ মনে পড়লো গুরুর মুখ। বিবেকানন্দের নাম স্মরণ করে ঝটিতি উঠে পড়লাম। বললাম, 'এ কী ধরনের ব্যবহার আপনার! স্বামীপুত্রে সুখের সংসার আপনার মাগো...' ভদ্রমহিলা দপ করে জ্বলে উঠলেন, 'তুই আমাকে মা বললি মুখপোড়া বাঁদর? মেয়ে হলে বুঝতি এই দেহটার কী জ্বালা। সাধে আমি শুতে আসিনি...'



'ও ব্যাটাও তো লাইনেরই লোক। স্ত্রীর গতিবিধি বুঝতে পারবে না তাকি হয়?' মহেন্দ্র মাস্টার বললেন, 'ঠিক ধরতে পেরেছিলো ব্যাটা। কিন্তু এগোলেই বিপদ। ও জানতো কিছু বলতে গেলে স্ত্রী সহজে ছেড়ে দেবে না। চেঁচিয়ে যদি স্বামীর গুণকীর্তন শুরু করে দেয় তখন এ্যাও গেলো, অও গেলো।'
'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, গৌরাঙ্গবাবু এই ব্যাপারটা সানন্দে মেনে নিলেন?' 'সানন্দে না ছাই। ঠ্যালায়, ঠ্যালায়। ঠালায় পড়ে মানতে হলো। ওই যে সংস্কৃতে একটা কথা আছে না 'অর্ধং ত্যজতি...? তাই। ও দেখলো যেমন চলছে, চলতে থাক। তাতে অন্তত ওর নিজের ফুর্তিফার্তার পথটা খোলা থাকে।'
মহেন্দ্র মাস্টার বললেন, 'সেই থেকে বাড়ি আসার পর্বটা কমে গেলো গৌরাঙ্গের। দল কলকাতা এলে রেণুর ওখানেই উঠতো, থাকতো। মরশুম শেষ হলে অবশ্য ফিরতো বাড়িতেই। কিন্তু খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম সেই একখানেই। কারণ, বাড়ির তিনতলায় ওঠার অধিকার ছিলো না গৌরাঙ্গের। বউ ওকে আলাদা করে দিয়েছিলো দোতলায়; তিনতলায় সন্তান সন্ততি আর ওই ছোকরাকে নিয়ে মৌজে দিন যাপন করতে লাগলো বউটা।' থামলেন মহেন্দ্র মাস্টার। বললেন, 'নিন চটপট তৈরি হয়ে নিন। সকাল সকাল পৌঁছনোই ভালো।'
'তৈরি!' আমি অবাক হই। অথচ অবাক হবার কথা নয় আমার। সুরকার

মহেন্দ্র মাস্টার তো আমাকে নিয়ে যেতেই এসেছেন। আসলে এই কাহিনী শুনতে শুনতে আমিই অন্য একটা জগতে পৌঁছে গিয়েছিলাম। মহেন্দ্র মাস্টার কথিত ফেরার পাখি, গৌরাঙ্গবাবুর বঞ্চিতা স্ত্রীর প্রসঙ্গ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো।

স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ চরমে পৌঁছনোটা এ-জগতে নতুন কিছু নয়। বহু পবিত্র সম্পর্কে ফাটল ধরেছে এর জন্যে, বহু সম্পর্কের অবসানে দুই অর্ধাঙ্গ আবার পূর্ণ অবয়ব পেয়েছে। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না, তিনতলায় তরুণ হৃদয়েশ্বরের উষ্ণ প্রেমে তপ্ত পরম সুখে বাস করা এই মহিলা কোন কারণে সংসার ত্যাগ করলো! আমি যতদূর জানি গৌরাঙ্গবাবু বাইরে যত লীলাতেই মত্ত থাকুন না কেন, সংসারে কোনো অভাব রাখেন নি। সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থের একটা মোটা অংশ তুলে দিয়েছিলেন স্ত্রীর হাতে। অট্টালিকাবৎ বসতবাটিটা পর্যন্ত স্ত্রীর নামে। মহেন্দ্রবাবু বলেছেন, হাজার তিনেক টাকা তিনি প্রতি মাসে সংসারে দেন। তার হিসাবটা পর্যন্ত কোনোদিন চান না স্ত্রীর কাছ থেকে। তবে কি কোনো মানসিক বিকার গ্রাস করেছিলো মহিলাকে? চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের উদগ্র শরীর-ধর্ম নামক নেশাকে পরিতৃপ্ত করতেই কি ওকে টেনে নিয়ে গেলো সংসারের বাইরে? অথবা মহিলা এমন কথাও তো ভাবতে পারেন, সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো। সমাজ ও জগতের হাজার হাজার চোখের ড্যাবডেবে কৌতূহলী দৃষ্টির বাইরে পুত্রবৎ দয়িতকে শয্যাসঙ্গী করে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে পরম স্বস্তিতে?

আসলে বলা কঠিন, কোন কারণে কী হয়। গোটা জগৎটাকে মায়া বলে মেনে নিলে কী হয়? দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার সতত শ্রবণ করার পরে দেখি আশ্চর্য, মানুষের মিছিল সেই অনিবার্য আকাঙ্খার পথ ধরে হাঁটে। হাঁটতে বাধ্য হয়। তার মানে কি এই যে, আমাদের জীবন একটা পচা জলের সমুদ্র! যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ কেবলই সাঁতার। সাঁতরে সাঁতরে সে কোন পরপারে পৌঁছতে চায়? ঠিক তখন আমার সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে মনে পড়লো 'সত্য কেবল বাঁচা এবং বাঁচা, সত্য কেবল পশুর মত মনের বালাই ঝেড়ে ফেলে বাঁচা…'

ঠিক ওই মুহূর্তে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি আর একটি ঘটনার কথাও। জানিনা ঈশ্বরের কারসাজি কিনা। কিন্তু একটার পর একটা

অভিজ্ঞতার পিছল পথে কেন হাঁটতে হয় মানুষকে বুঝি না। একি অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, শিক্ষা নাকি এই আগুনেই বারবার পুড়ে খাঁটি হওয়ার পরীক্ষা!

তখন ফাল্গুনের প্রথম দিক। যাত্রার বাজার দারুণ রকমের চড়া। এমন এক বিকেলে শ্রীমান মাধব এসে উপস্থিত। ও একটা বড় দলের জি. এম। মানে জেনারেল ম্যানেজার। অফিসে বসে কাজ করছি, মাধব সোজা এসে পেন্নাম ঠুকে দাঁড়ালো। তাকিয়ে দেখি বেচারীর মুখচোখ একেবারে শুকনো। কেমন মিয়নো মলিন হাসি হাসলো কষ্ট করে। ইশারায় বসতে বললাম ওকে। বসেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলো মাধব। 'কিছু বলবি?' আমার প্রশ্ন শুনে ও চমকে উঠলো, যেন জলন্ত একটা বাল্ব হঠাৎ ফিউজ হয়ে গেলো।

'খুব বিপদ।' মুখটা কেমন কাচুমাচু হয়ে গেলো ওর, 'আপনাকে আজই একটু দলে যেতে হবে।'

'গান কোথায়?' কলম রেখে সোজাসুজি তাকাই।

'মেদিনীপুরের কাছেই।'

'সর্বনাশ!' আৎকে উঠলাম আমি। 'এখন বেলা চারটে। ঘণ্টা পাঁচেক তো লাগবেই।'

'চার ঘণ্টা', ও বললো। 'সুফল গাড়ি চালাবে—আপনার ভাববার কিছু নেই।'

'গান কটায়?'

'সাড়ে আটটায়।'

'বাসায় একবার খবর না দিয়ে···'

'আসার সময় সে-পাট চুকিয়ে এসেছি। গাড়িতে রবি বসে আছে। দলে আমি লোকও পাঠিয়ে এসেছি।'

আমি তখন অন্য কথা ভাবছিলাম। আসলে সত্যিকারের বিপদ, নাকি এই ছুঁতোয় যাত্রা শোনাবার মতলব! কিন্তু স্পষ্ট মনে করতে পারলাম, ওদের যাত্রা আমার অনেক অগেই দেখা। বললাম, 'দলে গোলমাল চলছে নাকি?' মাধব বলল, 'প্রায় সে-রকমই।' অবাক হয়ে শুধোই, 'আগে বললি ভয়ানক বিপদ, এখন বলছিস প্রায় গোলমালের মতন—ব্যাপারটা কী?'

'গুরুতর।' মাধব অপ্রস্তুতের মত বললো। 'এটা মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন দাদা।'

'আমি গেলেই সব মিটে যাবে?'

'যাবে।' কেমন অন্যমনস্ক গলায় বললো মাধব। তারপর হঠাৎ টেবিলের তলায় রাখা আমার পা জোড়া জড়িয়ে ধরলো। 'আপনি না গেলে আমার মালিকের আত্মহত্যা ছাড়া পথ থাকবে না।'

অগত্যা উঠতে হলো। রবি সিকিউরিটিতে দাঁড়িয়েছিলো। গাড়ি ছাড়লো চারটা পঁয়ত্রিশে।

বম্বে রোডে পড়ার আগে পর্যন্ত শ্রীমান ম্যানেজার আসল ব্যাপারে এলো না। উলটো পালটা কথা। আগামী মরশুমে তার এ-দলে থাকাটা উচিত হবে কিনা। যেতে হলে কোন দলে যাওয়া উচিত। আমি যেন ওর জন্য একটা ভালো জায়গা বেছে রাখি ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকি একই জায়গায়। মানুষ কোন কোন কারণে আত্মহত্যার-সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং মাধবের মালিকইবা হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছে বারবার সে কথাই মনে পড়ছিলো আমার। বম্বে রোডে গাড়ি পড়লে শ্রীমান মাধব তার মালিকের ওই সিদ্ধান্তের পেছনে যে রহস্য লুকনো আছে সেই অন্ধকার ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলতে লাগলো।

দল মালিকের দ্বিতীয় পত্নী স্বয়ং দলের হিরোইন। তার বয়স কম, দেখতেও সুন্দরী – দোষের মধ্যে স্বভাবটা কিছু চপল। ভালো গায়, ভালো অভিনয় করে। যাত্রার হিরোইনদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলে সবার আগে দৃষ্টি লুফে নেবে মীরা। কারণ তার দেহ সৌষ্টব অনুপম। ডাগর দু'টি চোখের ঘন নীল তারায় সাগরের উত্তাল তরঙ্গ। পুষ্পকোরকের মতো পাতলা চিবুক, বোগেনবালিয়ার খোলা পাপড়ির মতো থরোথরো অধরোষ্ঠ দেখলে মনে হয় খাজুরাহোর ভাস্কর্য থেকে তুলে আনা কোনো হিল্লোলিত রমণী মূর্তির দেহে বুঝি প্রাণের সঞ্চার করা হয়েছে। পিঠময় ছড়িয়ে পড়া ওর এক মাথা কোকড়ানো দীর্ঘ চুলের অরণ্যে মুখ লুকোবার আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করা খুবই কঠিন। মাধব মুখটাকে মধ্যরাত্রির প্রাক বর্ষণ আকাশের মতো থমথমে করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো, 'মীরা মরেছে দাদা।'

'মরেছে!'

'মানে…' মাথা চুলকোতে থাকে মাধব। তারপর একটা দামী সিগ্রেটের প্যাকেট খুলে আমার দিকে এগিয়ে দেয়। 'বিবাহিত রমণীর অন্যত্র মজে যাওয়াকে তো মরাই বলে দাদা। বলে না?'

আমি জবাব দিই না, দিতে পারি না। কিছু পুরনো স্মৃতিকে স্মরণে আনতে পারি। মীরা যখন যাত্রায় আসে তখন ওর বয়স ছিলো বোধ হয় পনেরোর

কাছাকাছি। অত্যন্ত চপল। চঞ্চল হরিণীর মতো সে অস্থির। কাব্যি করলে বলা যায়, ঝড়ের আগের নীল আকাশে হঠাৎ ছিটকে আসা এক টুকরো মেঘের মতো। নিজে স্থির থাকে না, থাকতে দেয় না কাউকেই। মাধব বললো, ঘটনাটা ঘটেছে এ-মরশুমেই। নামকরা হিরোকে টপ করে দল করেছেন মালিক। হিরো আর হিরোইনের দিকে তাকিয়ে লিখিয়েছেন সংগীতবহুল প্রেমের পালা। আসরে আসরে যেমন হচ্ছে যশ তেমনি আদায় বিদেয়। হঠাৎ দেখা গেলো গোটা আকাশটা কালো মেঘে ছয়লাপ। প্রথম প্রথম ফাঁকফুঁক, আড়াল-আবডালে লুকনো ছিলো ব্যাপারটা। এখন নাকি ওদের দু'জনের লাজ-লজ্জার বালাই নেই।

'কবে ধরা পড়ে প্রথম ?'

'মাস দেড়েক আগে।'

রবি আর মাধব ছিলো সামনের সীটে। পেছনের গোটা সীটটা আমার জন্য—যাতে আমি আরামে আয়াসে যেতে পারি। মাধবের কথায় বাধা দিলো রবি, 'ঘটনাটা দাদা অনেক দিনের। ফিসফিসে গুজবে চিৎপুর গুলজার। আমার কানে এসেছে তা প্রায় মাসে আড়াই হয়ে গেলো।' রবি মাধবের দিকে তাকায়, 'দাদা সবই জানেন।'

'তা হবে—', শ্রীমান মাধব অসমর্থিত সায় জানায়। 'প্রায়ই আমার মালিককে উদাস উদাস দেখতাম। তারপর দেখলাম কথায় কথায় রেগে যেতে। আরও পরে ভীষণ খিটখিটে স্বভাবে পেয়ে বসলো ওকে। এখন নীরব থাকে। কথা বলে না। থেকে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস নেয়। মাস খানেক আগে আমাকে বলেছে ব্যাপারটার কথা।'

আমি ইচ্ছে করেই কথা বলি না, সাড়া দিই না। মাধব বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। বোধ হয় প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার চেষ্টা করে। হতাশ হয়ে অবশেষে বলে, 'আমি আসতে বলেছিলাম আপনার কাছে। কিন্তু আসবে কোন মুখে, কোন স্পর্ধায় ? তাই আমিই…'

বিক্ষত মানুষটার অন্তর স্বরূপ কল্পনায় ধরতে চেয়েছিলাম। অধিকারবোধ আর লোভ দুইই বোধ হয় খুব কাছাকাছির। আগে শামুকের আকার নেয়, পরে কেড়ে নিতে চায় হাউই-এর ঊর্ধ্বগতি। বাধা পেলেই মুস্কিল। সেতো সত্যিকারের হাউই নয় যে ফেটে যাবে। তার আগুনটা ভেতরেই জ্বলতে থাকে। শ্রীমান

মাধবের মালিক বিবাহিত হয়েও যেহেতু আর একটি কিশোরীর পানিপীড়ন করেছিলো একি তারই শাস্তি ?

মাধব বললো, সে নাকি সরাসরি একদিন এ-কথা বলেছিলো মীরাকে। মীরা মুখের ওপর সরাসরি জবাব দিয়েছে, 'আমার পক্ষে ফিরে আসা আর সম্ভব নয়।' আমি উত্তেজনা অনুভব করি, 'দল বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিলো।' কথাটা ধমকের মতন শোনালো আমার কাছেই। মনে হলো এই ধমকের সুর মাধবকে এলোমেলো করে দিলো। ও থই পাচ্ছিলো না। মিনমিন করে বললো, 'অনেকগুলো টাকা ঢালা হয়েছে··'

'আসছেও তো অনেক।'

মাধব॥ হ্যাঁ, আসছে।

আমি॥ তবে ?

আবার চুপচাপ।

বম্বে রোড ধরে ঝড়ের বেগে এ্যামবাসাডার গাড়ি চলছে। স্পিডোমিটারের কাঁটা পঁচাশি আর নব্বইয়ের মধ্যে ওঠানামা করছে। স্টিয়ারিংয়ে দেখি মৃদু কাঁপন। সুফল ওই গতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। দারুণ বাতাস আমার মাথার চুল নিয়ে আলুথালু খেলা খেলছিলো এতক্ষণ। এবার সে ধারালো শীতের শর বসিয়ে দিতে লাগলো শরীরে। অগত্যা তুলে দিলাম জানলার কাচ। কম্ফর্টারে গলা জড়িয়ে কোটের শেষ বোতামটা লাগাই। জায়গাটার নাম বোধ হয় পেত্নীখোলা। শ্যামচক ছাড়িয়ে অল্প কিছু দূর। আটটা একচল্লিশে গাড়ি গিয়ে পৌছলো প্যাণ্ডেলে। সাজঘরে ঢুকে দেখি মেক-আপ-এর আসন পাতা হয়ে গেছে। টিনের ছোট ছোট মেকআপ-বক্স দেওয়া হয়েছে সামনে এবং বেশির ভাগ আসনের পাশে রাখা হয়েছে একজোড়া করে পদাবরণ। দু'একজন খুচরো শিল্পী আয়না সামনে নিয়ে চাদরে গা ঢেকে গুম হয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে বিচিত্র ভঙ্গিতে দেখছে নিজের মুখটা। এদিকে দুই সারি বাক্সের মাঝখানের এক চিলতে ফাঁকা জায়গায় মশারি টাঙিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে দল-ম্যানেজার।

মাধবের হাঁকডাকে ভীরু ব্যস্ততা দেখা দিলো। ধড়মড়িয়ে উঠেই মশারি গুটিয়ে ফেললো। এবং নিজের বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে আমার বসার জায়গা করে দিলো। ওদিকে ইনস্ট্যাণ্ট কফির কৌটো নিয়ে দৌড়ে বাইরে গেলো একজন

চাকর। বিস্কুট, কাজুবাদামের প্যাকেট এবং এক বাক্স সন্দেশ রাখা হলো আমার সামনে।

দেখলাম আস্তেআস্তে ডানদিকের পরদা ঠেলে এক এক করে ঢুকছে শিল্পীরা। সকলের মুখেই ঘুমঘুম ,ফালাফোলা ভাব। হঠাৎ দেখি ওরা আসছে।

ওরা মানে দলের নায়ক-নায়িকা। হাত ধরাধরি করে মস্করা করার মুড নিয়ে ওদের সাজঘরে প্রবেশ। ভালোই হয়েছে, ওরা জানতে পারেনি, আমি এসেছি। দেখতেও পায়নি আমি উপস্থিত রয়েছি সাজঘরে। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই ছিটকে সরে গেলো দু'জন। দু'মুহূর্তের একটা স্থির-চিত্র। তারপর হঠাৎ অচল একটা পুতুল সচল হলো। হাসিহাসি মুখ করে এগিয়ে এলো শ্রীমতী হিরোইন ; এসেই একটা পেন্নাম। পা-ছোঁয়া হাতটা মাথায় বুলিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলো মীরা, 'ভালো আছেন দাদা ?'

'আছি।'

'বৌদি আর ছেলেমেয়েরা ?'

'তারাও।'

'কখন এলেন ?'

'আধঘণ্টা খানেক হবে।'

'মাধবদা,' মীরা মাধবের দিকে তাকালো, 'দাদার কফি বানাতে দিয়েছ ?'

মাধব মাথা নেড়ে সায় জানালো।

'আমি তা হ'লে মেক-আপে বসছি দাদা। আমার আবার নাচ থেকেই শুরু।' মীরা চট করে মেয়েদের মেক-আপ-এর ঘেরাটোপের মধ্যে নিজেকে লুকোতে পেরে যেন বেঁচে গেলো।

কাচের ছোট গ্লাসে গরম কফি হাজির। কফি খেতে খেতে আমি হিরোর দিকে তাকালাম। সে বেচারী বাক্সের ওপর বসে দরদর করে ঘামছে। তাকাচ্ছে না আমার দিকে। তাকাতে পারছে না। এখন কেউ যদি ওর মুখটা তুলে ধরে তা হ'লে দেখা যাবে দীনেনকুমারের ফর্সা টকটকে মুখখানিতে কেউ যেন আবীর গোলা জল ঢেলে দিয়েছে। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর আমি বুঝলাম, হয় দীনেন ধরে নিয়েছে আমার আসার কারণ, নয়তো সাজঘরে ঢোকবার কথা ভেবে লজ্জা ঢাকবার পথ পাচ্ছে না।

এর মধ্যেই সাজঘর জমজমাট। এক এক করে সব শিল্পীই আসছে। কেউ

কুশল শুধোচ্ছে আমার, কেউ আমার পরিবারের সকলের। সবাই মেক-আপে বসলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। দীনেন পাশ-তাকানোর মতন দৃষ্টিতে দেখে নিলো আমাকে। বেচারা হিরোকে একটু স্বস্তি দিতে না পারলে ওর পক্ষে অভিনয় করা দূরে থাক, মেক-আপ করাই মুস্কিল। আস্তে করে পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম সবগুলো দৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়লো এখানে। দীনেন আচমকা কিছু ভেবে না পেয়ে আয়নার মধ্যে নিজেকে দেখতে শুরু করলো। আলগোছে হাতটা কাঁধে রাখতেই বুঝলাম সারা শরীর দিয়ে চমকে উঠলো ও। যেন হঠাৎ দেখতে পেয়েছে আমাকে তেমনি অভিনয় শুরু করলো - 'দাদা!' আনন্দে জড়িয়ে ধরে আর কি! সঙ্গেসঙ্গে লম্বা পেন্নাম, 'কলকাতায় গেলেই যাবো যাবো ভাবি কিন্তু এমন সময় হাতে থাকে না যে দেখা করি।' আরও কাছে সরে আসে অপ্রস্তুত নায়ক, 'মঙ্গলবার সকালে বাসায় থাকবেন দাদা?'

যদিও জানি, মঙ্গলবার কেন, এ-মরশুমের কোনো বারেই দীনেন আমার বাসায় যাবে না। দেখা পাওয়া যাবে না ওর। তবু বলি, 'থাকবো।'

দীনেন॥ আমি কিন্তু যাবোই দাদা।

আমি॥ যাস।

দীনেন॥ অনেক কথা আছে আমার।

অনেকটা স্বাভাবিক হয় দীনেন। দামী সিগ্রেটের দামী কেসটার মুখ খুলে দেয়, 'আমার একটা সিগ্রেট আপনাকে খেতেই হবে।'

এই অন্তরঙ্গতা এই শ্রদ্ধার অভিনযটা কেন, কেনই বা এতো উচ্ছ্বাসের ঢেউ বুঝতে কষ্ট হয় না। আমি, একটা সিগ্রেট নিই। ও লাইটার জ্বেলে এগিয়ে দেয়। আমি সিগ্রেট ধরাই। একমুখ ধোঁয়া ছাড়লে দেখি দীনেন পূর্ণ স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে। ও ধরেই নিয়েছে তৎক্ষণিক এই অভিনয়টার গূঢ় অর্থ বোধ হয় আমি ধরতে পারছি না। যেচেই আমি হাতটা তুলে দিই ওর কাঁধে। ও আমার মুখের দিকে তাকায়। চট করে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলি, 'একটু ওভার এ্যাকটিং হলো না রে?' দীনেন বোকার মতন হাসে। আমি ওর মাথার চুলগুলো নেড়ে দিয়ে বলি, 'মেক-আপ শুরু কর। অভিনয় না জমলে তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো কিন্তু।' হাসতে হাসতে পরদা ঠেলে এগিয়ে যাই আসরের দিকে।

রাত দশটায় আরম্ভ হয়েছিলো পালা। মাধব জানালো, দল-মালিক অনেক

আগেই পৌঁছে গেছে। রয়েছে বাসাবাড়িতে। তার ইচ্ছে খাওয়া-খাড়ির পাট চুকে যাবার পর যেন আমি বিচারে বসি। অভিনয় চলাকালীন মাঝে মধ্যে আমাকে চিমটি কাটছিলো রবি। পালা যখন শেষ হলো তখন রাত একটা বেজে তেইশ মিনিট। রান্নাবাড়ি থেকে খেয়েদেয়ে আসতে বাজলো পৌনে তিনটা। তিনটা দশের সময় হিরোইনকে ডেকে পাঠালাম। দেখলাম স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই এসে হাজির। ড্রাইভারকে আগেই সরিয়ে দিয়েছিলাম। মাধব আর রবিও আমার নির্দেশ মতো গরহাজির। ওরা সামনের সীটে বসলো। আমি পেছনের সীটে বসে সিগ্রেট ধরালাম। ভাবছিলাম কোথা থেকে শুরু করবো।

কাছাকাছি কোথাও রাতজাগা পাখিরা কলরব করে উঠলো। তারপর নিঝুম নিস্তব্ধতা। তিন দিকে গাঢ় ঘন তমিস্রা, মাথার ওপর উন্মুক্ত আকাশ। অসংখ্য তারার আলোকমালা ওখানে। অল্প দূরেই গ্রাম। কোন দূর অঙ্গনে কুকুর কাঁদছিলো। দূর অদূর থেকে অন্যান্য কুকুর সাড়া দিলো।

অস্বস্তিকর এই শব্দ ভাঙলো মীরাই। 'আপনি একটু আরাম করে বসুন দাদা। বালিশ আনিয়ে দিই··· ?'

'না রে,' জোর করে দরদ আনতে চাই গলায়। 'তোর সঙ্গে জরুরী কয়েকটা কথা সেরে গাড়ি ছাড়বো। যাওয়ার সময় ঘুমিয়ে নিলেই হবে।'

একটু নড়েচড়ে বসলো মীরা। সবে পাটভাঙা তাঁত-শাড়ির খসখস আওয়াজ শুনতে পেলাম। গাড়ির কাছাকাছিই প্যাণ্ডেল। ওখানে এখনও কিছু আলো আছে। বাসে মাল তুলছে চাকরেরা। ভাড়া দেওয়া প্যাণ্ডেল গুটনোর কাজ শুরু করে দিয়েছে ডেকোরেটরের কর্মীরা। সুতরাং ওদিক থেকে আসা অস্পষ্ট আলোর রোশনি গাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। এই অস্বচ্ছ আলোতেও আমরা তিনজন তিনজনের ছায়ামুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। সবে মেক-আপ তোলা মীরার মুখখানা এখন পবিত্র গঙ্গাজলের মতো। ভীরু উদ্বেগকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে মীরা। কিন্তু পারছে না। অন্ধকারে ওর স্বামীর গোলগাল মুখখানা হারিয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে দু'টি চোখ না জবাফুল ?

'বলুন,' মীরা আয়েস করে বলতে চাইলো। জবাব দেবার প্রস্তুতি।

আমি ॥ যা জিজ্ঞেস করবো তার সত্যি জবাব দিবি তো ?

মীরা ॥ দেবো।

আমি ॥ চিৎপুরে অনেকেই অনেক কথা বলেছে তোদের সম্পর্কে। আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ আসরে বসে যা দেখলাম তাকে অবিশ্বাস করি কী করে ?'

মীরা ॥ কী দেখলেন ?

আমি ॥ শুনলে তুই খুশী হবি না। পালাটা তো আগেও আমি দেখেছি। কিছু সিচুয়েশনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিস তোরা। স্পষ্ট ধরা পড়েছে আমার চোখে। ফার্স্ট এ্যাকটের ফোর্থ সিনটার কথাই ধর না, যেখানে হাত ধরলেই যথেষ্ট, সেখানে অতো জড়াজড়ির অর্থ—'ইচ্ছে করেই কথাটা অসমাপ্ত রাখি। সরাসরি তাকাই, 'সত্যি করে বল দেখি, আমি কি ভুল দেখেছি ?'

একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। মীরার। 'সত্যি।' ও যেন অনেক দূর থেকে উত্তরটা দিলো। একটু চুপচাপ। দেখি পাশে বসে ওর স্বামী অন্ধকারে বিড়ি টানছে। ওই আগুনে লোকটির ফোলাফোলা মুখ এবং কুতকুতে চোখ দু'টি দেখা যাচ্ছে।

'আমি দাদা বুঝতে পারি না কিছু। যত সরে আসতে চাই, ও আমাকে তত টানে। রাত্রে বিবেকের সঙ্গে লড়াই করি। মনেমনে শক্ত হই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই আমি সংকল্পে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। ওকে দেখলে মনের ভেতরটা আমার কেমন যেন আকুলিবিকুলি করতে থাকে। দেখামাত্র আমার সব ভুল হয়ে যায়। কে আমাকে যেন ঠেলে পাঠায় ওর দিকে। তখন দাদা আমার মধ্যে আর আমি থাকি না। অতীত বর্তমান সবকিছু মোছামোছা ঝাপসা হয়ে যায়। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না আমি...'

শুনতে শুনতে কোথায় যেন হারিয়ে যায় আমার মনও। কোন দূরে, কোথায়—কে জানে। পর মুহূর্তে ভাবি আমি বিচারক। কিন্তু মাধব যে বলেছিলো, তার মালিক আত্মহত্যা করবে—পাশে বসে ওঁর স্ত্রী যা বলছে তার পরেও কেমন করে একজন স্বামী এমন নির্বিকারভাবে বিড়ি টানতে পারে ? মনের দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে দিই। আমি বিচারক। 'কিন্তু এটা অন্যায়। তোর স্বামী-সন্তান রয়েছে, সংসার আছে—তাদের প্রতি স্ত্রী হিসেবে কি মা হিসাবে একটা কর্তব্য তো তোর আছেই। অস্বীকার করতে পারিস ?'

'না।' মীরা ঘাড় গুঁজে রয়েছে। এতক্ষণে মুখ তুললো, 'আছে বলেই বোধ হয় পুরোপুরি ঝাঁপ দিতে পারছি না।'

আমি ॥ যেখানে তুই ঝাঁপ দিতে চাস, ভেবে দেখেছিস সেটাই কি খুব নিরাপদ

জায়গা? দীনেনের নিজেরও তো সংসার আছে। ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে সুন্দর সংসার।. তোকে ও কোথায় রাখবে? কী সম্মান দেবে? সন্তানেরা যখন বড় হবে, তখন…'

মীরার গলা ভারীভারী শোনায়, 'আমার সকল বাঁধন দাদা কেমন আলগা হয়ে গেছে। মনে বল নেই। ও আমাকে অবুঝ নেশায় মাতিয়ে দিয়েছে। ওকে দেখলে কেমন একটা তপ্ত উত্তেজনা শিরশির ক'রে আমার শরীরে বয়ে যায়।' মীরার গলায় কান্নার আভাষ। 'আমি, আমি আর ফিরতে পারবো না দাদা।' হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে মীরা।

আমি শক্ত হই, 'ফিরে আসতে তোকে বলবো কিনা সেটাও তো ভাবতে হবে। তুই যদি মন স্থির করে থাকিস, বলে কোনো লাভ নেই। আগুনে ঝাঁপ দেওয়া পিঁপড়ে দেখেছিস? ওরা হয়তো জানে মৃত্যুর কথা, অথবা জানে না—কিন্তু মরে। তুই যদি মীরা তাই চাস, আমার কিছু বলার থাকবে না। কিন্তু আধপোড়া হয়ে যদি তোকে বাঁচতে হয়? মোহ কাটলে যদি সরে দাঁড়ায় দীনেন?'

মীরা ।। ও বলেছে, সরে দাঁড়াবে না।

আমি ।। এই প্রেমের তুই দাম দিস?

মীরা ।। স্থায়ীওতো হতে পারে।

এবার আমি উত্তেজিত হই, 'তোকে আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি মীরা, তোকে তো নয়ই, দীনেনকেও আমি যাত্রা করতে দেবো না। দীনেনকে বল, সে তোর কী ব্যবস্থা করে দেখি। আমি বলছি, শেষ পর্যন্ত, তোর গতি ওই…'। ডুকরে কেঁদে উঠলো মীরা। কাঁদছে। অস্ফুট ফোঁপানো কান্নায় দুলেদুলে উঠছে ও। ওর পাশে বসেই ওর স্বামী সংসারের সার, দারাপুত্র পরিবার তুমি কার— বুঝে নির্বিকারভাবে বিড়ি টেনে যাচ্ছে। লোকটা যদি সাধু হয়ে থাকে, তবে ওর তুলনায় বড়ো সাধক হতে পারে না, আর যদি অন্য কিছু হয়…

মীরা বসার সীটের মাথায় কপাল গাল ঘষে ফাঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। ওর পাশে কদাকার স্বামী। সংসার সমুদ্র মন্থন করে মীরা পেয়েছে জমাট বাঁধা অন্ধকার। জীবনে প্রদীপের আলোর মতন একটু প্রেম, প্রকৃত আত্মদানের এক চিলতে ভূমি… আমার চোখ দুটো কেমন ছলোছলো হয়ে এলো। মনের ওপর নেমে এলো ভারী অজানা পাথর। এই নিঃসাড় অন্ধকার রাত্রির শেষ যামের ধ্যানমগ্ন

পৃথিবী আর আকাশের বুক চিরে, মনে হলো চিৎকার করে বলি, হে ঈশ্বর, তুমি যদি সত্যি মানুষের ভগবান, তবে সাধের সঙ্গে কেন দাও নি-সাধ্যি? কেন সাধারণ ঘরের একটা আটপৌরে মেয়ের মধ্যে দিয়েছ অতলান্তিক সমুদ্রের গভীরতা; রুচি, মানসিক-ব্যাপ্তি, এবং ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা? দিয়েছই যদি তবে কেন তাকে ফুলগাছের মতো বাড়তে দাও নি সরস মাটিতে?

মোরগ ডেকে উঠলো কোথাও। তারপর চারপাশে, দূর ও কাছে অনেক ডাক। পুবের আকাশে দেখলাম সামান্য আলোর উদ্ভাস। আসন্ন প্রভাতের আগমনী উৎসবের সমারোহ ওখানে। ঘুমন্ত পৃথিবী জেগে উঠছে ক্রমশ। পাতলা হয়ে আসছে তার ঘুম।

আমি চোখ মুছি। হাই তুলি। নিজেকে আড়াল করার জন্য ব্যক্তিত্বের একটি অদৃশ্য মুখোস এঁটে নি। 'বল মীরা, কী তুই চাস।'

সীটের ওপরে ও উর্ধ্বদেহ তুলে, হাত নামিয়ে আমার পা খোঁজে, 'আপনি আমাকে ফিরিয়ে নিন দাদা, বাঁচান…' ওর কান্না জোরদার হয়।

মাথায় হাত রাখি আমি, 'নেমে আয়।' দরজা খুলে নামি। নামে ওরাও। স্বামী-স্ত্রীতে। 'আজ থেকে ভগবান তোকে রক্ষা করবেন।'

দু'জনেই প্রণাম করে, আমি মীরার চিবুক ছুঁই, দেখি ওর ওষ্ঠ দু'টো তখনও কাঁপছে। 'আমার বোনের মতো থাকিস। দুনিয়ার কোনো প্রলোভন যেন তোকে কখনও আর দুর্বল না করে।'

ওরা চলে যাচ্ছিলো। স্বামীর কাঁধে হাত রেখে কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে মীরা। ড্রাইভার আসে। রবি আর মাধবও। হিরোকে ডাকবো ভেবে ডাকি না।

ঠাণ্ডা মেশিন স্টার্ট নিতে সময় লাগে। গোঁ গোঁ করে এক সময় ঝাঁকুনি মেরে স্টার্ট হয়। গাড়ি এগোয়। স্পীডোমিটারের কাঁটা কুড়ির দিকে এগোচ্ছে। হঠাৎ পেছনে ডাক। যেন দূর থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে কেউ। কে ডাকে! গাড়ি থামাতে বলি। গলা বাড়িয়ে দেখি ফোলা ফোলা ঝাঁকড়া চুল উড়িয়ে এদিকেই ছুটে আসছে মীরা। ঠিক যেন শখের শাড়ি-পরা এক গ্রাম্য কিশোরী। পেছনে নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, পাখি-ওড়া সকাল। দূরে কোথাও কোন মন্দিরে যেন ঘণ্টা বাজে

'দা—দা…' ছুটে আসছে মীরা।

আমি গাড়ি থেকে নামি। এগিয়ে যাই। মীরা সামনে এসে দাঁড়ায়। হাঁপায়।

ওর সারামুখে সকালকে হারাবার মতো স্নিগ্ধ হাসি। 'একটা কথা তখন বলা হয়নি দাদা।'

'বল্।'

আমার হাতটা ধরে ও একটু সরিয়ে নিয়ে যায় আমাকে। গলার স্বর খাটো করে, 'আমি অপরাধী নই দাদা।'

'মানে!'

'মানে, দীনেন দল ছেড়ে দিতে চেয়েছিলো মাঝ মরশুমে। ঝগড়া হয়েছিলো আপনার ভাইয়ের সঙ্গে। তাই না ও বললে, আমি যেন... হ্যাঁ হ্যাঁ আমার স্বামী আমাকে ঠেলে দিয়েছিলো এই পথে, যাতে...' মীরা মাথা নিচু করলো।



সুরকার মহেন্দ্র মাস্টারের তাড়ায় আমাকে উঠতেই হলো।

গাড়ি এসে পৌঁছলো মনিরামপুরে। তখন বেলা এগারোটা। আকাশ ভরা রোদ মাঠে ঢেউ তুলছে। বিশাল ফটক পেরিয়ে গাড়ি ঢুকলো দেখলাম, দোতলার বিশাল অর্ধচক্রাকার বারান্দার রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন গৌরাঙ্গবাবু। বয়সের ভার নেমে এসেছে তার শরীরে। আমাদের দেখে তরতর করে নেমে এলেন। জড়িয়ে ধরলেন আমাকে।

দোতলায় বসবার ঘরে মুখোমুখি বসলাম। কুশল বিনিময়ের পালা চলছে তখন। তারপর এলো আগামী মরশুমে কীভাবে দল করবেন, কাকে কাকে নেবেন, কোন পালা লেখানো হবে।

কথা বলতে বলতেই খাবার এলো। ঢালাও মিষ্টি, চা। চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে আমি ভাবছিলাম, যার ঘরে এতো অশান্তির দাপাদাপি ঝড়, এবং যার স্ত্রী গৃহহীনা—সে কেমন পরম নিশ্চিন্তে আমাদের সমাদর করছে, আশ্চর্য!

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, রিসেণ্টলি তিনি একটা বড় টাক খেয়েছেন। ঘর থেকে

চুরি গেছে অনেক টাকা। যদি সম্ভব হয় আমি যেন ঋণ প্রাপ্তির ব্যাপারে তাকে সাহায্য করি।

'কী করে গেলো এত টাকা?' আমি কেঁচো খোঁড়ার নামে সাপ বের করতে চাই।

'গেলো.' গৌরাঙ্গবাবু কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু থামলেন।

আমি ভাবলাম এবার স্ত্রীর গৃহত্যাগের ঘটনাটা আসবে।

'বাড়িতে একটি ছেলেকে রেখেছিলাম। ঘরের ছেলের মতোই সে বড় হয়েছিলো। কখনও ভাবিনি ও আমাদের পর। সেই ব্যাটা...'

'একলা?'

'হ্যাঁ,' গৌরাঙ্গবাবু বললেন, 'আমার স্ত্রীকে ডাকতে পাঠিয়েছি, তার মুখেই সব শুনতে পাবেন।'

আমি সুরকার মহেন্দ্র মাস্টারের দিকে তাকাই।

মহেন্দ্র মাস্টার ততক্ষণে বিড়ি ধরিয়ে ফেলেছেন, 'সে কথাই বলছিলাম আপনাকে। হাজার হাজার টাকা নিয়ে পাখি ফুড়ুৎ।'

এগারো

'জল, জল…' উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে আসতে সর্বেশ্বর চিৎকার করছিলো। ওই চিৎকারে দুপুরের শান্ত শোভাবাজার রাজবাড়িটাও যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। পুরনো প্রায় ধ্বসে পড়ার মতন ইঁটকাঠের মধ্য থেকে কারা যেন সর্বেশ্বরের চিৎকারের ধুয়ো ধরেছে : জল, জল…! সর্বেশ্বর চেঁচাচ্ছিলো, 'সব ভেসে গেলো প্রবোধদা, সব ভেসে গেলো…'

দরজার মতো বিশাল দু'খানা জানলা খোলা ছিলো আমার মনেই নেই। সর্বেশ্বরের আর্ত-চিৎকার শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেরালাম, দেখি, শোভাবাজার রাজবাড়ির বিস্তীর্ণ চত্বর জুড়ে যে প্ল্যাস্টিং করা হয়েছে, তার ওপর দিয়ে দেড় গজি কাঁইক ফেলে ছুটে আসছে সর্বেশ্বর কুণ্ডু। অল্প বয়েস, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, নাদুস নুদুস চেহারা কিন্তু লম্বায় বেশ খাটো। সর্বেশ্বরের দৈহিক উচ্চতা বড়জোর হতে পারে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। কিন্তু এমনভাবে ছুটে আসছিলো, দেখে আমার মনে হলো বাদলার জলের তোড় দেখে ভয় পাওয়া এক শিশু বুঝি প্রাণভয়ে নিজেকে লুকোতে চাইছে।

ভেতরে, আমার অস্থায়ী ঘরখানাতে তখন জনাকয় লোক। যুগান্তর পত্রিকার রবি বসু মল্লিক এসেছেন একটি অভিযোগ নিয়ে। বসুমতীর পঙ্কজও। বসু মল্লিকের অভিযোগ, শোভাবাজার রাজবাড়ির নিখিলবঙ্গ যাত্রা উৎসবের বিজ্ঞাপন আনন্দবাজার বেশি পাচ্ছে, যুগান্তর কম। বসুমতীর পঙ্কজ আমার পুরনো বন্ধু, তার বক্তব্য বসুমতী যে-বিজ্ঞাপন পাচ্ছে তা কণিকামাত্র। আনন্দবাজার আর যুগান্তর যেভাবে প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানসূচীর বিজ্ঞাপন পাচ্ছে, বসুমতী তা কেন পাবে না? এ-ছাড়া ছিলেন পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে, বড় ভোলা পাল, দিলদির মহেশ কাউল। সে এসেছে এই বিশাল কর্মকাণ্ড দেখতে।

দিনটা ছিলো রবিবার। সকালে যাত্রার ওপর একটা সিম্পোজিয়াম হয়ে গেছে।

সকাল ন-টা থেকে বারোটা। প্যাণ্ডেলের নীচে বসে আকাশ দেখবার উপায় নেই। সুতরাং জানতেই পারা যায়নি প্রথম আশ্বিনের আকাশের মুখে কতটা অভিমানের মেঘ জমেছে। দেখার অবসরই বা কোথায়। আরম্ভ থেকেই আলোচনা নরমে গরমে বেশ জমজমাট। বিষয় ছিলো 'পালা সাহিত্যের বিষয়-বস্তু'। প্রাক-কথন আমার। বিস্তারিত ভূমিকার এখানে কোনো প্রয়োজন দেখি না। অল্প কথায় সার বস্তুটুকু বলছি। আমি বলেছিলাম, যাত্রা পালার বিষয়-বস্তুতে পরিবর্তন না আনলে এই শিল্পকে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। কেবল পুরাণ আর পুরাণ এবং কিছু ঐতিহাসিক কাহিনী দিয়ে আজ এবং ভবিষ্যতের দর্শকদের তুষ্ট রাখা যাবে না। সময় ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গেসঙ্গে মানুষের রুচি, বোধ, শিক্ষাদীক্ষা, আচার আচরণ সবকিছু পালটে যাচ্ছে অতি দ্রুত। যাত্রাকে যদি আজ ও আগামীকালের মানুষের মনে ঠাঁই করে নিতে হয়, তবে অতীতের মিনার থেকে নেমে আসতে হবে তাকে জনতার মধ্যে, মানুষের মধ্যে। পালা সাহিত্যকে বলতে হবে আজকের সমাজ ও মানুষের কথা। বলতে হবে সময়ের কথা। কেবল ভারত নয়, বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য এ-পৃথিবীর যেখানে যা ঘটেছে, ঘটছে সবই। বলতে হবে শোষণ ও অত্যাচারের সাঁড়াশিতে নিষ্পিষ্ট মানুষের কথা। এবং শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের ভূমিকা যদি যাত্রার না থাকে তবে একে সেই ফোক আর্ট তথা পচা ডোবার জলের মধ্যেই ডুব-সাঁতার কাটতে হবে।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন। তিনি আমার পিতৃতুল্য। কিন্তু শোভাবাজার যাত্রা উৎসবের সিম্পোজিয়ামে যে প্রগতিকে করা হয়েছে লক্ষ্য তিনি তাঁর ঘোর বিরোধী। আগের রবিবার সকালে 'যাত্রা প্রয়োগে আধুনিকতা বিষয়ক আলোচনাতেও বিরোধী পক্ষের নেতা ছিলেন তিনিই। এবং তিনি প্রথম দিকে এই উদ্যোগকে যাত্রা হত্যার মহোৎসব' বলে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিলো, যাত্রার আসরটাকে বজায় রেখে প্রযোজনা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। সেই আলোচনান্তে, ইছাপুরে ফিরে গিয়ে তিনি একটি পত্র লিখেছিলেন, যা পরের শুক্র-বারে আমি পাই: 'আলোচনার আসরে উত্তেজনার মাথায় আপনাকে অনেক আকথা কুকথা বলেছি সে জন্য এখন অনুশোচনা হচ্ছে। আপনি ঠিকই বলেছেন, আজকের দেড় হাজার লোকের আসর পনেরো বছরের মধ্যে পনেরো হাজার

দর্শকের আসরে রূপান্তরিত হবে। এবং তখন মাইক ছাড়া অভিনয় করতে গেলে অভিনেতাদের আয়ু দশ বছর কমে যাবে। টেপ-রেকর্ডার, বিদেশী বাদ্যযন্ত্র, আলো এ-সবও সত্যিই প্রয়োজন হবে। এবং এখন থেকে প্রস্তুতি না নিলে তখন আসবে বিপদ। আপনার দূরদর্শিতাকে প্রশংসা করার ভাষা আমার নেই। কিন্তু একটি অনুরোধ, আপনি যে বললেন, যে-শিল্পের যা ভালো এবং গ্রহণযোগ্য তা আমরা অবশ্যই গ্রহণ করবো। এখানেই আমার ভীতির কারণ। যাত্রাটা রাতারাতি থিয়েটার সিনেমা বা সার্কাস হয়ে গেলে যাত্রার যাত্রাত্ব অবলুপ্ত হবে। আপনি যাত্রার ভগীরথ, যাত্রার পরম বন্ধু, দয়া করে এই প্রভাবের হাত থেকে যাত্রাকে মুক্ত রাখবেন। এবং মেয়েরা যদি সত্যি যাত্রায় ভিড় করে তবেও যাত্রার সর্বনাশ হয়ে যাবে। Please combat it…।' সেই ব্রজেন্দ্রবাবু আজও ছিলেন আমার বিরোধী পক্ষের নেতা। অত্যন্ত জোর গলায় তিনি প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন, 'আজও আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এই উৎসব যাত্রার চরিত্র ও ধর্ম নষ্ট করার কূটকৌশলী চক্রক্ষেত্র'। সভায় তীব্র বাদানুবাদ। শেষদিকে দেখলাম বিরোধী পক্ষের গলা ও সুর নরম। কনক্লুড করলেন ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ। তিনি বললেন, 'প্রবোধবাবু আমাদের বন্ধু যা বলেছেন, তাকে আমি সমর্থন করি। কবে ঘি খেয়েছিলাম সেই অতীত স্বপ্নের ঘরে বসে না থেকে আজ ঘি খেতে ও খাওয়াতে হবে। মানুষ আমাদের নারায়ণ। আমরা সেই নারায়ণের পুজোই তো করে আসছি সেকাল থেকে। আজকের মানুষকে যদি আমরা সেই আসনে বসাতে না পারি, তবে আমাদের অভিশাপে দণ্ডের পথ আমরাই করবো। ফোক-ফর্ম বা গ্রামীণ সৃষ্টি বলে যাত্রাকে দূরে সরিয়ে রাখার যে চক্রান্ত চলছে তাকে ভাঙতে হবে। যাত্রা প্রবহমান শিল্পধারা-- সে ফোকড্রামা হতে পারে না।'

সিম্পোজিয়ামের তপ্ত আসর ভাঙার পর প্রায় সবাই চলে গেলেন। থেকে গেলেন ব্রজেন্দ্রবাবু, ভোলাবাবু এবং পঞ্চু সেন। বাইরে ততক্ষণে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি নেমে এসেছে।

সর্বেশ্বর ছুটে আসছে কাউণ্টার থেকে। এর মধ্যে ঢল নেমেছে কখন খেয়াল করিনি আমরা। হঠাৎ সজাগ হতে দেখি প্যাণ্ডেলের প্ল্যাস্টিং করা বিশাল আসরের নীচ দিয়ে কলকল করে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এবং সেই জল এমন বেড়েছে যে আর পাঁচ আঙুল বাড়লে সে আসরের ওপর দিয়ে বইতে শুরু করবে।

বাইরে তখনও বাদলার ভয়ানক ঘনঘটা। কড়কড় করে মেঘ ডাকছে, বিজলী চমকাচ্ছে ঘনঘন এবং গোটা আকাশ-বালতি থেকে যেন জলের তোড় নেমে আসছে। বেরিয়ে আসি। সর্বেশ্বর সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপায়, 'আসর ভেসে যাবে এক্ষুনি। অমরদাকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

ওপরে দো পললা ত্রিপলের ছাউনী বলে একফোঁটা জল পড়ে নি আসরে। কিন্তু যে অবস্থা তাতে নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া জল ওভার-ফ্লো করতে পারে। তাতে আসরে পাতা চট, চাদর, গালিচা সব ভেসে যেতে পারেই। বললাম, 'অমর গেলো কোথায়?'

'খুঁজে পাচ্ছি না।'

ভাবছি গেলো কোথায়! এমন সময় অলক এলো কাঁদতে কাঁদতে। তার হাতে মোটা ধরনের একগাছা রজনীগন্ধার মালা। কাঁদতে কাঁদতে এসে মালাটা তুলে দিলো আমার হাতে। অঝোরে কেঁদে যাচ্ছিলো।

'কী হয়েছে?'

কাঁদতে কাঁদতে অলক বললো তার গলায় লীলা মালা পরিয়ে দিয়েছে। এটা ভয়ানক অপমান। সুতরাং তার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব নয়। আমি যেন অন্য ফটোগ্রাফার দেখে নিই।

হাসলাম। বললাম, 'বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ মালা পরিয়ে দিয়েছে?'

অলক সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো।

ক-দিন থেকে লক্ষ্য করছি, শেলীদির দলের মেয়েরা অলকের পেছনে লেগে রয়েছে। ফর্সা টুকটুকে সুন্দর ছেলেটিকে নিয়ে মজা করতে ওদের উৎসাহ বেশি। সেই রকম কোনো মজার ব্যাপার না অন্য কিছু! বোঝা কঠিন। অমর আমাকে একদিন বলেছিলো, 'দাদা অলককে বাঁচান।' কথাটা এই মুহূর্তে মনে পড়লো আমার।

সান্ত্বনা দিই অলককে, 'মালা পরিয়ে দিয়েছে তো কী হয়েছে? ইয়ার্কি করতে করতে হয়তো টুক করে তোমার গলায় পড়ে গিয়ে থাকবে।'

না না, অলক মাথা নাড়ে, কাঁদে।

অলককে নিয়ে সুধাদির যে লোফালুফি পরিকল্পনা, অনেক পরে তা ধরা পড়ে। আর যখন পড়ে তখন অলকের পিছলে আসার রাস্তা বন্ধ। সে এক ভয়ানক কাণ্ড। শেলীদিও ঘুণাক্ষরে এই ভয়াবহ চক্রান্তের বিন্দুবিসর্গ জানতে পারেন

নি। জানলে অনেক আগেই এই গর্তের মুখ তিনি বন্ধ করে দিয়ে অলককে মুক্ত করতে পারতেন।

শৈলীদি কয়েকটি কারণে ভীষণ রেগে ছিলেন আমার ওপর। উৎসবের উদ্বোধনের দিন থেকেই তাঁর মুখে অভিমানের ঘন মেঘ। কেন? কারণটা একটু অনুসন্ধান করা যাক।

ডায়াসে বসে গলদঘর্ম হচ্ছিলেন কবীর সাহেব। জনাব হুমায়ুন কবীর—ভারত সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী। তাঁর পাশেই বসেছিলেন জননেতা তরুণকান্তি ঘোষ এবং সংস্কৃতি জগতের জনাকয় দিকপাল। বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর সেক্রেটারী জেনারেল দীপক রায় নিখিল বঙ্গ যাত্রা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্পাদকের ভাষণ পাঠ করছিলো, 'বাংলা নাট্য জগতের প্রতি কেন্দ্রের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের বিমাতৃসুলভ আচরণ তো বটেই এবং পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির বহু দলিল আমাদের হাতে আছে। ওই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব হুমায়ুন কবীর সাহেব আজ নিখিলবঙ্গ যাত্রা উৎসবের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁর ভাষণ দেবার আগে আমরা তাঁর কাছে কয়েকটি সবিনয় প্রশ্ন রাখছি। ভাষণ দেবার সময় প্রশ্নগুলির জবাব দিলে আমরা বাধিত হবো ··'

সন উনিশ শো একষট্টি, তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর, বার শুক্রবার, সময় সন্ধ্যা। শোভাবাজার রাজবাড়িতে প্রথম যাত্রা-উৎসবের উদ্বোধনী সভা ওইদিন। দর্শক শ্রোতাদের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। যাত্রা জগতের মালিক, ম্যানেজার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী এবং পালাকারদের সকলেই এসেছেন। গ্রুপ থিয়েটারের কিছু লোকও উপস্থিত হয়েছেন কৌতূহলের বশে। সামনের সারিতে সংবাদ-পত্রের লোকজনরা। পেছনের একটি সারিতে আমরা বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর সদস্যরা বসেছি। আমার একপাশে নবনাট্যম্-এর নির্দেশক নাট্যকার দেবব্রত সুর চৌধুরী, অন্যপাশে অভ্যুদয়ের কিরণ মৈত্র। ওই সারিতেই বসেছেন প্রীতি রায়, সুনীল দত্ত, শৈলেন মোহান্ত, নারায়ণ ভট্টাচার্য, শম্ভু ঘোষ, আশুতোষ শাহা, ব্রজেন্দ্র কুমার দে, আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চু সেন, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, ফণি মতিলাল, জীবন দাস, মহেন্দ্র দত্ত, অমিয় ভট্টাচার্য, ভোলা পাল এবং আরও অনেকে। দেখলাম কবীর সাহেবের মুখটা জবাফুলের মতো টকটকে হয়ে উঠেছে। এমন তপ্ত হয়েছেন যে, আমার দিকে তাকাচ্ছেন

না। অন্ত কোনো ক্ষেত্র হলে হয়তো আমার ওপর ঝাপিয়ে পড়তেন কবীর সাহেব এবং ক্ষমতাবলে আমাকে শায়েস্তা করে ছাড়তেন।

দেবুদা, প্রীতিবাবুর মুখে দেখলাম আশংকার ছায়া। দেবুদা আমার কানের কাছে মুখটা সরিয়ে এনে বললেন, 'লেখাটা একটু নরম করে লিখতে পারতে।' প্রীতিবাবু বললেন, 'একেবারে ঘাড় ধরে গালমন্দ করা হচ্ছে।'

আমি হাসলাম।

আমার ওপর তপ্ত হবার যথেষ্ট কারণ ছিলো। কবীর সাহেব জানতেন, দীপক যে বিবরণীটি পাঠ করছে তা কার লেখা। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের নানা কর্মকাণ্ডের অনেক কাগজপত্র এবং সাক্ষ্য প্রমাণ আমার কাছে আছে এবং এ নিয়ে ওঁর সঙ্গে কম তর্কাতর্কি আমার হয় নি। সে-সব আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়। তবে দিল্লীতে আলোচনার সময় একটি সবিনয় প্রস্তাব আমি রেখেছিলাম। প্রশ্ন করেছিলাম, কেন্দ্র সরকার শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের জন্য যে বিপুল অর্থ খরচ করে থাকেন তার একটা অংশ কি যাত্রাশিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা যায় না? আরও বলেছিলাম, ভারতের একমাত্র এবং দেশীয় তথা জাতীয় অভিনয়-কলা বলতে যাত্রাকেই বোঝায়। অর্থাৎ যাত্রাই ভারতের প্রকৃত ন্যাশনাল পারফর্মিং আর্ট।

এই সূত্র ধরে আমরা একটু রাজধানী দিল্লি ঘুরে আসতে পারি। ভারতের ন্যাশনাল থিয়েটার সম্পর্কিত একটি সিম্পোজিয়াম সরকারী আনুকুল্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ওখানে। বক্তা অনেকে ছিলেন। নানা বিতর্কমূলক ব্যাখা শোনা গেলো এবং পাণ্ডিত্যের ছড়াছড়িও। এদের মধ্যে হাবীব তনবীর সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশের গাঁয়ের ছেলে কিন্তু উপলব্ধি অনুভব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে সবার ওপরে। তিনি বললেন, এই আলোচনা সভায় বক্তাদের ভাষণ থেকে একটা সত্যে পৌঁছনো যায়, ন্যাশনাল থিয়েটার যেন ইট সিমেন্টে গড়ে তোলা একটি রঙ্গগৃহ মাত্র। আসলে কি ন্যাশনাল থিয়েটার অর্থে একটি প্রেক্ষাগৃহকে আমরা ধরে নেবো? ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের নাট্য-স্বাতন্ত্র্য, ভারতের অভিনয়রীতি এবং শিল্পবোধ বা ভাবনাকে কি চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখবো আমরা? না। ইংলণ্ডের ন্যাশনাল থিয়েটার বলতে আমি বুঝি শেকসপীয়র। তেমনি ভারতের ন্যাশনাল থিয়েটার কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ…'

জনাব হুমায়ুন কবীর আমার কথা শুনে খুবই অপ্রসন্ন হলেন মনে হয়েছিলো। যাত্রাকে কেন বলছি ন্যাশনাল থিয়েটার সে-প্রসঙ্গে না গিয়ে তিনি বললেন, যাত্রা হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের একটি বিশেষ এলাকার বিশেষ ধরনের মুমূর্ষু ফোক-আর্ট। তাকে জাতীয় আখ্যায় ভূষিত করা যায় না। তা ছাড়া যাত্রা তো রুরাল পারফরমিং আর্ট। শহরের লোকের কাছে তার ঠাঁই নেই। কারণ, ইট ইজ মোস্ট হ্যাকনিড এণ্ড ক্রুড। কী উত্তর দেবো? জবাব দিতেও শরম বোধ করছিলাম। কিন্তু আমি কি শামুকের মতো গুটিয়ে যাবো? না। বললাম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন পৃথিবীর সকল দেশের নাট্যকলার জন্মই হয়েছিলো একদিন উদার আকাশের নীচে, মুক্ত অঙ্গনে। আজ যার যার ঘরে উঠে এসে তারাই ভাবছে কীভাবে মানুষের মধ্যে নেমে আসা যায়। অর্থাৎ জনগণের মধ্যে। যাত্রা নামক ফর্মটিরও জন্ম এখানে। তার অপরাধ সে পাকা ঘরে উঠে আসেনি। রয়ে গেছে জনগণের বুকের একান্ত কাছে। এবং থাকবেও তাই। যাত্রাকে ন্যাশনাল থিয়েটার বলা মানেই মুক্ত অঙ্গন অভিনয়কে সম্মান দেওয়া। এই ভারতে কয়েক শো পারফরমিং আর্ট আছে যা এখনও পাকা বাড়িতে উঠে যায়নি। ফোক আর্ট ফোক আর্ট বলে তাদের দূরে সরিয়ে রাখাটা অনেকটা হরিজনদের মতো অচ্ছ্যুৎ করে রাখার চক্রান্ত। তার মানে যাত্রাকে আপনারা তপশীলী করে রাখতে চাইছেন তো? কিন্তু গান্ধীজী থেকে শুরু করে নেহরু পর্যন্ত সবাই তো তপশীলী উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করার কথা বলেছেন। অন্তত সে হিসেবেও কি কিছু খয়রাতি সাহায্য যাত্রা আশা করতে পারে না? কবীর সাহেব ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন আমার কথায়।

উনিশ শো উনষাট সনে আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় কনট্রিবিউটার হিসাবে যোগদান করি। সন্তোষদা—সন্তোষকুমার ঘোষ আমাকে এই সুযোগ দিয়েছিলেন। আনন্দলোক বিভাগের জন্ম ওই সময়েই। পরিকল্পনা সন্তোষদার। তখন আমার খুবই দুঃসময়, অনিবার্য মৃত্যুর মুখোমুখি প্রায়। সন্তোষদা এই সময়ে এই বিভাগটির দায়িত্ব দেন আমার হাতে। মূল লক্ষ্য গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার। ওই সঙ্গে থাকবে সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গের কথাও। ১৯৬০ সনের মধ্যেই গ্রুপ থিয়েটারের সকলের সঙ্গে পরিচিত হই এবং ঘনিষ্টও। এবং এই সূত্র ধরে গ্রুপ থিয়েটারের কেন্দ্রীয় সংস্থা বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর জন্ম হয়।

প্রচুর গ্রুপ এর সদস্য ছিলো। সংস্থার সভাপতি ছিলেন শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন, কার্যকরী সভাপতি আমি, সহ সভাপতি : দেবব্রত সুর চৌধুরী, জোছন দস্তিদার, কিরণ মৈত্র, বরুণ দাসগুপ্ত, সুনীল দত্ত, রমেন লাহিড়ী, প্রীতি রায়, শেলী সান্যাল, সাধারণ সম্পাদক : দীপক রায়, সহঃ সম্পাদক : হরিপ্রসাদ সিনহা ও অমিয় চ্যাটার্জি, কোষাধ্যক্ষের নামটা এখন স্মরণ নেই। বাকি আটজন সদস্য। নাট্যোন্নয়নের পঁচিশ দফা কর্মসূচী নিয়ে আমরা কাজে নেমেছিলাম।

এই সময়ে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ নামে একটি প্রতিষ্ঠান বিশ্বরূপায় নাট্য প্রতিযোগিতা ও নাট্য সম্মেলন করতেন। কর্ণধার ছিলেন রাসবিহারী সরকার। প্রবীন অধ্যাপক, নাট্য ও চলচ্চিত্র সমালোচক এবং তথাকথিত বিপ্লবী নাট্যবিদরা এর বিচারক ছিলেন। এই সংস্থার সঙ্গে আমাকে যুক্ত হতে বলা হয়েছে অনেকবার। কিন্তু এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হবার আন্তরিক সম্মতি আমি কোনোদিনই পাইনি। ওঁদের অর্থবল ছিলো, আমাদের ছিলো শক্তি, তারুণ্যের জোয়ার। কিন্তু জানতাম না, আমাদের অগোচরে বিরোধী শিবিরে আমাদের নিধনের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এবং একদা ওই ষড়যন্ত্র মরাত্মক চেহারা নিয়েছিলো। সে ঘটনা আপাতত নাই বা বললাম। ধান ভানতে শিবের গীত বলে মনে হচ্ছে কি? কিন্তু আমার অতীতের সুখদুঃখের স্মৃতিটুকুই বা এড়াই কি করে? যতটুকু না বললে নয় ততটুকুই বলতে হচ্ছে। না হ'লে গোটা পটভূমি ঝাপসা মনে হবে, যে-অবস্থার মধ্যে আমাকে কাজ করতে হয়েছে সেই ছবিটাও ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। পরিবেশ, পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিককে অস্বীকার করলে ভবিষ্যতের মানুষেরা আমাকে অসত্যবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করবে—এটা কিন্তু ভাবছি না। আসলে হাত-পা-বিহীন ধড় নিয়ে নাড়াচাড়া করার ইচ্ছে আমার নেই।

যাত্রা উৎসবের পরিকল্পনা কী করে মাথায় এলো? সে এক আশ্চর্য ঘটনা। আনন্দবাজার পত্রিকার আনন্দলোক বিভাগে যাত্রা নিয়ে আলোচনার অধিকার পাওয়ার পর ১৯৬০ সনের সেপ্টেম্বর মাসের এক বিকেলে আমি চিৎপুরে আসি। সঙ্গে ছিলো অঙ্কন-শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্ত। সুবোধ আমার পুরনো বন্ধু। বললাম আমরা যা দেখবো তার কয়েকটি স্কেচ তুই এঁকে দিবি, লেখার সঙ্গে তা ছাপবো। চিৎপুর পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা পার। শোভাবাজারের আগের স্টপে ট্রাম

থেকে নেমে পেছন দিকে আসতেই চোখে পড়লো আর্য্য অপেরার সাইনবোর্ড। বাঁ-দিকের ফুটে নবরঞ্জন অপেরা, নিউ রয়েল বীণাপানি অপেরার সাইনবোর্ডও দেখেছিলাম। যেহেতু আর্য্য চেনা নাম অতএব এখানেই ঢোকা যাক। নীচে দু'একটি ছোট মতন গদী—লণ্ঠন জ্বলছে। শুধোতে ওঁরা বললেন, আর্য্য অপেরার গদী ত্রিতলে।

এখানে সবই অন্ধকার। রাস্তার আলোটুকুর সীমারেখাও অল্প। লাইন খারাপ? না। ক্যালকাটা অপেরার একজন ভদ্রলোক বললেন, সব গদীরই প্রায় এক অবস্থা। বললেন, দেশলাই কাঠি জ্বালতে জ্বালতে চলে যান।

সুবোধ একে কাহিল তার ওপর ভীরু। বললো, 'ফিরে চলো আপন ঘরে। আমার ভয় করছে প্রবোধ।'

'ধেৎ!' ধমক দিই আর দেশলাই কাঠি জ্বালি। আলো নেই কিন্তু এই চাপা ধরনের সিঁড়িতে হাওয়া বইছে সোঁ সোঁ। দেশলাই জ্বালানোর সঙ্গেসঙ্গে নিভে যায় আর অমনি কিলবিলে জোঁকের মতো অন্ধকার ঝাপটে ধরে আমাদের। কেউ নামছেন না, উঠছেন না কেউ। সুবোধ আমার পাঞ্জাবীর নীচটা খাবলা দিয়ে ধরে আছে। গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বলছে, 'এ-নির্ঘাৎ ভুতুড়ে বাড়ি। দেখছিস না অন্ধকারটা কেমন যেন বেখাপ্পা কালো। তা ছাড়া শুনেছি, ভূতেরা শালা ফুঁ দিয়ে দেশলাই নিভোয়।' আমি কথা বলি না। প্রাণপণে পরের পর কাঠি জ্বালি আর দু'ধাপ করে উঠে যাই।

দোতলা থেকে মোড় নিতেই মনে হলো অন্ধকারটা কেমন যেন ফিকে হয়ে এলো। সুবোধ বললো, 'সাবধান প্রবোধ, দেয়ার দেয়ার দে-য়া-র ই-জ...'

অন্য কোনো লোক হ'লে ভয় পেতো। আমি কিন্তু সিঁড়ির শেষ মোড় পেরোতেই বুঝতে পারলাম ওপরে কোথাও আলো আছে। হঠাৎ কেমন একটা অস্পষ্ট কথাও কানে এলো। সুবোধ খুব ঘন হয়ে আমার কাঁধে হাত রাখলো। বললো, 'বাড়িটা আমার কাছে ভালো ঠেকছে না। কারা যেন কথা বলে...'

'চুপ করতো।' দেশালাইয়ে তখনও প্রাণপণে কাঠি ঠুঁকে যাই, 'মানুষ।'

'তুই জানিস না', সুবোধ তোৎলাতে তোৎলাতে প্রতিবাদ করে, 'ভূতেরা না শালা ঠিক মানুষের মতন গলায় কথাও বলে...'

অবশেষে দরজার কাছে পৌছলাম। একফালি ময়লা আলো এসে পড়েছে অল্প

প্রশস্ত বারান্দায়। চৌকাঠের কাছাকাছি যেতেই ভেতর থেকে গম্ভীর গলা ভেসে এলো, 'কে ওখানে!'

থমকে দাঁড়ালাম। গলা বাড়িয়ে দেখি ভেতরে দু'জন লোক। 'ভেতরে আসতে পারি?' গলায় জোর আনি। ভেতর থেকে উত্তর আসে, 'কোথাকার?' সুবোধ ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকায়, আমি সুবোধের দিকে। ইশারায় সিঁড়ি দেখায় সুবোধ। আমি সরাসরি চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়াই। হাত বাড়িয়ে দরজার পাললা ধরি, 'আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে এসেছি।'

ভেতরে জীর্ণ তক্তপোশে পাতা ছেঁড়া পাটির ওপর বসে আছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। দেয়াল ঘেষে পাতা চেয়ারে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি। ফর্সা টকটকে রঙ, চুলগুলো বেশ বড় বাবরি মতন। সামনে দাঁড় করানো ছাতার বাঁটে দু'হাত রেখে হাঁটু নাচিয়ে যাচ্ছেন আর অনর্গল কথা বলছেন। পাশে পিলসুজে জলছে বড় একটা প্রদীপ। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সেতো কলকাতা।' বললাম, 'হ্যাঁ, সেখান থেকেই।' বৃদ্ধ ভদ্রলোক কপাল কোঁচকালেন, 'কিন্তু গানটা কোথায়?'

সুবোধ ততক্ষণে চিমটি কাটতে শুরু করেছে আমাকে। কানের ওপর মুখ গুঁজে বলছে 'চল, চলে যাই।' কিন্তু আমার যে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই এ-কথাটা সুবোধকে বোঝাই কী করে! ছোটবেলায় যে আর্য্য অপেরার ঘাটে বিশাল বিশাল দেব দানব একসঙ্গে পানি খেতো, লহমায় মর্ত্যভূমিকে পরিণত করতো স্বর্গে— একি সেই আর্য্য অপেরার গদী!

ঘরে পা রাখতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, তাঁর নাম শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু মল্লিক।

'আপনাকেই আমার দরকার,' খুব উৎসাহের সঙ্গে বলি। 'যাত্রা নিয়ে কিছু লিখবো বলে…'

হঠাৎ অট্টহাসির মতো উচ্চগ্রাম হাসির তোড়। চেয়ারে বসা ভদ্রলোক হাসছেন, 'লিখবেন?' রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, 'কী লিখবেন মশাই? কার কথা লিখবেন?' বলেই অতুলবাবুকে ইঙ্গিতে যেন কিছু বললেন। নিচের ওষ্ঠটাকে ঠেলে দিয়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করলেন। তাকালেন আমার দিকে, 'মারা গেছে।'

মারা! আমি ভড়কে যাই। 'মানে…'

'মানেফানে কিছু নেই। সাফ কথা রামনাম সত্ হয়ে গেছে।' বাঁ হাতটা ছাতার বাঁটে রেখে ডান হাত তুলে ছাদ দেখালেন, 'এখন ওইখানে···'
'আপনি···' ঢোঁক গিলি আমি, 'মানে আপনি কার কথা ··'
সুবোধ দাশগুপ্তের সবগুলো নার্ভ ততক্ষণে ফেল করেছে। ও প্রায় জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। ফিসফিস করে বলছে, 'তখনই বলেছিলাম এ-সব প্রেতাত্মা···'
ভদ্রলোক বললেন, 'কার আবার, যাত্রার; যাত্রার।' বলতে বলতেই চোখ দু'টো ছলোছলো হয়ে এলো লোকটার। রুমালে নাক মুছলেন, 'দেশটাকে দু'ফালা করে···', রুমালটা গুঁজে দিলেন পকেটে। মধ্যমা দিয়ে নাকের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়া চশমাটা ঠেলে দিলেন ওপরে, ধরা গলায় বললেন, 'লিখবেনই যদি তবে বছর দশেক আগে আসতে কে কিরা দিয়েছিলো আপনাদের?'
সুবোধ ততক্ষণে আলাদা হয়ে গেছে।
আচমকাই দেখলাম ভদ্রলোক নিজেকে সংযত করে নিলেন। স্বর নেমে এলো খাদে, 'সেই বিকেল চারটে থেকে টাকার জন্যে বসে আছি, বুঝলেন? জানিনা, জানিনা ওদিকে কী হচ্ছে···'
'সে কথাই আমি জানতে চাই।' গলায় এবং মনে বল ফিরে পাই। 'আপনারা যদি একটু সহযোগিতা করেন···'
'ফাদার!' ভদ্রলোক হঠাৎ যেন বোমা ফাটালেন: সুবোধ ছিটকে সরে গেলো দরজার কাছে, আমি একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার খাবলে ধরি। 'ফোর-ফাদার শালা সহযোগিতা করবে। বসুন, বসুন। আমাদের দুঃখের দিনের পরম বন্ধু আসন নিন।'
অতুলবাবু বললেন, 'ইনি একজন নামকরা এ্যাকটর—শরৎ মুখোপাধ্যায়। নবদ্বীপে থাকেন।'
'বুঝেছি', হাসতে হাসতে বলি আমি, 'কথা বলার ধরন দেখেই বুঝেছি।'
'দেশ কোথায়?' অতুলকৃষ্ণ বসু মল্লিক শুধোলেন।
'পূর্ববঙ্গে।'
'পূর্ববঙ্গের কোথায়?'
'টাঙ্গাইল মহকুমার এলাসিনের কাছে।'
'অধিকারী নিশ্চয়?'
'হ্যাঁ।'

'মাইঠানের ?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝেছি।' অতুলবাবু গড়গড় করে আমাদের বংশের অনেকগুলো নাম বলে গেলেন। শরৎবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবুদের বাড়ির ছেলে। তুমি একবার যোগাযোগটা দেখ শরৎবাবু।'

এক মুহূর্তেই আত্মীয়তা। কোন সনে কোন পালা গেয়েছিলেন আমাদের ওখানে, কেমন আদর যত্ন আর আদায় বিদেয় পেয়েছিলেন তা গড়গড় করে বলে গেলেন। রাত দশটা নাগাদ প্রশ্ন এবং উত্তরের কাগজপত্র ব্যাগে পুরে উঠি। অতুলবাবু কিন্তু ছাড়তে চান না। এর মধ্যে মিষ্টি এসেছে। চা, পান, সিগ্রেটও। সুবোধ খাতার ওপর পেন্সিল বুলোচ্ছিলো তখনও। অতুলবাবু বললেন, 'চিৎপুরে আনন্দবাজারের যখন পা পড়েছে তখন জানি রোগী বাঁচবে। কিন্তু আমি···' অতুলকৃষ্ণ বসু মল্লিক কোথায় যেন চলে যান, কথা বলেন অনেক দূর থেকে, 'আমি কি সে দিন দেখে যেতে পারবো বাবু ?'

পঞ্চান্ন কোটি টাকা যার বার্ষিক ব্যবসায় সেই ইনডাসট্রি দেখে যেতে পারেন নি আর্য্য অপেরার প্রোপ্রাইটার। কিন্তু শোভাবাজার রাজবাড়ির উৎসবে এই মহীরুহের অঙ্কুরোদ্গম তিনি দেখে গেছেন। মৃত্যুর আগেই দেখে গেছেন তাঁর আর্য্য অপেরা কেমন করে চলে গেলো অন্যের হাতে। যুগপৎ আনন্দ এবং দুঃখ। সে-কথা এখানে নাই বা বললাম।

ভাবছেন বুঝি সুযোগ বুঝে আমি আবার বেলাইনে চলে যাচ্ছি ? একেবারেই না। শোভাবাজার রাজবাড়ির যাত্রা উৎসবের কথা বলা হচ্ছিলো ঠিক, কিন্তু চিৎপুরকে বাদ দিয়ে কি তা সম্পূর্ণ হ'তে পারে ? এদের শুভ কামনা, এঁদের আশীর্বাদ যদি না থাকতো তবে আমিই কি করতে পারতাম এতোবড় উৎসব ? এঁদের বেদনা, এঁদের দুঃখ যদি আমাকে স্পর্শ করতে না পারতো তবে বোধ হয় যাত্রার পুনরভ্যুদয়ের এই সংকল্পও আমার পক্ষে নেওয়া কঠিন ছিলো।

সেই থেকে চিৎপুরে আসা-যাওয়া। সকলের অবস্থাই সঙ্গীন। পুব-বাঙলা পাকিস্তানের ভাগে পড়ার পরেও বেশ কিছুকাল কলকাতার যাত্রার গতায়াত ছিলো ওদিকে। কিন্তু ১৯৫৭ সালে ও পথ বন্ধ হয়ে যায়। আসামে চাহিদা অবশ্যই ছিলো কিন্তু রেট কোথায় ? এ-বঙ্গেই বা কোলিয়ারী বাদ দিলে কটা আসর ছিলো ?

সময় কাটে, দিন পার হয়—কাজ করি কিন্তু মন পড়ে থাকে এখানে। এক সময় আমার মনে হতো, যাত্রার এই যে ডায়াস, এই ডায়াসটাই একদিন গোটা দেশে আনতে পারবে বাঞ্ছিত পরিবর্তন। সিনেমা থিয়েটার যা পারে না, যা পারে না রাজনৈতিক ব্যবসায়ীরা—কেবল যাত্রা করে গোটা দেশের জনমনে তরঙ্গ তুলতে পারে একমাত্র যাত্রাই। একদিন এরই কনসার্ট আমাকে আত্মঘাতী করতে গিয়েছিলো, ছেলেবেলায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ শিখেছিলাম এই আসরে আসরে। যাত্রা মনকে নিয়ে গেছে স্বর্গে, নিয়ে গেছে নন্দন কাননে, পৌঁছে দিয়েছে কার্তবীর্যার্জ্জুনের রঙমহলে। হ্যাজাক ডে-লাইটে আলোকিত এই আসরই হয়ে গেছে দণ্ডকবন, লঙ্কা, অযোধ্যা, ইন্দ্রপুরী বা কৈলাশ। সুতরাং অনেকগুলো নিঝুম রাত্রির প্রহর গুণতে গুণতে আলোকবিন্দুর সন্ধান পাই। মনে হয়, কেবল আনন্দবাজারের উদার সহযোগিতায় এই মুমূর্যুকে নিরোগ, সুস্থ করা যাবে না। সবার আগে ঠাঁই পিঁড়ি পেতে বসতে হবে শহরের মানুষের মনে। আর তা একমাত্র হ'তে পারে কলকাতায় বড়ো ধরনের যাত্রা উৎসব করতে পারলেই। ব্যাস, শয্যা হয় কণ্টকময়। উঠি। একের পর এক সিগ্রেট পোড়ে। ভাঙা জানলায় বসে আকাশ দেখি। আকাশের মতো হয়ে যেতে পারি। উত্তেজনা, উত্তেজনা—মনে হয় এখনই আমার ছুটে যাওয়া উচিত।

কিন্তু সেই যে শিখেছি, 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না'—তাই বিচার বিবেচনা, সঙ্কোচের বিহ্বলতা। এমনি করে হেমন্ত পার হয়, শীতের বুড়িটা থরো-থরো হাতের লাঠি ঠুকেঠুকে প্রস্থান করে, বসন্তের বাতাস কখন যে মাতাল করা আমেজ ছড়িয়ে চলে যায় জানি না। গ্রীষ্ম আসে একবুক তৃষ্ণা নিয়ে। তারও যখন যাইযাই অবস্থা ঠিক তখন বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর কর্মপরিষদের এক সভায় যাত্রা উৎসবের প্রস্তাব উত্থাপন করি। সঙ্গেসঙ্গে সকলে মূক। থমথমে এক নীরবতা সারা ঘরময়। আমার সহযাত্রী এবং সহকর্মীরা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতের ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে। প্রায় জনা পঁচিশেক মানুষের নীরব প্রতিবাদ। কিরণ মৈত্র বললো, 'আমাদের নাটক নিয়ে কাজ, নাট্য নিয়ে চিন্তা তার মধ্যে যাত্রা…!' আমি বললাম, 'যাত্রা নাট্য নয় এ-কথাটা কে বলেছে?' দেবুদা মাথা চুলকোচ্ছিলেন, দীপক চুপ, প্রীতিবাবু মাথা হেঁট করে পান চিবোচ্ছিলেন, হরিপ্রসাদের মুখ ব্যাজার। কে যেন বললো, 'আমাদের এমন ফাণ্ড কোথায় যে এতোবড় ঝুঁকি নেবো?' সকলেই সায় জানালো এ-

কথার। মনের দিক থেকে আমি তত্ক্ষণে তৈরি। বললাম, 'তা হ'লে কি ধরে নিতে হবে আমরা কেবল মিটিং মিটিং খেলা খেলেই যাবো? গুঁটিকয় আলোচনার আসর, নাট্যের ওপর থেকে প্রমোদকর প্রত্যাহারের আন্দোলন আর 'নিখিলবঙ্গ নাট্যকার নাট্যশিল্পী সম্মেলনে'ই কি আমাদের কর্মসূচী সমাপ্ত?'

একসঙ্গে সকলে তাকালো আমার দিকে। বললাম, 'আমাদের এমন একটা কিছু করা দরকার যা হবে বিশাল কর্মযজ্ঞ, যা কেউ কখনও ভাবে নি।'

প্রীতিবাবু বললেন, 'বেশ তো আপনার পরিকল্পনাটা খোলসা করে বলুন না।'

আমার প্রস্তাবের বিষদ: ১. অচ্ছ্যুৎ করে রাখা যাত্রাকে আমরা বুকে তুলে নেবো। কারণ যাত্রাই ভারতীয় নাট্যের জনক; ২. কলকাতার মানুষেরা একই ধরনের থিয়েটার আর সিনেমা দেখে দেখে ক্লান্ত, তাঁদের কাছে যাত্রা ভালো লাগলে আমাদের কাছে তা হবে এ্যাচিভমেণ্ট; ৩. একটা সময় আসছে এবং সে-দিনটা অদূরে যে, দেশের তাবৎ লোক যাত্রাশিল্পকে ঠাঁই দেবে সকলের ওপরে; ৪. এই উৎসবই হবে যাত্রাশিল্পের রিভাইভ্যালের প্রথম ধাপ এবং ইতিহাস সে-কথা বলবে; ৫. যাত্রাশিল্প রোগশয্যা থেকে উঠে এলে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষেরা বাঁচবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের পথ হবে প্রশস্ত; ৬. এটাই হবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রথম ধাপ—নীতিশূন্য স্বার্থপর রাজনীতি শিল্পের দিকে বাড়ানো তার হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে।

আমার যুক্তিগুলো নিশ্চুপে শুনে গেলো সকলে। তারপর প্রশ্ন উঠলো উৎসবের সাফল্য সম্পর্কে। প্রায় সকলেই একমত যে, কলকাতার মানুষেরা এ-ধরনের উদ্যোগকে কোনোমতেই সুস্থ চিন্তার ফসল হিসাবে মেনে নেবে না। যাত্রাকে ঘৃণা করে সকল নগরবাসীই। সুতরাং একটা রোমাণ্টিক ভাবনাকে রূপ দিতে গিয়ে অযথাই সংগঠনীকে আর্থিক ক্ষতি ও ঋণের বোঝা মাথায় নিতে হবে। সুতরাং এ-প্রস্তাব নাকচ।

আমার শিরায় শিরায় তখন উত্তপ্ত লাভাস্রোত। সংগঠনীর সংবিধানে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করলেই আমার পথ পরিষ্কার হ'তে পারতো। কিন্তু সে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ আমি করিনি। বরং বললাম, 'বেশ তো, অর্থনৈতিক ঝুঁকি সবটাই আমার। লোকসানের দায় আমি একা বহন করবো। লাভ হলে সেটা জমা পড়বে সংগঠনীর তহবিলে। এমন কি টাকা পয়সা জোগাড়-যন্ত্র করার ব্যাপারেও

থাকবো আমি একা। এবার সকলের মুখে হাসি ফুটলো। প্রস্তাব গৃহীত হলো ওই শর্তে।

ঝোঁক এবং উত্তেজনার বশে আমি কি হিমালয় মাথায় নিলাম? না। আমি বিশ্বাস করতাম, আজও করি —উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় এবং সংকল্পে যদি ভেজাল না থাকে তবে কোনো অভাবের প্রাচীরই তাকে আটকে রাখতে পারে না। অস্বীকার করবো না, এক ধরনের উত্তেজনা অবশ্যই কাজ করছিলো আমার মধ্যে। সে উত্তেজনা বৃহৎ এক কাজে নিজেকে লিপ্ত করতে পারার তীব্র ইচ্ছা।

সভা ভাঙলে হরিপ্রসাদ, দীপক আর শিশিরকে নিয়ে বসলাম। শিশির মানে শিশির ভট্টাচার্য। এখন মহারাজ শিবানন্দ গিরি নামে যিনি বিখ্যাত। শিশির কেন স্ত্রী কন্যা পরিত্যাগ করে সাধুবাবা হলো, কেন সংস্কৃতি জগৎ তাকে ধরে রাখতে পারলো না সেও এক মহাভারত। সে মহাভারত বর্ণনা করার সুযোগ পরে আসবে। পরে বলবো সেই বিস্ময়কর কাহিনী। তবে একটা কথা বলা দরকার, শিশির যাত্রা করতে খুবই ভালোবাসতো। বহুবার তার যাত্রাভিনয় আমি দেখেছি।

আমি সকল যাত্রাদলকে নিমন্ত্রণ করার জন্য একটি চিঠির নকশা করে দিলাম। গোটা কুড়ি কপি করতে বললাম হরিপ্রসাদকে। চিঠিটা হবে নিতান্তই ব্যক্তিগত। স্বাক্ষরও করবো আমিই। আমন্ত্রণ পেয়ে ১৯৬১ সনের ১৪ জুলাই ১৬/২ বিডন স্ট্রীটে, 'আনন্দম' সংস্থার কার্যালয়ে সবগুলো যাত্রাদলের প্রতিনিধি এলেন। নট্ট কোম্পানীর সূর্যকুমার দত্ত ও আশুতোষ সাহা, সত্যম্বর অপেরার শৈলেন মোহান্ত ও হরিপদ বায়েন, নবরঞ্জন অপেরার জীবন দাস ও কমল খাঁ, নিউ রয়েল বীণাপাণির নারায়ণ ভট্টাচার্য ও শম্ভু ঘোষ, তরুণ অপেরার সুধীর মণ্ডল ও শক্তি মুখারজি, নাট্যভারতীর অভয় সাহা, আর্য্য অপেরার অতুলকৃষ্ণ বসু মল্লিক, নিউ গণেশ অপেরার আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভয় হালদার, অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর অশ্বিনী দাস, ধ্রুতিশ্রী অপেরার পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, ক্যালকাটা মিলন বীথির অরূপ নিয়োগী, নিউ আর্য্য অপেরার অবিনাশ কুণ্ডু। ব্যক্তিগতভাবে এসেছিলেন বড় ফণিবাবু, পঞ্চু সেন, বিজয় মিত্র।

সে এক অভাবিত সম্মেলন। এক রাউণ্ড চা খাওয়ার পর আমার বক্তব্য রাখলাম আমি। আমার স্বপ্ন, আমার সংকল্প, আমার কল্পনার ব্যাখ্যা এবং পরিকল্পনা শোনবার পর দেখি সকলের চোখেই বোবা বিস্ময়। কেউ আর মুখটি

খোলার নাম করে না। এক সময়ে ওঁরা সকলে এমনভাবে তাকায় আমার দিকে যে, আমারই মনে হচ্ছিলো সকল শক্তি আর উদ্যম বুঝি জল হয়ে যাবে। ওঁরা কি ভাবছেন আমার মাথা খারাপ? ভাবছেন কি অনিবার্য নিয়তি আমাকে শ্মশানের দিকে টানছে? নাকি ধরে নিয়েছে দুষ্টলক্ষ্মী ভর করেছে আমার মাথায়? সকলের নীরব দৃষ্টিতেই অবিশ্বাস আর অবিশ্বাস। অনিশ্চয়তা, অসহায়ত্বও দেখেছি ওঁদের চক্ষে।

অনেক পরে আশুবাবু কথা বললেন, 'শুনতে ব্যাপারটা বেশ জমকালো কিন্তু আমরা আপনার দিকে তাকিয়ে বলছি, এই সর্বনাশা খেয়ালে আপনি হাত দেবেন না। এটা কলকাতা শহর। একটাও দর্শক পাবেন না।' শৈলেন মোহান্ত বললেন, 'কলকাতার বাজারে টাজারে যাত্রা হয়—সব ফকটের দর্শক। আশুবাবু ঠিকই বলেছেন। আমরা চাই না আমাদের জন্য আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হোন। কলকাতার ভদ্রলোকরা টিকিট কেটে যাত্রা দেখবে না।' তারপর একে একে সকলের মুখেই ওই এক কথা। ওঁরা ভরসা তো পাচ্ছেনই না, বিশ্বাস করতেও কষ্ট পাচ্ছেন, কলকাতায় যাত্রা উৎসব হতে পারে। সূর্যবাবু বললেন, 'একবার দেখলে ক্ষতি কিসের।' বড়ফণিবাবু বললেন, 'সকলে মিলে খরচ-খরচা করে একটা এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখতে দোষ কোথায়?'

ব্যাস, যেই না বলা অমনি সকলের উঠিউঠি ভাব। আমি বুঝতে পারছিলাম, একে যাত্রাশিল্পের ভয়ঙ্কর দুর্দশা, তার ওপর আবার টাকা দিয়ে গান! কভি নেহি কভি নেহি।

ওই মুহূর্তে আমারও হতাশ হবার কথা। সন্দেহ আসতে পারতো, এই জগদ্দল পাথরটাকে নাড়ানো আমার কম্ম নয়। ঠিক তখন শিশিরকে আর এক রাউণ্ড চা আনতে বললাম। তাকিয়ে দেখি দীপকের মুখ শুকনো। কানের কাছে মুখ এনে বললো, 'আর নয় দাদা। ওঁরাই যখন ভরসা পাচ্ছে না।' আমার দু'চোখ ছলোছলো হয়ে এলো। চোখ বুঁজলাম। হে ইষ্ট, আমাকে কি ফিরতে হবে! আমার ওপর কি তোমার ভরসা নেই, আশীর্বাদ নেই? সঙ্গে সঙ্গে মন স্থির করলাম, সংকল্প দৃঢ় হলো: হে ইষ্ট, আমি যদি তোমারই অংশ তবে আমি যা বলবো, সে কথা তোমারই। আমার প্রতিজ্ঞা তো তোমারই প্রতিজ্ঞা। সঙ্গেসঙ্গে আশ্চর্য এক প্রেরণা পেলাম।

তাকিয়ে দেখি উঠিউঠি লোকগুলো আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বললাম,

অর্থকরী সকল ঝুঁকি আমার। প্যাণ্ডেলের, আসরের, প্রচারের যাবতীয় খরচও আমার। দলগুলো পাবে সেলের ৫০ ভাগ। দর্শক? সে-হিসাব আমি করেই নিয়েছি। কলকাতাও শহরতলিতে ১৯৪৭-এর পর যত পূর্ববঙ্গের লোক এসেছেন তাঁদের মোটামুটি একটা হিসেব আমি সংগ্রহ করেছি। ওঁরা দীর্ঘকাল সাধের যাত্রা দেখতে পাননি। এই বঙ্গের একজন দর্শকও যদি আমার উৎসবে না আসেন, তাহ'লেও আমার পরিকল্পনা ফেল করতে পারে না।

মধুরেণ সমাপয়েৎ। এবার সকলের মুখে নির্ভয় হাসি।

সবাই একেএকে সভাস্থল ছেড়ে প্রস্থান করলেন, বসে রইলেন কেবল ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ। ডানদিকে দীপক উপস্থিত ব্যক্তিদের স্বাক্ষরের খাতা নাড়াচাড়া করছিলো। শিশির কেমন বিষণ্ণ হয়ে আছে। বড়ফণিবাবু খপ করে আমার হাত দু'টো চেপে ধরলেন, 'ওরা অন্ধ, ওরা মূক…' তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী এবং আর্দ্র, 'বুঝতে পারেনি…চিনতে পারেনি আপনাকে…' বার-কয়েক মাথা ঝাঁকালেন, 'কিন্তু আমি চিনতে পেরেছি। দেখতে পারছি গোবিন্দ, কৃষ্ণকমল, শিশুরাম, পরমানন্দকে একই অধিকারী রূপে।' ঘনঘন চোখ মুছছিলেন



বড় ফণিবাবু। উঠে দাঁড়ালেন। উঠতে হলো আমাকেও। আমার দু'টো হাতই ওঁর মুঠোর মধ্যে ধরা। সে-হাত কপালে ছোঁয়ালেন, বললেন, 'আপনাকে যিনি পাঠিয়েছেন, যিনি প্রেরণা এবং উদ্যম দিয়েছেন আপনার মধ্যে, দিয়েছেন আশ্চর্য সৎ-সাহস এবং শক্তি, সেই মহাশক্তিধরকে প্রণাম জানাই।'

বড় ফণিবাবু চলে গেলেন। দীপক বললো, 'দাদা, একটু আগেও সন্দেহ আর অবিশ্বাস ছিলো কিন্তু আশ্চর্য, এখন মনে হচ্ছে আপনি পারবেন।' শিশির বললো, 'কাদের-সব নাম বলে গেলেন বড়ফণিবাবু! কৃষ্ণকমল, পরমানন্দ ওঁরা কে?' বললাম 'চিনি না।' সত্যিই তখন জানা ছিলো না ওঁদের পরিচয়।

অভিমানে কেঁদে ফেলা সেই অলক এখন অলক মিত্র। সে আনন্দবাজারের স্টাফ ফটোগ্রাফার। আন্তর্জাতিক স্থিরচিত্র প্রতিযোগিতায় কয়েকবার প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্ত চিত্রী। ও কি সেদিন জানতো শোভাবাজার রাজবাড়ির অফিস-ঘরে লীনার হাত থেকে পাওয়া রজনীগন্ধার মালার সঙ্গে সত্যিই দেওয়া ছিলো সবে-যৌবনে-পা-দেওয়া একটি মেয়ের হৃদয়ের ভালোবাসা? নাকি লীনার আবিষ্ট মন অলককে কল্পনায় আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিলো? অথবা এমনও তো হতে পারে কারও কিছুই জানা নেই, বোঝা নেই,—হঠাৎ কৌতুকবশে ঘটে গেছে ঘটনা! এবং সে ঘটনা ঘটিয়েছেন কে? কেন ঘটিয়েছিলেন? শুনেছি লীনার খুব বড়ো ঘরে, ভালো বরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো। কিন্তু লীনার কপালে সংসার এবং স্বামীসুখ নেই। শুনেছি বিয়ের বছর দু'য়েকের মধ্যে সে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলো। সেকি সুখমৃত্যু অথবা স্বেচ্ছামৃত্যু কে বলতে পারে! অলক এখন বিবাহিত, সুখী—সেই একটি দিনের আকস্মিক ঘটনাটা হয়তো তার মনে নেই। জানেও না লীনা এখন কোথায়। আর লীনা দেহত্যাগ করার পরেও কি একটি অভিমানী সরল, সুন্দর একটি ছেলের গলায় মালা দেওয়ার স্মৃতি ভুলে যেতে পেরেছে?



মত তো পেলাম দু'পক্ষেরই কিন্তু কোথায় জায়গা? শেলীদি আর আমি জায়গার সন্ধানে দৌড়োই। প্রফুল্লদার ওখানে যাই। যদি বিনা খরচে একটি পার্ক পাওয়া যায়। অনেক দৌড়াদৌড়ির পর হতাশ হ'তে হলো। মাঠের জন্য চাই ভাড়া, কর্পোরেশনের ট্যাক্স ইত্যাদি। দীপককে নিয়ে ছুটি প্রমোদকর রেহাইয়ের ধান্দায়। রবীন্দ্রভারতী, স্টেট একাডেমি, কালেকটরেট, মন্ত্রী কিছু বাকি নেই। সবাই বই খুলে দেখান, যাত্রাকে প্রমোদ-কর থেকে রেহাই দেবার কথা আইনের কোথাও লেখা নেই। প্রফুল্লদাকে বলাতে তিনি জানালেন, আইন বহির্ভূত কোনো কাজ তাঁর পক্ষে করা সম্ভব নয়। প্রয়োজনে

আমরা সভাপতি বদল করতে পারি। অগত্যা ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়। তিনি যাত্রার কথা শুনেই চমকে উঠলেন। বললেন, 'কলকাতায় টিকিট বেচে যাত্রা! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! না-না, যাত্রাফাত্রা কলকাতায় চলবে না।' যতো বোঝাই তিনি কানই দিতে চান না। অবশেষে বললেন, 'গ্রামগঞ্জের দিকে দেখ না, বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে—যাত্রা গ্রামেই মানায়।' অনেক কষ্টে তাঁকে বোঝানো গেলো কিন্তু প্রমোদকর থেকে রেহাই? অসম্ভব। বললেন, পি. কে সেনের কাছে যেতে। তিনিই নাকি পারেন। অবশ্য যদি আইনে থাকে।

ছুটি রাইটার্স বিল্ডিংসে পি. কে সেনের কাছে। দু'দিন সময় চান তিনি। এবং দু'দিন পর বইখানার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন. তিনি দুঃখিত।

এদিকে শেলীদি খবর আনলেন, শোভাবাজার রাজবাড়ির। দু'জনে গেলাম। পরিচয় হলো নতুনদা অর্থাৎ সুভাষ দেবের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'এবার ঠাকুরবাড়ি ভাগে পেয়েছেন যিনি, তাঁকে বলে দেখবো।' পরদিন সকালে আবার। তারপর দিন আবার। এমনি করে পঞ্চম দিনে ঠিক হলো পঞ্চাশ টাকা প্রত্যহ ভাড়া এবং প্রত্যহ ষাটটি প্রবেশপত্র বিনামূল্যে। আমি তাতেই রাজি। প্যাণ্ডেল ও ইলেকট্রিক ডেকোরেশন একটি বিরাট খরচের ব্যাপার। আমি সর্বমোট তিনশো তেত্রিশ টাকা হাতে নিয়ে নেমেছি। যাঁরা এ-ব্যাপারে এসেছিলেন, তাঁদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে একটি আবেদন রাখলাম। বললাম: আমার সাধ যত সাধ্য একবারেই নেই। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি কারও টাকাপয়সা এখানে মার যাবার সম্ভাবনা নেই। এ্যাডভান্স হিসেবে সামান্য একটা টোকেন মানির বেশি আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সেল-প্রসিডস থেকে প্রত্যেকের পাওনা শোধ করার ব্যবস্থা থাকবে। যাঁরা আমার সঙ্গে কাজ করবেন পার্টলি তাদের একটা ঝুঁকি নিতেই হচ্ছে।

জানিনা আমাকে ভালবেসে নাকি কেবলই কথার জাদুতে মুভ্‌ড্‌ হয়ে এগিয়ে এলো এক যুবক। নাম অমর শেঠ, ইউনিভারসাল ডেকোরেটরের লোক। বয়স বছর পঁচিশেক, দীর্ঘকায়, রঙ্‌ ফরসা। ও আমার কাছে একটি রুপোর টাকা চাইলো। ছাপানো একটি কনট্রাক্ট ফরম মেলে দিলো সই করার জন্যে। বললো, 'আপনি সই করে দিন, আমি আপনার সঙ্গে কাজ করবো। তবে সেল প্রসিডস থেকে রোজ আমাকে কিছুকিছু দিতে হবে।' সই করলাম।

এন সি পালের গোপীচন্দ্রও অমর শেঠের পথ অনুসরণ করলো। একটা রূপোর টাকা অগ্রিম নিয়ে সে চুক্তি করলো ইলেকট্রিক ডেকোরেশনের। জয়চাঁদবাবু, যিনি বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর মুদ্রণকার্য করতেন, তিনি নিলেন টিকিট, নিমন্ত্রণপত্র, হ্যাণ্ডবিল, ব্রোসিয়ার ছাপার দায়িত্ব। জয়চাঁদবাবুকে আমি দাদু বলে ডাকতাম। খুবই স্নেহ করতেন আমাকে। এবং তুই তোকারী করতেন। আলোচনার সময় বললেন, 'আমাকে তা হ'লে দে একটা রূপোর টাকা।' বললাম, 'দাদু হয়ে নাতির কাছ থেকে এ্যাডভান্স চাইছো?' হেসে ফেললেন, 'যেমনভাবে পারিস দিস। আমি জানি টাকা আমি পাবোই।'

আস্তে আস্তে সবগুলো জটই খুলে যাচ্ছিলো। আটকে পড়লাম দু'টো জায়গায়, এক. প্রমোদ-কর থেকে রেহাই যদি না পাওয়া যায় তবে কালেক্টরীতে মোটা টাকা জমা করতে হবে। এবং তা না করতে পারলে টিকিট রিলিজ হবে না। দুই. সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের জন্যও প্রত্যহ বেশকিছু অর্থের প্রয়োজন। আমি আর শেলীদি আবার প্রফুল্লদার সঙ্গে সকালের দিকে দেখা করলাম। আমার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার সব খুঁটিনাটিই তিনি জানতেন। তবু আর একবার বললাম, 'যাত্রাদলের অবস্থা খুবই খারাপ। চাহিদা কম কিন্তু খরচ বেশি। এই উৎসব যদি আলোড়ন তোলে তবেই অবস্থা পরিবর্তনের একটা পথ খুলে যাওয়া সম্ভব।' সুতরাং প্রমোদকর থেকে রেহাইয়ের ব্যাপারটা যদি পুনর্বিবেচনা করা হয়। প্রফুল্লদা বললেন, 'অসম্ভব।'

এর মধ্যে টিকিট ও কার্ড ছাপা হয়ে গেছে। কালেক্টরী থেকে সন্ধ্যার দিকে ফিরে দীপক কাঁদতে শুরু করে দিলো। বললো, ওরা নাকি খুব অপমান করেছে দীপককে। বড়বাবু বলেছে, 'কারও শক্তি নেই এই উৎসবকে প্রমোদকর থেকে রেহাই দেয়।'

আবার উত্তেজনা। পরদিন বেলা সাড়ে এগারোটায় দীপককে নিয়ে আমি কালেক্টরীতে গেলাম। কথায় কথায় আবার তর্কাতর্কি। বড়বাবু বললেন, যাত্রাকে একজেম্পটেড করা যায় না। কারণ আইনে এ-রকম কথা লেখা নেই। আমি বললাম, 'যাত্রা তো নাটকই। অভিনয়ের ফর্মটা শুধুই আলাদা। তবে কেন একজেম্পশন পাবে না যাত্রা?' বড়বাবু পান চিবোতে চিবোতে বললেন, 'উহুঁ উহুঁ—হইলো না। যাত্রা হইলো গিয়া অপেরা। মানে মিউজিক্যাল ড্রামা আর কি। ওইখানেই যত গুলমাল।'

আমি বললাম, 'তার মানে নাটক তো ?'

'না।'

'কেন ?'

'আমাগো এ্যামিউজমেণ্ট ট্যাক্স অ্যাক্ট তাই কয়। তবে হ্যাঁ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যদি স্বীকার করে যে যাত্রাপালা হইলো গিয়া নাটক—তাইলে কনসিডারের প্রশ্ন আইবার পারে।' কথায় কথায় জেদ এসে উপস্থিত। আমি বললাম, 'কিন্তু একজেম্পশন যে আমার চাই-ই চাই।' ভদ্রলোক উপেক্ষার হাসির টুকরো ছুঁড়ে দিলেন, 'হইবো না।' আমি বললাম, 'হবেই।'

আমার মনে হচ্ছিলো, জেদের বশে আমার মুখের কথাগুলো কেউ জুগিয়ে যাচ্ছে। বললাম, 'বাজিতে আসুন।'

'কী বাজি ?'

'একজেম্পশন পেলে আপনাকে চেয়ার ছেড়ে দিতে হবে। না পেলে আমি আপনার চাকর হবো।'

কথা শুনে ভদ্রলোক একবার চমকে উঠলেন দেখলাম।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন চলছিলো। হঠাৎ একটা চিঠি এলো কালেক্টরী থেকে : সোমবারের মধ্যে প্রমোদ করের টাকা জমা দিতে হবে।

এ-দিকে প্যাণ্ডেলের কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়ে আসছে। একশো বাই নব্বই ফুট আসরের তিনদিকে বসানো হয়েছে গ্যালারী। গোপীচন্দ্রও ইলেকট্রিক ডেকোরেশনের কাজ টুকটুক করে যাচ্ছে। আমি সাত সকালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে আসি। প্রাঙ্গন থেকে নাচঘরের দিকে যাওয়ার প্যাসাজের বাঁ দিকে একটা ঘরে আমার বসার এবং থাকার জায়গা করা হয়েছে। রবিবার নানা জায়গায় দৌড়ালাম। টাকা পাওয়া যায়নি। সোমবার সকাল নটায় একটা চিঠি দিয়ে সর্বেশ্বরকে পাঠালাম আমার স্ত্রীর কাছে। বিপদের কথা জানিয়ে গয়নাগুলো দিতে বলেছিলাম। সর্বেশ্বর সাড়ে দশটায় ট্যাক্সি করে গয়নার বাক্স নিয়ে এলো। বাক্সটা নতুনদার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'আমার কিছুই জানা নেই এ-ব্যাপারে। কিন্তু হাজার ছয়েক টাকা অন্তত চাই।'

নতুনদা পাঁচ হাজার তিন শো টাকা এনে দিয়েছিলেন। তাই দিয়ে কার্ড এবং তিনদিনের টিকিট স্ট্যাম্প করিয়ে আনা হলো। কার্ড হাতে বেরিয়ে পড়লাম আমি আর শেলীদি। যদি কিছু ডোনেশন জোগাড় করা যায়।

বারো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চারদিকে হতাশা আর হতাশা। ব্রোসিয়ারে বিজ্ঞাপন বাবদ প্রীতিবাবু সামান্য কিছুকিছু টাকা অগ্রিম জোগাড় করে দিচ্ছিলেন। তা, আর ডোনেশন বাবদ কিছুকিছু পাওয়া অর্থে চলছিলো বিজ্ঞাপনের খরচ। কাউণ্টারে রোজ সকাল সন্ধ্যা বসা হয় কিন্তু লোকের নামগন্ধ একেবারে নেই।
বৃষ্টি নামলো ষোলো তারিখের দুপুরে। যাত্রার অঙ্গন জুড়ে জল আর জল। অমর এসে বসলো বিরস মুখে। কী ব্যাপার? ও বললো, যাত্রা নির্বিঘ্নে করতে হলে গোটা অঙ্গনটাই প্ল্যাঙ্কিং করা দরকার। তক্তা কিনতে হবে। কিন্তু টাকা নেই।
হায় টাকা, হায় টাকা! আমার মাথা ঘুরতে লাগলো বনবন করে। কেঁদে ফেললাম: তুমি আমাকে এ কী পরীক্ষায় ফেললে ঠাকুর!



সেই পাটাতন করা আসর ভাসতে চলেছে। আকাশ কাঁদছে। অলক কাঁদছে। আমি কি সত্যি হেরে যাবো?

বারো

হঠাৎ খবর এলো, হরিপদ বায়েন ইহলোক পরিত্যাগ করে স্বর্গধামে গমন করেছে। ভরা আষাঢ়ের ঝরঝর বাদলের এক বর্ষণক্লান্ত গভীর রাত্রে এক হাতে গামছা অন্য হাতে গাড়ু নিয়ে হরিপদ বেরিয়ে পড়েছিলো। পরদিন সকালে নাকি দেখা গেলো তার দেহটা কাঁঠাল গাছের ডালে বাঁধা গামছার সঙ্গে ঝুলছে। গলায় ফাঁস। চিৎপুরে ছড়িয়ে পড়লো খবর। সঙ্গেসঙ্গে গড়বেতা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম ফোনে। জানলাম সুইসাইড কেস। দেহ ভস্মীভূত হয়েছে দিন দুই আগে। সুতরাং পোস্টমর্টেমের প্রশ্নই আসে না।

আমি আঁতিপাতি করে সেই চিঠিটা খুঁজি। হরিপদ বায়েনের শেষ চিঠি। দিন পাঁচেক আগেই এসেছে চিঠিটা। হরিপদ লিখেছে, 'ঠিক রথের দিন সকালে আমি পঁহুচাইয়া যাইব। আপনি আমাকে বাঁচাইয়াছেন, জীবনের বাকি দিন-গুলান যাহাতে মাখনের ওখানে কাজ করিয়া শান্তি পাইয়া যাইতে পারি তাহার ব্যবস্থাও আপনিই করিয়াছেন। মাখনকে বলিবেন, আমি রথযাত্রার দিনই জয়েণ্ট করিব...'। পড়তে পড়তে মুচড়ে উঠলো বুক। দু'চোখ ছেপে জল এলো। এই তো মাসখানেকও হয়নি, সাইকিয়াট্রিক নার্সিং হোম থেকে উন্মাদ হরিপদকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে আমার বাসায় নিয়ে এসেছিলাম। দু'দিন ও থাকলো। কত গল্প, কত কথা। আমরা একসঙ্গে বসে তাস খেললাম। তৃতীয় দিন সকালে কানাই-এর সঙ্গে বাড়ি গেলো হরিপদ। কানাই বায়েন হরিপদর পরমপ্রিয় ভাই। সিঁড়ির কাছে যেতেই প্রণাম করলো। চোখের জলে ভেজা মুখ তুলে তাকালো, 'জীবন আপনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। কাজ না করলে লক্ষ টাকার ঋণ শোধ হবে না। মহাজনেরাও ছাড়বে না। একটা চাকরী দিয়ে আমাকে বাঁচাবেন।'

চাকরী দিতে রাজি হয়েছিলো শৈলেন মোহান্তও। তবু আমি মাখনলাল নট্টকেই অনুরোধ করেছিলাম। মাখন রাজিও হলো। কিন্তু হরিপদর আর চাকরী-করা হলো না।

আগে বলেছি, হরিপদ আটবার আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই আত্মহত্যাই তার জীবন-দীপ নির্বাপিত করলো। ভাগ্য তার সঙ্গে সারাজীবন ধরেই লুকোচুরি খেলা খেলেছে। অনেকটা রৌদ্রছায়ার মতো। ওই সীমা অতিক্রম করার আগেই নেমে এলো মহানিশা।

চিৎপুর জুড়ে শোকের ছায়া অবশ্যই নামেনি, এই হারানোর বেদনা সকলকে সমানভাবে স্পর্শ করবে সেটাও বোধ হয় আশা করা অন্যায়। সে-দিনের চিৎপুরের ছবিটা দেখলে বোধ হয় যে কোনো দরদী মানুষই ধুত্তোরি বলে চিৎপুর পরিত্যাগ করতেন। ফিরে আর আসতেন না। মৃত্যু এখানে জীবনেরই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি। যে চিৎপুর ইমোশনের খনি, যে-যাত্রা নিজে না কেঁদে মানুষকে কাঁদাতে অভ্যস্ত—সেখানে তো সবই মেকি, সবই নকল। বরং হরিপদর মৃত্যুতে যদি কান্নার বান ডেকে যেতো চিৎপুরে, তবেই সন্দেহের কারণ থাকতো। মৃত্যুর রঙ এখানে গেরুয়া নয়। মৃত্যু নয় পবিত্রও। তার মানে কি এই. চিৎপুর মহাজীবনের সব সত্য হজম করে বসে আছে? তাও নয়। এ এমন একটা জগৎ যেখানে খুনী কি পাপী পরম সাধুর পাশাপাশি, অঙ্গাঙ্গী বাস করে। ওরা জানে জীবন যেমন সত্য, মৃত্যুও তাই। সুতরাং যেটুকু পারো নাও, যতো পারো আদায় করো।

হরিপদ বায়েন আসলে একাই ছিলো একটি ইনস্টিটিউশন। যাত্রার সেলসম্যান-শিপে দক্ষ। তার কাছে পাঠ নিয়েছে অনেকে, সাহায্য সহায়তা বুদ্ধি নিয়ে আজকের যাত্রায় প্রায় প্রত্যেকেই পজিশন করে নিয়েছে। গুরুর মৃত্যু সংবাদে তাদের দৃষ্টিরেখা পালটাতে দেখিনি। অথচ নিরাপদ দাস, বাস্তবিকপক্ষে যে ছিলো হরিপদর একমাত্র প্রতিযোগী. তাঁকে দুঃখ প্রকাশ করতে দেখেছি। নিরাপদ দাস অবশ্য তখনও তার কমিশনের ব্যবসায়কে হরিপদর মতন সারা দেশ জুড়ে ছড়াতে পারেনি। কিন্তু দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর বাঁকুড়ায় ওর যে শক্ত ঘাঁটি, সেখানে বহুবার দাঁত বসাতে গিয়েও হরিপদকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। নিরাপদ দাসের দু'চক্ষু অবশ্যই বান ডাকার মতন হয়নি কিন্তু বলতে শুনেছি, 'এমন একজন প্রতিযোগী না থাকলে কাজ করে আনন্দ কোথায়? 'হরিপদর মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গে আমার জেদ-এর মৃত্যু হলো।'

হরিপদ কি সৎ ছিলো? এই প্রশ্ন আমাকে করলে আমি বলবো, সৎ থেকে

সততার উদ্ভব যদি হয়ে থাকে তবে তাকে অসৎ বলার উপায় নেই। অনেক পণ্ডিতকেই বলতে শুনেছি, কর্মই ব্রহ্ম। জীবনাবসানে মানুষের কী থেকে যায়? কর্ম। হরিপদ বায়েন যে-কাজ করতো—তাতে ছলনা, মিথ্যাচার, কূটকৌশল অবশ্যই প্রয়োজন। এবং তা বর্জন অবশ্যই করেনি সে। করলে তার কর্মকীর্তি থাকতো না। কিন্তু যে-কাজ হরিপদ করতো—সেই কাজের প্রতি তার সততার অভাব ছিলো না। যাঁর নুন খেয়েছে তাঁকে দিয়েছেই কি কম? গৌরদা, সত্যম্বরের গৌর দাস একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'শৈলেন অসততা একেবারে সইতে পারে না। হরিপদকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি তাই। তুমি কী বলো?' আমি বললাম, 'ব্যবসায় মাত্রই তো অসৎকর্ম। একটা সাধু লোক বসিয়ে যদি দেখা যায় লসে লসে কোম্পানী লাটে উঠতে বসেছে, তখন কি মালিকের চোখে তার আদর বেশি হবে, নাকি যে হাজার দিয়ে দু' দশ টাকা এদিকওদিক করে তাকে আদর করতে ইচ্ছে করবে?' গৌরদা দুঃখ করে বললেন, 'এ-যুক্তি শৈলেন মানে না।'

নিজে গরীব ছিলো বলে অথবা দারিদ্র্যের জ্বালা দীর্ঘকাল সহ্য করতে হয়েছে বলে অভাবীদের প্রতি হরিপদর টান ছিলো। ছিলো প্রবল গুরুভক্তি। এবং মানুষকে আদর, যত্ন, সম্মান দিতেও হরিপদর জুড়ি দেখিনি। এতো যে সৎ গুণ তা কোন কাজে লাগলো তার?

হরিপদ বায়েনের একটি জন্ম-পত্রিকা ছিলো। প্রায়শই ওই ঠিকুজি অর্থাৎ জন্ম-পত্রিকা মেলে বসে থাকতে দেখতাম। কোষ্ঠীর ফল অনুযায়ী অনেক কিছু পাওয়ার কথা তার। অন্তত সে-রকম ফলাফলই লেখা ছিলো তার জন্ম-পত্রিকায়। কিন্তু কী পেয়েছিলো সে? মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানায় শতখানেক বিঘা নিস্ফলা জমি এবং গড়বেতা শহরের উপকণ্ঠে অনেকটা জায়গা নিয়ে একটি বাড়ি ছিলো বলে হয়তো তাকে ল্যাণ্ডলর্ড বলা যেতে পারতো। আমি নিজে গিয়ে দেখেছি, ধবনীতে একটা দ্বিতল মাটির বাড়ি, কিছু গরু, মোষ, ছাগল, মুরগী নিয়ে এক ছোট সংসার। একজন লোক অবশ্যই ছিলো সেখানে। সে এককালে ছিলো হরিপদর বন্ধু। একসঙ্গে রঞ্জন অপেরা থেকে দু'জনে পালিয়েছিলো। ভদ্রলোক সেই থেকেই রয়ে গেছে এখানে। শতখানেক বিঘা শুকনো জমি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দিন গুণছিলো। কবে ক্যানেলের জল ছাড়া হবে তবে হবে চাষবাস। বহুদিন হরিপদ আমাকে বলেছে, ক্যানেলে

জল এলেই সে যাত্রার চাকরী ছেড়ে চলে যাবে ধবনীতে। ওখানে বাকি জীবনটা চাষবাস নিয়ে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু জীবৎকালে ওই ক্যানেলে জল আসার শুভ লগ্ন দেখে যেতে পারেনি সে।

প্রায়শ দেখতাম একজন গোলগাল বেঁটে মতন ফর্সা বয়স্ক লোক নীরবে এসে দাঁড়াতেন। তৎক্ষণাৎ হরিপদ তার বিছানার তোষক তুলে রোল-করা কয়েকটা দশ টাকার নোট হাতে তুলে দিতো তাঁর। মুখে একটু প্রশান্তি ছড়িয়ে ভদ্রলোক যেমনটি এসেছিলেন তেমনি চলে যেতেন। একটি কথাও কোনোদিন তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে শুনিনি। বহুদিন ভেবেছি জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু পারিনি। বলা যায় কি হরিপদ এই প্রশ্নকে কেমনভাবে নেবে? একদিন সকালে ধরা পড়লো আসল রহস্য। নট্ট কোম্পানীর তখন খুবই দুর্দিন। একটা অর্থকরী সমাধানের ব্যাপারে সকালে আমার আসার কথা। মাখন বলেছে, সে অপেক্ষায় বসে থাকবে। হাজার দশেক টাকা সকালেই তাকে জোগাড় করে দিতে হবে। ট্যাক্সি করে আসছিলাম। ঠিক শোভাবাজার মোড়ে এসে কী মনে হলো, ট্যাক্সিটাকে থামতে বললাম। নেমে পড়লাম। ভাবলাম একবার হরিপদর খবরটা নিয়েই যাওয়া যাক।

ওপরে উঠতেই দেখি সেই ভদ্রলোক আর হরিপদ খুব ঘন হয়ে বসে কিছু একটা দেখছে। আমাকে দেখে ভদ্রলোক চমকে উঠলেন মনে হলো। অপ্রস্তুত হরিপদ বাধ্য হলো বলতে, 'আসুন, আসুন দাদা।' দেখলাম একটা মোটা খাতার ওপর হরিপদর ছকটা মেলা। তাড়াতাড়ি গুটিয়ে বা সরিয়ে ফেলতে পারেনি। অপ্রস্তুতের হাসি হেসে হরিপদ বললো, 'সময়টা কেমন যাবে দেখিয়ে নিচ্ছিলাম।' ভদ্রলোক বললেন, 'বাবা হরিপদ, আমি তাহ'লে যাই।'

'আসুন বাবা…', বলে হরিপদ এগিয়ে গেলো। ভদ্রলোককে নিয়ে দরজার বাইরে যেতে দেখলাম। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এলো হরিপদ। কাছে আসতে আসতে বললো, 'আমার গুরুর মতন।' তক্তপোষটা ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, 'তান্ত্রিক, তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। রোজ শ্মশানে বসেন। শবের ওপর বসে সাধনা করেন। দেড় মণ ফুল লাগে রোজ…', হাতে কাজ করতে করতে আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, 'চোখটা দেখলেন না, কেমন লাললাল আর মণিটা একেবারে সাদা…। সাধনা করতে করতে এই…হ্যাঁ।' হরিপদ ততক্ষণে তক্তপোশের ওপর উঠে বসলো। এবার সে পুরো তৈয়ার।

আসলে হরিপদ এতক্ষণ ধরে সময় নিলো। ও তাকাচ্ছিলো না আমার দিকে। কেন! ধরা পড়বে বলে? কিন্তু কী ধরা পড়বে? তার মানে গোপন কিছু শলা চলছিলো কি!

'দেড় মণ ফুল!' আমি অবাক হই, 'অত ফুল পায় কোথায়?'

'তাজা ফুলে সাধনা চলে না।' হরিপদর গলা থেকে শ্রদ্ধার মধু ঝরে পড়ছিলো, 'রোজ শুকনো ফুল কিনতে হয়। বড়বাজারে পাওয়া যায়। তা—এই ধরুন রোজ লাগে টাকা তিরিশেকের মতন।' এতক্ষণে একটা বিড়ি ধরালো হরিপদ। ধোঁয়া ছাড়লো। একমুখ উজ্জ্বল হাসি. 'আপনার আশীর্বাদে ওটা আমিই রোজের রোজ দিয়ে যাচ্ছি।'

মনে হলো হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলাম আমি। সটান ভূতলে। লোকটা বলে কী! রোজ তিরিশ টাকার ফুল তাও আবার শুকনো! আবার বলছে আমার আশীর্বাদে! মনে কেমন খটকা লাগলো। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে মনে পড়লো, কিছু বলে হরিপদর বিশ্বাসের ভিত্‌টা আলগা করে দেওয়া বোধ হয় উচিত হবে না। কারণ আমাদের প্রবাদ বলেছে, বিশ্বাসেই নাকি সব পাওয়া, তর্কে বহুদূর। এতেই যদি হরিপদ শান্তি পায়, পাক। আবার ভাবি অবিশ্বাসের শিকার কি আমিও হয়ে পড়ছি না। এমনও তো হতে পারে, লোকটি সত্যিকারের তন্ত্রসাধক। এবং ঈশ্বরের অপার করুণায় হরিপদ সাক্ষাৎ গুরুর দর্শন পেয়েছে?

আমি তখন অন্যভাবে কথা বলি, 'সাধকরা এমন হয়। টাকাটা বস্তুত ওঁদের কাছে হাতের ময়লা। টাকা মাটি, মাটি টাকা। তাই নিতেও বাধে না, খরচ করতেও নয়।'

হরিপদ এবার গড়গড় করে সব কথা বলতে শুরু করে। তার নতুন গুরুর ঠিক-ঠিকানা, অন্ধিসন্ধি, কূল পরিচয়—সব। থাকেন কাছেই। স্ত্রী নেই। সংসারে একটি বিধবা কন্যা, একটি বেকার ছেলে। ঘরেও মায়ের আসন আছে। সেখানেও রোজ ভোগ হয়।

'ছকটা কি ওঁরই করা?'

'হ্যাঁ।' হরিপদ মাথা চুলকোয়। 'বলছিলেন সময়টা নাকি দারুণ পড়েছে। দশা অন্তর্দশা মিলিয়ে দাদা, আমার এবার দারুণ সময় আসছে।'

'ভালোই তো' আমি বলি, 'দল করবেন নাকি?'

'আপনার আশীর্বাদ থাকলে।'

'আপনি তো বড় ঘরে বাসা বেঁধেছেন। তার মানে কোটিপতি নিশ্চয়।'

হরিপদ প্রণাম করে হাত জিভে ছোঁয়ায়।

'আজ কত দিলেন?'

'কী!' হরিপদ অবাক হয়।

'টাকা। গুরুজীকে আজ কত দিতে হলো?'

হরিপদ একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। সকালে শ্মশান থেকে ফিরে এলে দশ দিই। বিকেলে দিতে হয় কুড়ি। আজ, মানে, বাড়ি ভাড়াটা বাকি পড়েছিলো কিনা, তাই শ তিনেক টাকা দিতে হলো। আপনি আসার একটু আগেই...'

তার মানে, মনে মনে একটা আঁক কষি, কী পরিমাণ টাকা হরিপদর খরচ। এতো টাকা হরিপদ পায়ই বা কোথায়!

একটু পেছন ফিরি আসুন। সনটা সম্ভবতঃ ১৯৬৮। মাস অগ্রহায়ণ। হঠাৎ এল টি জি-র প্রাক্তন সদস্য এবং বিজন ভট্টাচার্যের প্রিয় শিষ্য নিমাই শূর অফিসে এসে হাজির। বললো, 'একটা উপকার করতে হবে দাদা।' উপকার! আমি সর্বদাই প্রস্তুত। বললাম 'কিসের, কার উপকার?' নিমাই বললো, 'আমার।' অর্থাৎ তার। 'আপনার আবার হলো কী?' নিমাই শূর ইতস্তত করে। 'ঠিক আমার নয়, বলতে গেলে আমারও—মানে দেবেশ।' এক মুহূর্ত ভাবি। 'দেবেশ! মানে এল টি-জির?' নিমাই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। 'ওরা ওথেলো করেছে। যাত্রায়। বড় ইচ্ছে আপনাকে একটা রিহার্সাল দেখায়।' ওথেলো! আমি উৎসাহিত হই. 'মানে যাত্রার আসরে গাইতে পারবে?'

নিমাই বললো, 'হ্যাঁ। আমার নিজের খুবই ভালো লেগেছে।'

সুতরাং সানন্দ সম্মতি। শেকসপীয়র নাট্য যাত্রায় আসুক এ-ছিলো আমার স্বপ্ন। একবার উত্তরপাড়া কলেজের একজন অধ্যাপক বন্ধুকে দিয়ে আমি রোমিও জুলিয়েত-এর পালারূপ করিয়েছিলাম। ভদ্রলোক মোটামুটি লিখেছিলেন। যখন তাঁকে বললাম, সিনগুলো এক এক করে নিয়ে বসতে হবে আমার সঙ্গে। আমি বলে দেবো, সিন-প্লটিং কেমন হবে। আমার দুর্ভাগ্য শেষ পর্যন্ত ওই পালাটি আসরে আনতে পারিনি। এখন যদি সত্যিই 'ওথেলো' নামে সেতো পরম আনন্দেরই কথা। নিমাই এই সূত্র ধরে একদিন দেবেশ চক্রবর্তী এবং বীরেন সাহাকে নিয়েও এলো আমার কাছে। আমি মহলা দেখতে গেলাম ওথেলোর। শেষ হলে ওঁরা

আমার কাছে প্রস্তাব রাখলো, অর্থাভাবে এমন একটি উদ্যোগ আসরে নামানো যাচ্ছে না। সুতরাং আমি যদি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি তবে নাকি ওরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। নিমাই শূর লেগে থাকলো আমার পেছনে। অতএব আমি শৈলেন মোহান্তকে প্রোপোজাল দিলাম, সম্ভব হ'লে এই টিমকে নিয়ে সে দু' নম্বর দল করতে পারে। অথবা দিতে পারে আর্থিক সাহায্যও। শৈলেন দিন দুই ভাবলেন। এবং তিন দিনের দিন দুঃখ প্রকাশ করলেন।

কী করা যায় তখন? আমি সমস্ত বিষয়টি হরিপদকে বললাম। হরিপদ উৎসাহ নিয়ে একদিন মহলাও দেখে এলো। এবং সেদিন রাত্রেই বললো, দল সে করবে কিন্তু অর্থ জোগানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে আমাকে। আমি গররাজি হইনি। বললাম, ওদের সঙ্গে ফয়সালা করে নিতে। এই সূত্রে দেবেশ চক্রবর্তী ও বীরেন সাহার সঙ্গে চুক্তি হলো, দলের নাম থাকবে এপিক অপেরা। ফিন্যান্সের কথা পরে ভাবা যাবে। হরিপদ ওদের গান থাক-বা না-থাক প্রত্যহ ছয়শত করে টাকা দিয়ে যাবে।

আমি আমার এক বন্ধু অনাথ বসুকে ধরলাম। সে রাজি হলো। এবং প্রথম কিস্তি বাবদ পাঁচ হাজার টাকাও দিলো। কাজ এগোতে লাগলো। স্থির হলো ডবল স্টেজে এ্যাকটিং হবে। একটা প্রোজেকটর কিনতে হবে। রাশিয়ান 'ওথেলো' ছবি থেকে ওরা কাটপিস জোগাড় করে আনলো। পর্দা তৈরি হলো। একটা প্রোজেক্টার ভাড়া করে এনে সিঙ্ক্রোনাইজেশনের কাজ শেষ করা হলো। প্রজেকটার পর্দায় ফেললো নীল সমুদ্র। দূরে জাহাজ আসছে। দু' নম্বর স্টেজে শান্ত্রীরা চেঁচিয়ে উঠলো, 'জাহাজ আসছে…জাহাজ আসছে'। আস্তে আস্তে জাহাজ কাছে এলো। যেখানে থামলো, পর্দার সেই কোণটা কাটা ছিলো, লাগানো ছিলো আর একটা পর্দা। ওই কাটা কোণ দিয়ে ওথেলো লাফিয়ে পড়তো দু'নম্বর স্টেজে। সেখান থেকে চলে আসতো আসল আসরে। বিজ্ঞাপন গেলো, সিনেমা-কাম যাত্রা —ওথেলো। তারপর সংবাদপত্রে ঢাউস ঢাউস বিজ্ঞাপন 'প্যাণ্ডেল খুলবেন না।' দেখতে দেখতে নায়েকদের ঘনঘন আনাগোনা। রেট সাড়ে তিন থেকে চার হাজার। আসরে আসরে উপচে-পড়া ভিড়। কুড়ি থেকে তিরিশ হাজার দর্শকের এক মিলন মেলা।

মাত্র পাঁচ হাজারে চলবে কতদিন? ততদিনে খরচ গিয়ে দাঁড়িয়েছে দশে। আরও টাকা চাই। অনাথ কোনো খবর দিচ্ছে না দেখে আমিই ছুটলাম তার

কাছে। কিন্তু সুরাহা হলো না। অনাথ বললো, 'এ অশুভ যাত্রা। কারণ যেদিন ও পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলো, সেইদিন রাত্রেই ওর মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সুতরাং এই অশুভ যাত্রায় টাকা দিয়ে অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হতে সে নারাজ। তারপর তাকে কিছু বোঝানো কঠিন। আমি সে চেষ্টাও আর করিনি।

এপিক অপেরার দু'নম্বর পালা তখন তৈরি হচ্ছে মহলায়। ওটাও ফিল্ম-কাম যাত্রা। মহাজনদের চোরাকারবার নিয়ে কাহিনী। জনরোষ কী ভাবে এই কালোচক্রের উচ্ছেদ করলো তাই ছিলো বক্তব্য। স্টুডিও ভাড়া করে সুটিং করা হলো। রোজ এসে বীরেন বসে থাকে। টাকা চাই, টাকা।

বরানগরের একজন মহিলার কাছ থেকে আমার স্ত্রী তিন টাকা সুদে দশ হাজার টাকা ধার করে এনে দিয়েছিলো। আমি টুকটাক করে জোগাড় করে দিয়েছিলাম দশ হাজার। তবু টান। অগত্যা চন্দ্রাবলী সিং সহায়। হরিপদ বললো, সে হুণ্ডি কেটে টাকা ধার করবে।

যে দেবেশদের নিয়ে এতো কাণ্ড, সেই দেবেশদের আমার হাতে যে তুলে দিয়েছিলো, সেই নিমাই শূরের কিন্তু আর পাত্তা নেই।

এপিক অপেরার হাকডাক দেখে হরিপদ বায়েন একজন পার্সোনাল এ্যাসিণ্ট্যাণ্ট রাখলো। আমাকে হরিপদ বলেছিলো, ছেলেটি গ্র্যাজুয়েট। চিঠি-চাপাটি লিখতে এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজের জন্য ওকে রাখা হয়েছে। এর কিছু আগে এপিক অপেরার ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করলো প্রদীপ দেবনাথ। হরিপদ বললো, 'কাজে একটু মাটো হবে হোক, আমার নামে চলে যাবে।' চটপটে স্বভাব ছিলো প্রদীপের। বয়স অল্প। মুখময় মিষ্টি হাসি। বাম রাজনীতি করতো। আলাপ আলোচনার পর হরিপদকে বললাম, 'এককালে ছেলেটি ভালো সেলসম্যান হতে পারবে।' সেই প্রদীপ দেবনাথ হয়েছিলো দুটি দলের মালিক। গাড়ি কিনেছিলো খান দুই। চলায় ফেরায় কদাচ বোঝা যায়নি একদা কি ভয়ানক দারিদ্র্যের সঙ্গে তাকে বুঝতে হয়েছে। এই প্রদীপ দেবনাথকে আমার বিরুদ্ধ-চক্রের নেতৃত্ব করতেও দেখেছি এক সময়।

প্রদীপ তখন নাট্যভারতীর মালিকের আসনে বসেছে। নিজের নামে দলও করেছে একটা প্রদীপ অপেরা। একদিন আমার গৃহিণী মার্কেটিং করে বাসায় ফিরে এসে কাঁদতে লাগলো। কী ব্যাপার? জবাব দেয় না কিছুতেই। অনেক

জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সে বললো, প্রদীপ নাকি ওকে দেখে না-চেনার ভান করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আমি বললাম, 'তুমি কি সত্যিসত্যিই দেখেছো প্রদীপ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে?' কাঁদতে কাঁদতে ও বললো, 'হ্যাঁ।' বুঝলাম কোথায় আঘাত করেছে প্রদীপ। পৃথিবীতে কতো মানুষই তো কত মানুষকে চেনে না। চিনেও ভান করে না-চেনার। তবে প্রদীপের এই ব্যবহার কেন আমার গৃহিণীর চক্ষে জল আনলো? কারণ প্রদীপ দেবনাথ দুঃখের দিনে ছিলো আমাদের সন্তানের মতন। সেই দৃষ্টিতেই ওকে আমরা দেখেছিলাম। স্বভাবতই মায়ের মনে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক।
প্রদীপ যে এ-ব্যবহার তার মাতৃতুল্য বৌদির প্রতিই করেছিলো তা নয়। আমার প্রতিও একই ব্যবহার সে করেছে তখন একাধিকবার। তাতে বরং আনন্দই হয়েছে আমার। ঠিক যেমনটি সন্তান বিত্তশালী হ'লে পিতার গর্ব হয়। প্রদীপের গর্ব তো আমারই গৌরব। সে-কথাই বোঝাতে চেয়েছিলাম আমার স্ত্রীকে। কিন্তু অতো সহজে সে ভোলাবার পাত্রী নয়। তখন আমাকে বলতেই হলো, 'তোমার যে এতো দুঃখ, এতো অভিমান, প্রদীপ যদি এসে দাঁড়ায় এই দুয়ারে, আশীর্বাদ চায়—তখন কি তুমি মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারবে?' ও বললো, 'তা কেন ঘুরিয়ে নেবো। আমি যে মা।' পরে সেই প্রদীপই যখন প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে এলো আমার বাসায়, তখন এই অভিমানী মা-র দেখলাম অন্যরূপ। 'প্রদীপের একটা ব্যবস্থা তোমাকে করে দিতেই হবে।'



ততদিনে হরিপদর গুরুজীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেছে একদিন বললাম, 'গুরুজী আমার একটা কৌতূহল আছে।'
'বল্, বলে ফেল্।'

'শুনেছি, শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশাই বাবাজী মহারাজের কাছ থেকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ক্রিয়াযোগ ব্যাপারটা কী ?'

গুরুজী খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। বললেন 'ওটা একটা ধর্মমত।'

'কিন্তু কোন ধর্মমত, কেমন ধর্মমত ?'

উত্তরে গুরুজী সোয়া-ঘণ্টার একটা বক্তৃতা করলেন। তখন আমার মনে পড়লো, কেন সাধুসন্তদের অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরকে চেনা ও জানার জন্য শিক্ষাদীক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। তার মানে : যদ্যপি তোমার গুরু বেশ্যাবাড়ি যায়, তদ্যপি তোমার গুরু নিত্যানন্দ রায় ? ঈশ্বর কি যুক্তির বাইরে বাস করেন ? ধর্ম কি যুক্তিবিজ্ঞান মেনে সত্যি চলে না ? আমি বললাম, 'ঈশ্বরকে ক-জন পেয়েছেন আমি জানি না কিন্তু বোধ ও বিজ্ঞান দিয়ে বিচার করতে করতে যখন মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তখনই বোধ হয় তার মধ্যে ঈশ্বর চেতনার সূত্রপাত ঘটে।' গুরুজী বললেন, 'দ্বন্দ্ব আর বিশ্বাস এক বস্তু নয়। বিশ্বাসই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার একমাত্র পথ।' আমি বললাম, 'অবিশ্বাস না থাকলে বিশ্বাস-এর অস্তিত্ব থাকে কি ?' পরে ভক্তি ও জ্ঞান—কে কার আগে, কে পরে এই নিয়েও খানিকক্ষণ বিতর্ক হয়। অবশেষে প্রসঙ্গ অসমাপ্ত রেখে বড়ো রকমের একটা হাই তুলে গুরুজী প্রস্থান করেন।

এতো সব কথা বলার কোনো প্রয়োজনই হতো না যদি এই গুরুজীকে অন্যরূপে না দেখতাম। হরিপদ বায়েন একদিন খবর পাঠালো তার বাক্স থেকে নাকি ছয় হাজার টাকা উধাও। এবং সেই সঙ্গে তার একান্ত সচিবকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গেসঙ্গে হাজির হতে হলো নাট্যভারতীতে। গিয়ে দেখি হরিপদ বিছানায় শোয়া। আমি যেতেই উঠে বসলো। কাঁদতে শুরু করলো, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে দাদা। সব নিয়ে পালিয়েছে অনু।' কী করে নিলো ? হরিপদ বললো, 'সেই যে হুণ্ডি কেটে ছয় হাজার টাকা পেলাম, তা দিয়েছিলাম গুরুজীর হাতে। তিনি আশীর্বাদপুত অর্থ দিয়েছিলেন অনুর হাতে। একটা কালো পোর্টফোলিও ছিলো ওর হাতে। তাতে রাখা হয়েছিলো টাকাটা। বাসায় ফিরে ট্রাঙ্কে রাখতে বলেছিলাম টাকাটা। রেখেছিলো। সন্ধ্যার দিকে ট্রাঙ্ক খুলে পোর্টফোলিওটা পেলাম কিন্তু ভেতরে টাকা নেই। বিকেলে অনু বেড়াতে যাওয়ার নাম করে যে কেটে পড়েছিলো তারপর থেকে তার পাত্তাই নেই। দু'দিন খোঁজাখুঁজি করে পাইনি। আজ আপনাকে খবর দিতে বাধ্য হোলাম।'

'থানায় ডাইরী করেছেন?'

'না।'

'কেন?'

'গুরুজী মানা করলেন। বললেন হুজ্জোত-হাঙ্গামার মধ্যে যেও না। অমু ঠিক ফিরে আসবে।'

'ওর ঠিকানাপত্র কিছু আছে?'

'না।'

'তবে যে বলেছিলেন আত্মীয়!'

এতক্ষণে সব স্পষ্ট হয়। হরিপদ বললো, ছেলেটি হঠাৎ তার কাছে এসেছিলো। বলেছিলো বড় লোকের ছেলে। বড় ভাই খারাপ ব্যাবহার করতো বলে বাড়িঘর ছেড়ে চলে এসেছে। তাই ঠিকানাপত্র কিছু রাখা হয়নি। তবে এক আধবার নাকি সোদপুরের কথা বলেছে।

থানা অফিসার সব শুনে বললেন, এ-নাকি সুপরিকল্পিত প্রতারণা। ডাইরী করার পর ভদ্রলোক আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললেন, সরষের মধ্যেই নাকি ভূত আছে।

তবে কি হরিপদই ঠাণ্ডা মাথায় এ-কাজটা করেছে! কিন্তু কেন করবে? হুণ্ডিটাতো সে নিজেই কেটেছিলো। আমি যখন এই সন্দেহে দোদুল্যমান ছিলাম দিন-কতক, ঠিক তখন গুরুজী সুযোগ বুঝে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন নাট্য-ভারতীর বারান্দায়। কানেকানে বললেন, তিনি নাকি ছেলেটিকে যোগে বসে দেখতে পেয়েছেন। সে আছে এখন আগরতলায়। ছেলেটিকে নাকি তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন এই অন্যায় কাজ সে করলো। উত্তরে ছেলেটি নাকি বলেছে, হরিপদ তাকে পাঁচশো টাকা নিয়ে পালিয়ে যেতে বলেছে। বাকি টাকা লুকিয়েছে হরিপদ বায়েন।

আমি আহত হোলাম। বললাম, 'আপনি কি মনে করেন এটা সত্যি?'

গুরুজীর গলায় বেশ জোর, 'যোগ কখনো মিথ্যে হতে পারে না।'

'অনেক সময় ভুলওতো হতে পারে যোগ-সাধনায়?'

আমাকে একটা ধমক দিলেন গুরুজী, 'ওটা চেতন-অচেতনের বাইরের কথা।'

'কিন্তু এতে হরিপদর লাভটা কী?'

'লাভের গন্ধ না পেলে এমন বোকার মতো কাজ করে কেউ?'

বললাম, 'টাকাটা তো হরিপদই হুণ্ডি কেটে এনেছে। দেনা তো তাকে শুধতেই হবে।'

'আঃ!' গুরুজী বিরক্ত হলেন, 'দেনা তো শোধ করতেই হবে। বুঝলি না? এটা হচ্ছে সময় নেওয়ার একটি অপূর্ব ফন্দি।'

আমি স্থির চোখে তাকালাম গুরুজীর দিকে। গুরুজী বারবার চোখ নামিয়ে নিচ্ছিলো আর আমতা-আমতা করছিলো। 'হরিপদকে নিয়ে চলে যা আগরতলায়। ধরতে পারবি। তখনই বুঝতে পারবি কী ব্যাপার…'। বার-কয়েক আঙুলের ঘর গুনলেন, মুখে কী যেন বলছিলেন। তাকালেন আমার দিকে। বললেন, 'আর একুশদিন ছেলেটি থাকবে আগরতলায়। তারপর পাকিস্তান। হ্যাঁ, হরিপদ যেন জানতে না পারে কেন তোরা আগরতলায় যাচ্ছিস। জানলে ও যাবে না।'

হরিপদ গুরুর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো। আগরতলায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও অন্ত ওরফে দেবাশিস চক্রবর্তীকে পাওয়া যায়নি। কলকাতায় ফিরে আসার পর গুরুকেও আর খুঁজে পাওয়া গেলো না। জানা গেলো সপরিবারে তিনি বাকি তীর্থ দর্শনে যাত্রা করেছেন।

একটা কথা এতক্ষণ বলা হয়নি। হরিপদ বায়েন একসঙ্গে তার দু'মেয়ের বিয়ের আয়োজন করেছিলো। এ-দিনেই এপিক অপেরার উদ্বোধন হয়েছিলো এই উপলক্ষে গড়বেতায়। আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম ওই উৎসবে। আয়োজন দেখে মনে হয়েছিলো, এ এক দান-মহোৎসব। বিজয়দা অর্থাৎ বিজয় মিস্তির রান্নাবাড়ি আর স্টোরের চার্জে ছিলেন। সুরকার মহেন্দ্র দত্ত, মীনা ভ্যারাইটিজ-এর মালিক নন্দদুলাল আপ্যায়ন বিভাগের ভার পেয়েছিলো। চিৎপুর যাত্রাপাড়ার অনেক মুখকে সেদিন উপস্থিত দেখেছিলাম সেই আনন্দ যজ্ঞে। তখন কি কেউ ভাবতে পেরেছিলো প্রদীপের নীচে সত্যিসত্যি অন্ধকার থাকে, দিনের উজ্জ্বল আলোর আড়ালে থাকে অন্ধকার রাত্রির অস্তিত্ব? আমাদেরও কারো মনে হয়নি, এই বিরাট আনন্দ যজ্ঞের পেছনে লুকনো রয়েছে শোকের কালো রঙ।

যার সহনশীলতা ধরিত্রীর মতো, যার ধৈর্য সমুদ্রের চাইতেও গভীর সেই হরিপদ বায়েন কি কেবলই ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করলো? বোধ হয় না। অফিসের কাজ শেষ করে রাত্রিতে বাড়ি ফেরার সময় একবার নাট্যভারতী হয়ে যাওয়া ছিলো আমার ডিউটি। কারণ এই দলটির পেছনে তখন অনেক শত্রু। কোনো এক

গদিতে হঠাৎ একদিন উপস্থিত হয়ে শুনতে পারলাম, ওখানে নাট্যভারতী দলটাকে খতম করার ষড়যন্ত্র চলছে। বুঝতে পেরে আমি ফিরে এসেছিলাম। আসার পথে ওই দলের মালিককে ডেকে বললাম, 'এটা তোমার কাছে আশা করিনি।' আমি ভয়ানক উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। বললাম, 'নাট্যভারতী হবেই—কিষাণবাবুকে দল লীজ দিতে আমি দেবো না। আর এটাও সত্যি এ-বছর নাট্যভারতীকে স্পর্শ করার দুঃসাহস কারো হবে না।'

পরদিনে বসলাম কিষাণবাবুর সঙ্গে। বেচারী লসে লসে সর্বস্বান্ত। ধার চাইবার মতো আর জায়গা পর্যন্ত নেই। কিষাণ দাশগুপ্ত জানালেন, টাকা ধার পাওয়া গেলে তিনি দল করবেন। আমি চন্দ্রাবলী সিংকে ডেকে পাঠালাম। এক প্রস্তাবেই সে রাজি। কিন্তু একটা শর্ত আছে তার। অর্থাৎ হুণ্ডিতে গ্রান্টি অর্থাৎ গ্যারান্টি হিসেবে স্বাক্ষর করতে হবে আমাকে। রাজি। টাকা এলো। দলে আনা হলো পঞ্চু সেন আর জ্যোৎস্না দত্তকে। পালা 'বিনয় বাদল দীনেশ'। পরিচালক হরিপদ বায়েন। পুজোর আগে সে মরশুমে নাট্যভারতীর টপ বায়না।



নাট্যভারতীতে এসে দেখি হরিপদ কেমন বিষণ্ণ। বললাম, 'এপিকের বায়না কি খুব খারাপ?'

'না।' হরিপদ বললো, 'মাসের মাত্র চারটা তারিখ খালি আছে।' হরিপদ টুক করে পায়ে হাত দিয়ে আঙুল ঠেকালো নিজের জিভে, 'আপনার আশীর্বাদে।' তারপরই মুখটা কেমন যেন ব্যাজার হয়ে উঠলো। বললো, 'আনন্দের মধ্যে একটা দুঃখের খবর দিচ্ছি দাদা।'

'দিন।' আমি আনন্দ প্রকাশ করি, 'না হ'লে যে ভারসাম্য রক্ষিত হয় না।'

হরিপদ বললো, 'কী যে বলেন, এটা কি ভাগের কথা হলো নাকি?'

'ঠিক আছে, বলুন।'

'আপনার বন্ধুকে যেন বলবেন না।' হরিপদ একটু থামলো। তার চোখ দু'টো ছলোছলো হয়ে এলো।

আমি অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম।

'আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করলেন কিষাণদা।' হরিপদ ধুতির খোঁটে চোখ মুছছিলো।

বললাম, 'কী রকম খারাপ ব্যবহার ?'

'গদীতে এসে খুব চেঁচামেচি করেছেন। বলেছেন, আমি নাকি তাঁর দলের কাজে ফাঁকি দিয়ে এপিকের দিকে ঝুঁকেছি। শাসালেনও।'

'গদীতে আসবে নাকি আজ ?'

'বোধ হয় না।' হরিপদ বললো, 'আপনাকেও ছাড়ে নি।'

'আমাকে !'

'হ্যাঁ। আপনি নাকি নাট্যভারতী বন্ধ করে দেবার জন্ত আমাকে দিয়ে এপিক করিয়েছেন।'

'তাই বুঝি !'

হরিপদ বললো, 'একটা পথের দলকে টপে তুললো কে ?'

'ভগবান', আমি বললাম।



যাত্রাশিল্পের মহাজন অর্থাৎ মানি-লেণ্ডারদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই ছিলেন অবাঙালী। খুব চড়া স্থদে এরা টাকা খাটাতো। যাত্রা মূলত বাঙালীদের ব্যবসায়। কেন বাঙালী বিত্তশালীরা যাত্রায় অর্থ লগ্নী করেন না এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটা সত্য পেয়েছিলাম, সেটা হলো ভয়। যদি টাকা স্থদ সমেত ফেরৎ না আসে তার। একদিন চন্দ্রাবলী সিংয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। গান

শুনতে গেছি শ্রীমা নাট্য কোম্পানীর। নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় যার দল-মালিক, অভিনেতা। তাঁর স্ত্রী কণকলতা দলের হিরোইন। ওই সময় মোহন কাজ করে সম্ভবত নিউ রয়েল বীণাপাণিতে। মোহন অর্থে মোহন চট্টোপাধ্যায়—যে এখন যাত্রা এবং ফিল্ম দুই ক্ষেত্রেই সমধিক জনপ্রিয় এবং মোহন অপেরার হিরো কাম প্রোপ্রাইটর। মোহন তখন সবে যাত্রায় এসেছে। নন্দ-কনক তখন যশের চূড়ায়। নন্দবাবু আমায় বলে গেলো, আমাকে নিতে চন্দ্রাবলী সিং আসবে গাড়ি নিয়ে। সে নিয়ে যাবে দলে। সেই গাড়িতেই চন্দ্রাবলী সিংয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। যেতে যেতে বললো, সে নাকি বেশ কিছু টাকা ধার দিয়েছে নন্দকে। এবং এখন আসরে আসরে গিয়ে কিছুকিছু টাকা আদায় করতে নেমেছে সে।

একসঙ্গে বসে যাত্রা দেখলাম আমরা। উত্তরপ্রদেশের লোক হলেও চন্দ্রাবলী সিং একেবারে যাত্রার পোকা। মোটামুটি ভালো বাংলা বলতে পারে।

উনিশ শ চৌষট্টি সালের ফাল্গুন মাস। যাত্রার শেষে দু'জনে ফিরছিলাম ওর এ্যামবাসাডার গাড়িতে। রাত প্রায় শেষ। বললাম, 'কী সুদে টাকা খাটে?' চন্দ্রাবলী যা বললো তা শুনে আমার চক্ষু চড়ক গাছ। বললাম, 'এই চড়া সুদ তো এক ধরনের শোষণ।' চন্দ্রাবলী মাথা নেড়ে বললো, 'সাচমুচ নেহি। কিউ কি ইয়ে বেওসাকা মতলব পুরা জুয়াবাজি। রূপেয়া যদি আটকে যায় তো এসটেট ছাড়া কী ধরা যাবে? কুছ নেহি। ইনভেস্টমেন্ট ইজ রিসকি। এহিবাস্তে…'

আমি বললাম, 'কিন্তু অতো সুদ দিয়ে দলের প্রফিট ঘরে তোলা অসম্ভব। আপনি মালিকগুলোকে মেরে ফেললে ব্যবসা করবেন কার সঙ্গে?'

চন্দ্রাবলী বললো, 'বেশ তো আপনি গ্রান্টি হোবেন। হ'লে আমি কম ইনস্টারেস্টে রূপেয়া দিতে পারি।'

'আমাকে বাঁধা রাখতে চান?'

'না না, কভি নেহি; আপনি বাঁধা কেনো হোবেন। হুণ্ডিতে সই করিয়ে দেবেন গ্রান্টি হোয়ে, ব্যাস।'

'আপনি কি জানেন আমি কতো সামান্য টাকা মাসে আয় করি?'

'জানবার দরকার হোচ্ছে না।'

'বাঃ রে, গ্যারান্টি হ'লে তো দায়-দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া। পার্টি টাকা শোধ না করলে তো আমার কাছেই আপনি টাকা চাইবেন?'

সিং হেসে উঠলো। বললো, 'নেই নেই, ডরনেকা বাৎ নেই। আপনার নামে আমি কেস করতে যাবো না। রূপেয়া ভি চাইবে না আপনার কাছে।'

'তবে!' আমি অবাক হয়ে তাকাই।

'আপকা পারর্সোনালিটিই মেরা সিক্রিটি।'

আমাকে হেসে উঠতে হলো। বললাম, 'পার্সোনালিটিতে তোমার পেট ভরবে না সিং। টাকা ফেরৎ না দিতে পারলে তুমিই একদিন বলবে, লোকটার কুছ পার্সোনালিটি নেই আছে।'

'কভি নেহি।'

বললাম, 'তুমিও তো ব্যাটা জুয়াই খেলতে চাও।'

সিং হেসে উঠলো। বললো, ব্যবসা কাকে বলে তা যেমন ওঁরা চেনে, তেমনি লোক চিনবার ক্ষমতা নাকি ওঁদের অসামান্য। 'আপনার নাম আমি বহোৎ শুনলাম। যাত্রালোগ আপনাকে খুব ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। ওহি তো মেরা গ্রাণ্টি হলো না?'

'কিন্তু তাতে তোমার টাকা ফেরৎ পাওয়ার গ্যারাণ্টি কোথায়?'

ও আবার হাসলো, বললো, 'সে প্রমোদবাবু, আপনাকে কষ্ট দিলে কোনো শালার ভালো হোবে না। আর আপনাকে কষ্ট কেউ দিতে ভি পারবে না।'

কথাগুলো খুব সহজভাবে নিতে না পারার দোষ আমার। মনে হয়েছিলো, হয়তো বা কোনো মতলব কাজ করছে এর মধ্যে। কিন্তু পরে বুঝেছি, মনের দিক থেকে আমিই মুক্ত হতে পারিনি। যখন যাকে বলেছি মুক্ত হস্তে, বিনা বাক্যব্যয়ে টাকা ধার দিয়েছে চন্দ্রাবলী সিং। খুব সামান্য সুদে। বহু অর্থ তার মারও গেছে, আমার অনুরোধে অনেককে রেহাইও দিয়েছে টাকার দাবি থেকে।

নতুন আনা ফিন্যান্সিয়ারদের সকলেই বাঙালী। অনেক ক্ষেত্রে এঁরা আমার অনুরোধ উপেক্ষা করেছে। আমাকে জিজ্ঞেস না করে আইনের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু চন্দ্রাবলী সিং সেদিনও যেমনটি ছিলো আজও তেমনি আছে।

এপিক অপেরার চাহিদা বিপুল। কিন্তু কপালে না থাকলে কি খটাখটালে হবে কি?—সেই হলো হরিপদর ক্ষেত্রে। মফঃস্বলের সর্বত্র তখন ইলেকট্রিসিটি যায় নি। গেলেও ভোল্টেজ কম। ওই ভোল্টেজে পর্দায় ছবি ফোটে না। বর্ধমান

জেলার ধাত্রীগ্রামে এপিক অপেরার আসরে হাজার পঁচিশেক দর্শক হয়েছিলো। নায়েক আমার চেনা। দলের সঙ্গে মহেন্দ্র মাস্টার আর অজয় সাহাকে নিয়ে আমি গেলাম। রাত ৮টায় গান। লোকে লোকারণ্য। পালা শুরু হলো। প্রোজেকটার হলো চালানো। পর্দায় ঝাপসা ঝাপসা কুয়াশা। হৈ উঠলো। আবার শুরু হলো গোড়া থেকে। আবার ছবি বিভ্রাট। এমনি করে বার ছয়েক ফেল করার পর জনরোষ আচমকা ফুঁসে উঠলো। হাজার হাজার লোক ক্ষেপে উঠেছে। নিমেষে সব লণ্ডভণ্ড। প্যাণ্ডেলে আগুন লেগেছে। আলো নিভে গেছে। দুদ্দার দৌড়াদৌড়ি—চেঁচামেচি, আর্ত চিৎকার। দেখি উন্মত্ত জনতা ছুটে আসছে সাজঘরের দিকে। আমি উর্দ্ধশ্বাসে সাজঘরে ছুটে এলাম, 'পালাও, যে দিকে পারো পালিয়ে যাও', চিৎকার করতে করতে আমি গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলে মহেন্দ্র মাস্টারের হাতে দিলাম। 'মাস্টারমশাই পালান। বুড়ো লোক আপনি চাপে মারা পড়বেন।' নিমেষে লাফিয়ে উঠলাম সাজঘরের সামনে টাল করা বাক্সের ওপর। দু'হাত তুলে চিৎকার করছি, 'শিল্পীদের গায়ে হাত দেবেন না। বাস লুটপাট করবেন না। তা হ'লে আমাদের এই গ্রামে কোনোদিন আর যাত্রাদল আসবে না।'

কিন্তু কার কথা কে শোনে। মনে হলো বিশাল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে আমার গলার স্বর আমিই শুনতে পারছি না। উন্মত্ত জনতা আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। যখন জ্ঞান ফিরে এলো আমার তখন মধ্য রাত্রি। কে বলবে ঘণ্টা কয়েক আগে এই এলাকায় ভয়াবহ গণটাইফুন বয়ে গেছে! চোখ মেলে দেখি প্রদীপ কাঁদছে, কানাই কাঁদছে। মহেন্দ্র মাস্টার চোখ মুছতে মুছতে বললো, 'সব শেষ।'

সব শেষ! আমি উঠে বসলাম। চোখ ঝাপসা হয়ে এলো আমার।

দল বন্ধ। এসটেটপত্র নেই।

দিন পাঁচেক পরে দিললি যাবো। অল ইণ্ডিয়া অল ল্যাঙ্গুয়েজ ড্রামা কমপিটিশনে। হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার আগে নাট্যভারতী হয়ে গেলাম। হরিপদ বিষণ্ণ। বললো, কিষাণবাবু নাকি তার খোরাকী জলপানি পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। হরিপদ কাঁদছিলো।

পকেট থেকে পঞ্চাশটা টাকা দিলাম ওকে। একটা চিঠি লিখলাম কিষাণবাবুকে এই মর্মে যে, এই মারাত্মক ব্যবস্থা তিনি যেন না নেন। হরিপদ বায়েন যেমন খোরাকী

জলপানি পেয়ে থাকে ; তা যেন তাকে নিয়মিত দেওয়া হয়। আমি দিললি থেকে ফিরে এসে সব শুনবো।

উনিশ দিন আমি দিললিতে ছিলাম। ফিরে আসার দিন দুই আগে চিঠি পেলাম হরিপদর। সে লিখেছে, গদী থেকে তাকে গড়বেতায় চলে আসতে বাধ্য করা হয়েছে। আমার একটা চিঠি হাতে নিয়ে কিষাণবাবু নাকি বলেছেন, আমি লিখেছি। 'চিঠিখানি আমি দেখিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু কিষাণদা উহা আমাকে দেখিতে দেয় নাই।'

হরিপদ বায়েন কেন আমাকে প্রত্যহ একবার করে তাকে দেখে যেতে বলতো, সে রহস্যটা ধরা পড়লো একদিন। কিষাণবাবুর বাসায় বসে আলোচনা হচ্ছিলো দল সম্পর্কে। হঠাৎ একটা লালমতন লম্বা খাতা দেখলাম পাশে। 'গদীর খরচ বহি'। কথা বলতে বলতে পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমি কাঠ হয়ে গেলাম। চক্ষু স্থির। যত পাতা ওল্টাই তত রহস্য। দেখলাম প্রত্যহের খরচের মধ্যে কমবেশি আমার নামে খরচ লেখা হয়েছে গড়ে দশ টাকা। 'প্রবোধদার ট্যাক্সি ভাড়া, চা সিগ্রেট পান ও খাবার খাতে।' খাতাটা কিষাণবাবুকে দেখালাম, 'এসব কী মশাই!' কিষাণবাবু বললেন, 'গদী খরচ।'

'কিন্তু এ-সব কী! সপ্তাহে দিন দুই আমি আপনার গদীতে যাই। চা খাই এক কাপ। এক আধদিন এক প্যাকেট চারমিনার হয়তো দিয়েছে। তার মানে রোজ...'

'ছাইড়্যা দ্যান।' কিষাণবাবু খাতাটা কেড়ে নেন আমার হাত থেকে, 'উ হালা জন্ম চুর।'

'অসম্ভব।' খাতাটা আমি কিষাণবাবুর হাত থেকে কেড়ে নিই। হাতটা ধরি খপ করে, 'আসুন। চলুন গদীতে। এত বড়ো মিথ্যাচার!' আমি রীতিমতো তপ্ত হই। চোখমুখ লাল হয়ে আসে। বনবন করে ঘুরতে থাকে মাথা।

কিষাণবাবু উঠবেন না। জোর করে ওকে আমি টানতে টানতেই নামাই। ট্যাক্সি ধরি। 'চলো শোভাবাজার।' ঠিক সন্ধ্যা নাগাদ নাট্যভারতীতে এসে পৌঁছি। হরিপদ ছিলো ঘরেই। আমি প্রবল উত্তেজনায় বসে খাতাটা ছুঁড়ে দিই হরিপদর মুখে। চিৎকার করে উঠি, 'চোর কোথাকার!' হরিপদ হাসতে হাসতে খাতাটা তুলে নেয়। পায়ের কাছে বসে, 'ঠাণ্ডা হোন দাদা, ঠাণ্ডা হোন।'

'না—' আমি চিৎকার করি। 'দিন দুপুরে ডাকাতি! পেয়েছেন কী আপনি? ভেবেছেন অন্যায় করে পার পাবেন?'

হরিপদ কাঁদছিলো। পা ধরে বসে আমার তপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদছিলো। বললো, 'অনেকগুলো লোকের সংসার দাদা, যা আয় তাতে একবেলা পেটপুরে সকলের খাওয়া হয় না। বাচ্চাগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, দাদা!'

বাচ্চা! আমার চোখে জল এসে গেলো। বললাম, 'এতদিনের মধ্যে একবারও তো বলেননি আপনার বাচ্চারা……'

'লজ্জায়, দুঃখে বলতে পারি নি দাদা। জন্ম দিয়েছি, কর্তব্য…' ও আমার পায়ে মাথা ঠুঁকতে থাকে।

আমি স্তব্ধ। কিষাণবাবু কাঠ।

হরিপদর ঘর থেকে নাট্যভারতীর অফিস ঘরে চলে এলাম। চা এলো। একটা টেবিলে আমরা দু'জন মুখোমুখি বসে। অথচ কারও মুখে কথা নেই।

অনেকক্ষণ পরে কিষাণবাবু শুধোলেন, 'ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক।'

বললাম, 'হরিপদর মাইনেটা শ-তিনেক বাড়িয়ে দেওয়া যায় না?'

'অসম্ভব!' কিষাণবাবু বললেন, 'তিন হাজার বাড়ালেও দেখবেন একই কাণ্ড ঘটছে। ওটা স্বভাব। বহুকাল করে করে এমন হয়ে গেছে, এ-কাজ করতে না পারলে রাত্রে ঘুমই হবে না ওদের।'

তখন বিশ্বাস করতে পারিনি কথাটা। কিন্তু বছর কয়েক পর প্রায় একই ধরনের আর একটা ঘটনা ঘটতে দেখা গেলো। এবং ওই একই অপরাধে একজন পরিচালকের চাকরিও গেলো।

গান শুনতে যাবো আসানসোলে। যোগাযোগ করেছিলো যে পরিচালক, সে আমার বিশেষ স্নেহভাজন এবং তার নিজের কাজে সে যথেষ্টই দক্ষ। আসানসোল ফিল্ডে দলের গান। দলের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। পরিচালক বললো, 'তা হ'লে দাদা, দু'টো ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট আমি কেটে রাখবো। কাল এগারোটা তিরিশ মিনিটে ট্রেন।'

বললাম, 'ফার্স্ট ক্লাশ কাটবার দরকার নেই। এইটুকু তো পথ। তুমি বরং দু'টো সেকেণ্ড-ক্লাসের টিকিট কেটে রবিকে দিয়ে যেও। আমরা যথাসময় স্টেশনে চলে যাবো।'

পরিচালক বললো, 'সেটি হবে না দাদা। আপনাকে একদম বিশ্বাস নেই। হুট করে কে এসে ধরে নিয়ে যাবে বিপদ বলে, আমাকে তখন আঁটি চুষতে হবে।'

'বেশতো,' বললাম, 'তুমিই না হয় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও।'

'আমি ঠিক আটটার সময় আসবো। লাইনের প্রথম।'

আমি আগেই বলেছি, কখনও আসানসোল গেলে, এবং শম্ভুদা যদি আসানসোলে থাকেন তবে তাঁর আস্তানা ছেড়ে অন্যত্র কখনোই আমি উঠি না। শম্ভুদা মেজাজী এবং জমাটি লোক। সারাটা দিন ওখানে আড্ডা চলে। ওখানকার হিন্দ মেডিক্যাল স্টোরের অভয় বসু, শম্ভুদার বিশেষ বন্ধু। দীর্ঘকাল যাত্রাশিল্পেরই লোক ছিলেন। রিটায়ার করার পরেও যাত্রাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি ; যেখানে যাত্রা সেখানেই অভয়পদ বসু। অভয়বাবু একজন ভালো সংগঠক এবং সমালোচক। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল পার্কের যাত্রা উৎসব কমিটির পুরোভাগে আছেন দীর্ঘকাল। সুতরাং খবর পাওয়ামাত্র তিনি ছুটে আসবেন আড্ডায়।

আমি আর রবি যথারীতি শম্ভুদার আস্তানায় উঠলাম। ওখানে পূর্ব নির্দ্ধারিত পালা দেখলাম। আরও পাঁচ রাত্রিতে পাঁচটি দলের পালাও। কলকাতায় ফেরার টিকিট শম্ভুদাই কেটে দিলেন।

বছর খানেক বাদে ওই দলের মালিক এসে হাজির। বললো, 'কিছু যদি মনে না করেন দাদা, তবে একটা বিষয় জানতে চাইবো আপনার কাছে।'

'কী ? বলো।'

বললো, 'গত মরশুমে আপনি যখন আসানসোল গিয়েছিলেন, শুনলাম শম্ভুদার ওখানে ছিলেন ছয়দিন ?'

'হ্যাঁ।'

'থার্ড ক্লাসে গিয়েছিলেন তো ?'

'সেকেণ্ড ক্লাসে। এখন থার্ড ক্লাস বলে কিছু নেই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। ফেরার টিকিট…'

'কী ব্যাপার বলো তো ?'

একটা খাতা মেলে ধরলো মালিক, 'দেখুন ··, খাতায় কী লিখেছে !'

খাতাটা টেনে নিয়ে দেখি লেখা আছে : প্রবোধদা ও রবি দাসের আসানসোল

যাতায়াত বাবদ ফার্স্টক্লাস টিকিট ও ছয়দিনের হোটেল খরচ—এক হাজার তিনশো তিরাশি টাকা আশি পয়সা।

আমি হাসলাম।

'এবার আমাকে কী করতে বলেন আপনি?'

'এই ভয়ানক অপরাধ ধরা পড়ার পর একজন মালিকের যা করা উচিত।'

'তা হ'লে আমি ওকে ছাড়িয়ে দিচ্ছি?'

'দাও।'



সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রাত নেমেছে। যাবো যাবো করছি, কিষাণবাবু দল সম্পর্কে গুরুতর আলোচনায় বসলেন। ঠিক আটটা নাগাদ দুমদাম বোমার আওয়াজ। বাড়িটা থরথর করে কাঁপছে। ছুটে বারান্দায় এলাম। দেখি শোভাবাজার মোড়ে বন্যার জলের তোড়ের মতো লোকজন চারদিকে ছুটছে প্রাণপণে। দু' পলকের মধ্যে এই এলাকা জনবিহীন। হঠাৎ অন্ধকার নামলো বাদুরের পাখার মতন। কিষাণবাবু ছুটে এসে হাত ধরলো আমার, 'শিগগীর ভিতরে আহেন, শুরু হইয়া গেচে।'

'কী শুরু হলো!'

'বলছি।'

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে হরিপদ মোমবাতি জ্বালালো। পটাপট বন্ধ করে দিলো দরজা, জানলা। হাঁপাচ্ছিলো। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। হরিপদ ভয়ে জবুথবু। ভীতুর মতো অস্পষ্ট গলায় বললো, 'নকশাল।' ওর বলার ভঙ্গি দেখে হেসে বাঁচি নে। ভাবটা এই, যেন ঘাড়ের ওপর বাঘ লাফিয়ে পড়বে এখুনি।

চিৎপুর শোভাবাজার জংশনে ততক্ষণে অবিরাম বোমাবাজি শুরু হয়ে গেছে। জানলার পাললা ফাঁক্ করতেই ধক্ করে নাকে এলো বারুদের গন্ধ। অন্ধকারের

মধ্যেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছিলো। পাল্লাটা আরও ফাঁক করে দেখি, শোভাবাজার স্ট্রীট থেকে একদল ছেলে ছুটে এসে মোড়ের ওপর ধমাধম বোমা বর্ষণ করেই পালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রে-স্ট্রীটের ও-পাশ থেকে ছুটে আসছে আর এক দল। তারাও ছুড়ছে বোমা।

প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক এই ভয়াবহ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চললো।

বললাম, 'ঠিক সময়েই লোডশেডিং...'

'উঁহু।' কিষাণবাবু প্রতিবাদ করলেন, 'লোডশেডিং না, লোডশেডিং না। যুদ্ধের সুমে লাইন কাইট্যা অন্ধকার না কইর্যা দিলে লড়াই জমে না।'

'তা হ'লে বাড়ি ফিরবো কী করে!'

হরিপদ আশ্বস্ত করলো আমাকে। বললো, 'অনিল সরকারকে পাঠাচ্ছি। ও দু'টো ট্যাক্সি ডেকে আনবে। একটাতে কিষাণদা যাবেন, আর একটাতে আপনি।'

রাত পৌনে এগারোটা নাগাদ এই এলাকা শব্দহীন নিঝুম নির্জন এলাকার মতন থমথমে হয়ে এলো। একটা কুকুরও ডাকতে ভরসা পাচ্ছে না। ট্রামবাস বন্ধ হয়ে গেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে একটা রিকশাওয়ালাকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ শুনলাম, কয়েকটি ঝিঁ-ঝিঁ একসঙ্গে ডেকে উঠলো।

এগারোটা পাঁচের সময় এলো একটা ট্যাক্সি। অনিল টর্চ দিয়ে সিঁড়ি দেখাতে দেখাতে আমাকে নামতে সাহায্য করছিলো—যাতে ভাঙা এবং পিছল সিঁড়িতে আমার পা পিছলে না যায়। ফুটে আসতেই একটা বড় ঝাঁকড়া-মতন গাছ। অন্ধকার ওখানে জমাট বেঁধে আছে। ট্যাক্সিটা ওখানেই দাঁড়িয়ে। টর্চের আলোতে দেখলাম দরজাটা খোলাই আছে। গাড়িতে উঠতে যাবো, হঠাৎ একটা শক্ত হাত আমার কব্জি চেপে ধরলো, চাপা ফ্যাসফেসে গলা, 'এ্যাই ধরেছি।' যেই না বলা অমনি ধপাস। একটি শব্দ। দেখি অনিল রাস্তার ওপর পড়ে গিয়েছে। নিমেষে সে মারলো এক লম্বা দৌড়। লোকটি বলেছিলো, 'অনেকদিন থেকে তক্কে তক্কে রয়েছি।'

অন্ধকার। ওপর থেকে হরিপদ চেঁচাচ্ছে, 'গাড়িতে উঠে বসেছেন দাদা?'

আমি জবাব দিতে পারছি না। লোকটি আমাকে ট্যাক্সির খোলা দরজার মধ্যে ঠেলছে। তার একটা হাত ততক্ষণে প্রায় মুখ চাপা দিয়েছে আমার। আমাকে আচমকা এক ধাককায় ছুঁড়ে দিলো ট্যাক্সির মধ্যে। সশব্দে বন্ধ হলো দরজা—ঝটাং। 'চলো—' লোকটি গম্ভীর গলায় হুকুম করলো ড্রাইভারকে।

আমি তোতলাতে শুরু করেছি। ড্রাইভার বেচারীও ভয়ে আধমরা প্রায়। স্টার্টার টানতেই মধ্য রাত্রির বুক চিরে গর্জন করে উঠলো এক যন্ত্রদানব। লোকটি গম্ভীর গলায় আবার বললো, 'চলো সিধা। জলদি।'

ততক্ষণে শরীরের রক্ত আমার জমাট বাঁধি বাঁধি করছে। অসম্ভব কাঁপন উঠেছে, তবু ঘামছি। কথা বলতে চাইছি কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটছে না। গোঁ গোঁ শব্দ বেরোচ্ছে কেবল।

সেনট্রাল এভেন্যুতে পড়ে ট্যাক্সি বাঁ-দিকে মোড় নিলো। ফসফস করে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে লোকটি। বললো, 'চলো সিধা।' প্রায় অসাড় হয়ে আসা আমার হাতটায় যেটুকু অনুভূতি আছে, তাই দিয়ে বুঝতে পারলাম, লোকটি দু' হাতে আমার হাত টিপতে শুরু করেছে। আমার তখন একটা উপমাই মনে পড়লো: বলি দেওয়ার আগে পাঁঠাকে কাঁঠাল পাতা খেতে দেওয়া হচ্ছে।

'চিনলেন কি চিনলেন না।' লোকটি বললো আমাকে।

মনে মনে ভাবি, চিনেই বা কী হবে! মৃত্যুর পর কি আমি তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে আসবো?

'বহুদিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আপনাকে।' লোকটি ক্রমশঃ গায়ের ওপর সরে আসছে। নাগাড়ে হাত টিপে যাচ্ছিলো, 'এইবার মওকা মিলেছে।'

আমি কথা বলছি না। বলতে পারছিলাম না। কিন্তু লোকটি আমার মুখ থেকে কথা বের করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, 'আমার দিকে একবার দেখুন।' লোকটির হাতের থাবা দু'টো আমার গলার দিকে এগিয়ে আনছে। 'মনে পড়ে রবীন্দ্র সদনের কথা? সেই আপনি আমাকে যাতা বললেন…'

আমি স্মরণ করতে চেষ্টা করি। কবে, রবীন্দ্রসদনে কার প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছিলাম মনে পড়ছে না।

'নট্ট কোম্পানীর যাত্রা উৎসবের সময়, সেই সিজন-কার্ড নিয়ে।'

এতক্ষণে মনে পড়লো আমার। নট্ট কোম্পানীর চারদিনব্যাপী যাত্রা উৎসবের কথা। রবীন্দ্র সদনে কাউণ্টারে আমি বসেছিলাম। উদ্বোধন 'বিদ্যাসাগর' পালা দিয়ে। ওইদিন একটি লোক টিকিটের জন্য খুনসুটি করছিলো। ওর ধারণা হাউস-ফুলটা আসলে মিথ্যা। নিশ্চয় ভেতরে টিকিট আছে। অবশেষে ভদ্রলোক বায়না ধরলেন। একটা সিজন-কার্ড তাকে দিতেই হবে। কুড়ি টাকার কার্ড

কিছুতেই পনেরো টাকার বেশি দেবে না। এই নিয়ে বচসা, কথা কাটাকাটি। এতদিন পরে ভদ্রলোক সেই প্রতিশোধ নিচ্ছে।

'আমি নীলমণি'; লোকটি বললো, 'নীলমণি দে।'

'এতদিন পরে, এই রাত্রে হঠাৎ!' না চিনেও আমি চেনার ভান করি।

'খবর পেলাম আপনি নাট্যভারতীতে এসেছেন। এসে দেখি তুলকালাম বোমাবাজি। ভেরি গোলমাল। তাই ফিরে গিয়েছিলাম। একটু আগে এসেছি। কখন আপনি নামবেন দাঁড়িয়েছিলাম তার জন্য। নামলেই ধরবো।'

'কিছু বলার আছে নাকি?'

'বলার জন্যেই তো আসা। বুঝলেন কি বুঝলেন না—আমি লোকনাট্যের মালিক।' এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ ফিরে পাই। মনে পড়ে পঙ্কু সেন বলেছিলেন, তাঁরা জনাকয় মিলে একটি দল করেছেন। নাম: লোকনাট্য। বললাম, 'পঙ্কু সেনও তো শুনেছি একজন পার্টনার।'

'না-না।' নীলমণি দে প্রতিবাদ করছিলো। 'মৌখিক একটা কথা হয়েছিলো বটে কিন্তু পঙ্কুবাবুই সরে দাঁড়ালেন। খুব লসে দল চলছে কিনা।'

'লস!' আমি অবাক হই। 'কী বলছেন আপনি! যাত্রায় আবার লস হয় নাকি?'

'ভেরি লস্। লাইনটা আমার তেমন জানা নেই কিনা, তাই…'

'তবে নামলেন কেন?'

'একটা ভালো দল করার আমার বড়ো ইচ্ছা। আমাকে একটু দেখতে হবে।'

'কী দেখবো?'

'কার বই নেবো, কোন কোন আর্টিস্ট নেবো—এ-ব্যাপারে একটু পরামর্শ দেবেন। মনে করবেন দলটা আপনার ছোট ভাইয়ের।'

বাগবাজার মোড়ের কাছাকাছি নীলমণি দে নামলো। বললো, 'কাল সকালেই আপনার বাসায় যাচ্ছি দাদা।'

'আমার বাসা চেনেন আপনি?'

'কী যে বলেন, যাত্রায় এসেছি আর আপনার বাসা চিনতে পারবো না? একটু ত্রুটি হয়ে গেলো, আগেই যাওয়া উচিত ছিলো আমার। নতুন দল তো? ঝামালি অনেক। বুঝলেন কি বুঝলেন না।' এতক্ষণে আমি আয়েস করে বসলাম। খালধার হয়ে, ব্রিজ পার হয়ে ট্যাক্সি পড়লো বি.টি রোডে। গতিতে ঝড়। স্পিডোমিটারের কাঁটা দেখছি ষাটের ওপরে দুলছে।

তেরো

ভেতর থেকে মহিলা-পুরুষের ভীরু সংলাপের স্বর ভেসে আসছিলো। অতএব থমকে দাঁড়াতে হলো। মেয়েটির গলা মিষ্টি কিন্তু আধো-আধো, ফুটিফুটি কথা—যেন আহ্লাদের ভাব চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। কান পাতলাম। পুরুষের কণ্ঠে চাপা আবেগ; ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি। মনে হলো, ভেতরে ভ্রমরের গুঞ্জন। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল। কেউ কি প্রেমালাপে ব্যস্ত! আশ্চর্য হবার অবশ্যই কিছু নেই কারণ এই চিৎপুরের ভালোবাসার বাজারে কখনও আকাড়া পড়েছে বলে শুনিনি। সিজন-চুক্তি প্রেম এখানে মুড়ি মুড়কির দরে বিকোয়। সুতরাং দরজা-বন্ধ ঘরে যদি কোনো হিরো প্রেমে গদগদ হয়ে হিরোইনকে প্রেম নিবেদকের ভূমিকায় অভিনয় করাবার চেষ্টা করেই থাকে, তবে তার মধ্যে অন্যায়ের গন্ধ শুঁকে বেড়ানো কি সঙ্গত?

কান পাতি। পা টিপেটিপে এগোই। নিজের কাছে নিজেকে সাজতে হয় অপরাধী অথচ কৌতূহলটা এমনই ভয়ঙ্কর দানব হয়ে উঠে যে, তাকে রণে পরাস্ত করাই দুঃসাধ্য। বেশ বোঝা যায়, দয়িতের কণ্ঠে প্রেম ধরা-পড়ি ধরা-পড়ি পাখির বুকের মতন ভীরু, কম্পমান। কিন্তু ওই স্বরে জাগ্রত আর এক অভীপ্সা। সেটা কী? কাম! 'জিনিয়া রতির রূপ অতি বিমোহন। ইহারে পাইলে জানি সার্থক জীবন।'

বিজয়দা বলেছিলেন, 'এমন যে ব্রহ্মা, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, তিনিই কি রেহাই পেয়েছেন? অমোঘার রূপ দেখে তাঁর চিত্তবিকার হয়নি? কামের দাহনে ব্যাটা কাটা পাঁঠার মতন ছটফট ছটফট করছিলো। তোরা আর কী নম্বর ছাড়বি নায়িকাকে! শোন তবে। মর্যাদা পাহাড়ে, মানে কৈলাসের কাছে শান্তনু তার ভুবনমোহিনী স্ত্রী অমোঘাকে নিয়ে তপস্যা করতে এসেছেন। ব্যাটা ব্রহ্মার নজর পড়ে গেছে ঠিক। আছে তক্কে তক্কে। যেই না ফুল বেলপাতা জোগাড় করতে শান্তনুর প্রস্থান, অমনি ব্যাটার এ্যাপিয়ার। একেবারে অমোঘার সামনে।

নানান ধানাইপানাই করার পর কমল-যোনি নম্বর ছাড়লো : এ-কিঙ্করে কর দয়া তুমি সুবদনী। শীতল করহ প্রাণ পলাশলোচনী॥ মাধবী সুন্দরী যথা বেড়য়ে তমালে। সে রূপ বাঁধহ মোরে ও-ভূজ-যুগলে॥ বক্ষোপরি মোরে তুমি রাখ সেই রূপ॥ রতিদান করি মোরে রাখহ জীবন। সার্থক হউক মোর তাপিত জীবন॥

কোথায় আছে এ কাহিনী? পালায়। কিন্তু পালাকার নিয়েছেন কোথা থেকে? বিজয়দা বলতে পারেননি। সেকালের ষষ্ঠী অপেরার সুদর্শন, সুকণ্ঠ নায়ক এই বিজয়দা—মানে বিজে মিত্তির বললেন, 'নম্বরটা যখন ছাড়তো আমার গুরু, মেয়েদের রক্তজবার মতন মুখ ততক্ষণে নিচু হয়ে গেছে। আর পুরুষ? কী বলবো, ব্যাটা ব্রহ্মার জলুনিতে জ্বলে মরছে তখন সকলে।'

গৌর চট্টোপাধ্যায় ছিলো সেই আসরে। শোনার পর থেকে তার মনে আর এক উচাটন। তখন সে বসুমতী পত্রিকার 'রূপরশ্মি' বিভাগের সম্পাদক। শৌভনিক গোষ্ঠীতে অভিনয় করতো, সেখান থেকে এলো কাগজে। তার কৌতূহল বিজয়দা বর্ণিত ওই কাহিনীটা কোথায় আছে তা জানার। রোজ এসে জ্বালাতন করে। আমি লক্ষ্য করছিলাম ওর কৌতূহলটা কতদূর বাড়তে পারে। অবশেষে বলতেই হলো, কালিকা পুরাণের চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়ে 'ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি' অংশটি পড়তে। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন অনুদিত এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা সম্ভবতঃ একশো ছিয়াত্তর কি সাতাত্তর।

গৌর তক্ষুণি ছুটলো। সন্ধান করতে বেরোলো কালিকা পুরাণ কোথায় পাওয়া যায়।



দরজায় কান পাতি এবার। মনে হয় আবেগে, কামে নায়কের কণ্ঠ বুজবুজু। খুব আস্তে কথা বলছে সে। দয়িতা, জানি অনেক পুরুষকে ঘায়েল করার অভিজ্ঞতা নিয়েও এখানে লাজনম্র রমণীর ভূমিকায়। বারো আনা অসম্মতি

এবং চার আনা সমর্পনের ইঙ্গিত তার কণ্ঠে। আসলে এমন কোনো যন্ত্র যদি থাকতো, যাতে মনের আসল অবস্থার ছবি তোলা যায়, তবে কী উঠতো সেই ছবিতে এখন ? বিজয়দার অনুমান, বারো আনা চার আনা অবশ্যই স্থান পরিবর্তন করতো। নায়িকা হাত নেড়ে যতই বলুক না-না-না—মূলতঃ সেগুলো হতো হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ।

এতক্ষণে ভেতরের কথাগুলো কানের ভিতর দিয়া মরমে পৌঁছলো।

দয়িত। কেন অন্যায় ?

দয়িতা। জানি না।

দয়িত। নাই যদি জানো তবে 'অন্যায়' বললে কেন ?

দয়িতা। তুমি কেন ও-কথা বললে ?

দয়িত। কোন কথা ?

দয়িতা। ওই যে (চাপা খিলখিলে হাসি)…যাও (গম্ভীর)! আমি বলবো না।

দয়িত। কেন বলবে না ?

দয়িতা। ধ্যেৎ! (আহ্লাদীর মতন আধো আধো গলায়) আমার ভালো লাগে না। তখন থেকে খালি খারাপ খারাপ কথা বলে যাচ্ছো।

দয়িত। কী খারাপ কথা ?

দয়িতা। তুমিই জানো।

দয়িত। আমি তো খারাপ কিছু বলিনি।

দয়িতা। বলনি, বেশ করেছ।

দয়িত। তুমি 'অন্যায়' বললে কেন ?

দয়িতা। আমার ইচ্ছে…

দয়িত। লুকোতে চেও না…

দয়িতা। কোথায় আবার লুকোলাম ?

দয়িত। তুমি অন্যায় বললে কেন ?

দয়িতা। তবে কি ন্যায় বলতে হবে—

দয়িত। হ্যাঁ।

দয়িতা। দরজা বন্ধ, আলো নেভানো এ্যাই—ওকি—না না না—আমার একদম ভালো লাগছে না।

দয়িত ॥ তুমি যে লুকিয়ে লুকিয়ে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাও তা অন্যায় নয় ?

দয়িতা ॥ বা-রে, সে কথা আসছে কেন ?

দয়িত ॥ আমরা যে চুমু খাই সেটা কি ন্যায় ?

দয়িতা ॥ ন্যায়, নিশ্চয়ই ন্যায়।

দয়িত ॥ কেন ?

দয়িতা ॥ আমরা দু'জন দু'জনকে ভালোবাসি।

দয়িত ॥ এও তো ভালোবাসা।

দয়িতা ॥ বাসা! (অল্প থেমে) কী জানি……

দয়িত ॥ তোমার দেহটা আমার না ?

দয়িতা ॥ হুঁ।

দয়িত ॥ তবে ?

দয়িতা ॥ কিন্তু কিছু যদি হয়……

দয়িত ॥ কী হবে ?

দয়িতা ॥ মোট কথা এটা অন্যায়। বিয়ের আগে এসব……

দয়িত ॥ তার মানে সবই তুমি জানো……

দয়িতা ॥ জানি তো জানি……(অল্প নীরবতা) ধ্যেৎ! (স্বর পালটে) কী হয়েছে তোমার বলতো ? যত্তো সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা……

দয়িত ॥ তুমি তো বুঝতেই পারছো।

দয়িতা ॥ পারলেই কি বলতে হবে নাকি ?

দয়িত ॥ হবে।

দয়িতা ॥ আমি বলবো না, বলবো না—যাও। (অভিমান) কিছুতেই বলবো না।…

এই গোপন মুহূর্ত এবং সংলাপ আরও দীর্ঘ। তবু কেন জানি না, শুনতে শুনতেই আমার মনে পড়ছিলো মধুর প্রেমের কথা। মধু মানে মধু বড়াল—এখন যে-ছেলেটি যুগযাত্রা দলের লেসি। অর্থাৎ তিন বছরের মালিক। কেউ কি কখনও ভাবতে পেরেছিলো সত্যম্বর অপেরার এই 'হি উওম্যান' কোনোদিন যাত্রাদলের মালিক হয়ে বসবে ? আমি ওকে গোড়ার দিকে পিসি বলে ডাকতাম। সত্যম্বর অপেরার সোনাই দীঘি তখন যশের গগনে মধ্যাহ্নের সূর্য। গোড়ায় যখন পালাটি শুরু হয়েছিলো, তখন এ-দলে ছিলেন স্বপনকুমার। ১৯৬১ সনে হিরো পান্টালো।

গণেশ থেকে এলো তপনকুমার। পান্না চক্রবর্তী, দিলীপ চ্যাটারজিও তখন ওই দলে। জ্যোৎস্না দত্ত গোড়া থেকেই সোনাই। মাখন সমাদ্দার সামলাতেন রঙ্গরসের দিক। গানে ছিলেন উপেন অধিকারী। দিলীপ চ্যাটারজি এখান থেকেই প্রমোশন পেলেন টপ-স্টারের। পান্না চক্রবর্তীও তাই। তপন আর জ্যোৎস্না দু'জনেই তখন স্বক্ষেত্রে স্বরাট। মধু বড়াল এ-দলে পিসিমার রোল করতো। চলাফেরায় অনেকটাই মেয়েলি ভাব। এখনও যদি রবি দাসকে বলি, 'রবি, মধুর অভিনয়টা একবার দেখাও তো।' রবি অমনি মুখচোখের চেহারাটা অদ্ভুতভাবে পালটে নিয়ে, গলা চেপে খানিকটা খ্যানখেনে শব্দ তুলে চেঁচিয়ে উঠবে, 'ফিরোজ, ফি—রোজ—ফিরে আয় বাবা!'

গৌরদা বেঁচে থাকতেই প্রমোশন হলো মধুর। হি উওম্যানদের তখন খুবই দুরবস্থা। একটা সময় ছিলো যখন গোটা যাত্রা শিল্পটাই ছিলো পুরুষের অধিকারে, সেই পাখির বাসা ক্রমে ভাঙতে শুরু হলো। হি উওম্যানরা হতে লাগলো উৎখাত। সত্যম্বর অপেরায় জ্যোৎস্না দত্ত একদা মহাচার্য গুরুপদ ঘোষের সহায়তায় পেয়েছিলো এ-দলের হিরোইনের পোস্ট। তারপর একে একে আসতে লাগলো মেয়েরা। শোভাবাজার রাজবাড়িতে যখন যাত্রা উৎসব করি তখনও গুঁফো রাণীদেরই ছিলো আধিপত্য। জ্যোৎস্না দত্ত, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, বীণা ঘোষ, অনিমা কর—সর্বসাকুল্যে গুটি-দশেক মেয়ে তখন যাত্রায়। শোভাবাজার রাজবাড়িতে আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে 'যাত্রায় আরও মহিলা শিল্পীর প্রয়োজন' শীর্ষক আলোচনায় আমার বিরুদ্ধ-পক্ষ ছিলেন পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, বড় ভোলা পাল, প্রভাত বসু। সূর্যবাবুর আপত্তি অবশ্য জোরদার চেহারা নেয়নি কিন্তু তিনি বলেছিলেন, মেয়ে দিয়ে যাত্রায় যে-বাস্তবতা আনার চেষ্টা আপনি করছেন, তাকে সঠিক বাস্তবতা বলা যায় না। আসরের নিজস্ব একটা বাস্তবতা আছে। অভিনয় মানে, যাহা সত্য নয়। এটা গৃহীত সত্য। দর্শকরা সব সময়েই জানেন, বোঝেন—তারা যা দেখছেন তা সত্য নয়, সত্যের অনুকরণমাত্র। সুতরাং একটি ছেলেকে ছোটবেলা থেকে মহিলা সাজিয়ে মহিলাদের মধ্যে রাখলে সে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং যে নিখুঁতভাবে অনুকরণ করতে পারে একজন মহিলার পক্ষে তার কাছাকাছি যাওয়াও কঠিন। তা ছাড়া কণ্ঠস্বরের প্রশ্ন একটা থেকেই যাচ্ছে। মেয়েদের কণ্ঠস্বর, যদি সে স্বরক্ষেপ সম্পর্কে শিক্ষিত না হয়, তবে দু'হাজার লোকের আসরে দাঁড়ালে তাকে হৈ খেতে হবেই।

আমি বললাম, কণ্ঠস্বর সম্পর্কিত ভাবনা নিয়ে আমাদের ভাবিত হবার কোনো কারণ নেই। কারণ আগের অধিবেশনগুলোতে আমরা স্থির করেছি, আসরে মাইক ব্যবহার করা হবে। স্ত্রী-চরিত্রে মহিলা শিল্পী সম্পর্কে আমাদের ভাবতে হচ্ছে, তার কারণ দর্শকের রুচি দ্রুত পাল্টাচ্ছে। থিয়েটারে গেলে সে মহিলাদের চরিত্রে মেয়েদের দেখতে পায়, ফিল্মেও তাই। এমনকি সার্কাস পারটি, ম্যাজিকের দলেও মেয়েদের দেখানো হয়। যাত্রা কেবল যদি তার ঐতিহ্যকে স্মরণ করে জনরুচিকে অগ্রাহ্য করে, তবে অনিবার্য মৃত্যু থেকে তাকে রক্ষা করা কঠিন তো হবেই, অচিরে এই শিল্পকে আবর্জনার মতো ফেলে দেবে ভবিষ্যতের মানুষ।
উনিশ শো একষট্টির পর ক্রমে মেয়েরা পা দিতে লাগলেন এই শিল্পে। গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করে সংসার চালাতো এমন অনেক মহিলা-শিল্পীকে ধরে এনে আমি নিজে যাত্রায় চাকরি করে দিয়েছি।
সেকালের পুরুষ রাণীরা অনেকে এখন ম্যানেজার। অভিনেতা অনেকে। বাকি সকলে বায়না জোগাড়ের কাজ করে যে কমিশন পায়, তাতে চলে তাঁদের সংসার। মধু বড়ালও এমনি করে সরকার থেকে হলো দল-পরিচালক। যে-বছর জয়শ্রী মুখারজিকে দিয়েছিলাম সত্যম্বরে, সে-বছরই হঠাৎ কানে এলো মধুর প্রেমের কথা। উড়ো উড়ো শুনি, চিৎপুরের বাতাসে হালকা মেঘের মতো ভেসে বেড়ায় গুজব। একদিন হঠাৎ গদীতে গিয়ে হাজির। শৈলেন মোহান্ত জামা-গেঞ্জি খুলে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে। সামনের বেঞ্চে সি পি আই-এর সদস্য কালীবাবু। কী নিয়ে তর্কাতর্কি হচ্ছিলো। আমি গিয়ে উপস্থিত।
একটা কথা ব'লে নি। তখন গৌরদা, অর্থাৎ গৌরচন্দ্র দাস মশাই আর ইহলোকে নেই। গদীর যে পুরনো চেহারা ছিলো, শৈলেন তা ভেঙেচুরে নতুন করে গদী সাজিয়েছেন। সেই চেয়ারটা আছে কিন্তু স্থানান্তরিত। সত্যম্বরের গদীঘরে ঢুকলেই মনটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে, বুক গলা জ্বালা করে উঠে আসে কান্না। সুতরাং যতোটা সম্ভব কম যেতে চেষ্টা করি ওখানে। এ-নিয়ে কম অভিযোগ শুনতে হয়নি আমাকে। শৈলেন অনেক সময় ক্ষিপ্ত হয়েছেন, অস্ত গদিঘর থেকে বেরোবার সময় দেখা হ'লে ছলোছলো চোখে অভিমান করতেও দেখেছি। কিন্তু কোনো সময়েই আসল সত্য প্রকাশ করিনি। বলিনি, ওই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গলা বুক জ্বালা করে নেমে আসতে চায় কান্নার জল। গৌরচন্দ্র দাসের শব নিয়ে আমরা যখন শোভাযাত্রা করি, সেই সময়ের একটি ছবি আছে গদীতে। আর

আছে গৌরদার যৌবনকালের একটি বড় ছবি। সুন্দর, সুপুরুষ। একমাথা ঝাকড়া কোঁকড়া চুল, মোটা গোঁফ—চোখ দু'টো জলজলে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় ওঁর চোখের পলক পড়ছে, তারা নড়ছে। কেবলই আমার মনে হয়, দেহ ভস্মীভূত হলেও মায়ার বন্ধনে বাঁধা গৌরদার আত্মা এই চোখগুলিতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গৌরদা বলতেন, 'আমি তাঁর ওপরে বসে আছি।' কার ওপরে? সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের ওপরে। একদিন গল্পগুজবে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিলো। আলোচনা হচ্ছিলো, আত্মা ও তার পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কে। গৌরদা, আমি আর সুবল অধিকারী ছিলাম গদীতে। গৌরদা দু'হাত কপালে তুলে বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। তারপর চোখ খুললেন। 'তিনি আছেন।' তিনি! আমরা অবাক! কে তিনি? গৌরদা সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের নাম করলেন। বললেন, 'আমি অনেকবার দেখেছি। অনেক রাত্রে সবগুলো ঘরময় তিনি ঘুরে বেড়ান। নীরবে, নিঃশব্দে। তারপর হঠাৎই আর দেখা যায় না।'

'কথা বলেন?'

'না।'

'চোখের পলক পড়ে?'

'ততটা দেখিনি। তবে ঘুরে ফিরে এসে এই ঘরটাতে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ান। ওঁর ওষ্ঠ কাঁপে মনে হয়। কিছু বলতে চান। কিন্তু অমুক, ওঁর তো প্রাণ নেই যে কথা বলবে।'

আমার মুখ থেকে সব ঘটনা শুনে বিজয়দা বললেন, 'আসবে না মানে? মায়া ওঁকে গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনবে। একটা যাত্রাদল হলো গিয়ে সন্তানের মতন। কতো যে গর্ভযন্ত্রণা, সে একমাত্র জানেন মালিকই। যতদিন দল ততদিন ঘুমের বাবার সাধ্যি কি চোখে নেমে আসে। সেই জাগতে জাগতে শালা, আত্মাটাও বাস করে জাগরণের জমিতে। মহাশূন্যে থেকেও তো নিস্তার নেই ব্যাটার। দল কেমন চলছে, তার বিপদআপদ আছে নাকি—এ-সব দেখতে নেমে আসতেই হয় তাঁকে।'

আমি প্রতিবাদ করি, 'আপনি বিজয়দা এ-সব মানেন? কী করে মানেন? আত্মা আসে এ কি হয়?'

বিজ্ঞের মতন হাসেন বিজয়দা, 'আসে বলেই মানতে হয়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

কথাও বলেছি। এই ধরুন না কেন কান্তি চাটুজ্জে মশাই। মথুর সা-র আমল থেকে এতবড়ো দালাল জন্মায় নি। জ্যোতিষী বলেছিলো, জলে তাঁর মৃত্যু লেখা। জীবনের দশ আনা কাবার করার পর সেই জলেই তাঁর মৃত্যু হলো। আমারই চোখের সামনে। সেই কান্তিবাবুকে বহু যাত্রাদল দেখেছে। যশোরের দিকে যেতে নদীতে যদি রাত নেমে আসে, জানবেন ঠিক কান্তি চাটুজ্জে মশাই এসে হাজির।'

যাত্রা'র ইতিহাসের সঙ্গে কান্তি চাটুজ্জ্যের নামটি জড়িত। বলা যায়, তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। মথুরানাথ সাহা, অর্থাৎ মথুর সা-র দলের মালিক মথুরাবাবু চিৎপুরে পা দেবার পর থেকেই কান্তিবাবুর বিশেষ ভক্ত এবং অনুগত ছিলেন। তৎকালীন দালালরা, বর্তমানে যাদের ফিল্ড-অফিসার বা লর্ড বলা হয়, সে-কালে তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে চালাতেন দল। তখন গোটা দেশ জমিদারদের প্রতাপে কাঁপতো। এবং এই সব জমিদারদের বাড়ির কোথায় কোন যাত্রা হবে তার যোগাযোগ করতেন কান্তিবাবুরা। বলতে কি, তখন সবচেয়ে বড়ো জমিদারদের সঙ্গে বেশি জান-পয়চান ছিলো কান্তি চাটুজ্জ্যে মশাইয়ের। মথুরাবাবু তাঁর বায়না ব্যতিরেকে বড় একটা গানই করতেন না।

চিৎপুর-নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের জংশনে, এখন যে-বাড়িতে শান্তিনিবাস হোটেল এবং নাট্যভারতী, প্রদীপ অপেরা, আনন্দলোক, আনন্দমেলা, নাগ কোম্পানী, গণবাণী, তপোবন এবং রাণার দলের গদী—ওখানেই ছিলো মথুর সা-র দলের বাসাবাড়ি। উল্টোদিকে, যেখানে এখন কল্যানী অপেরা—ওখানে তৈরি করা হয়েছিলো নহবৎখানা। রোজ ছ-ঘণ্টা ধরে ওস্তাদ মুন্না খাঁ সাহেব—তখনকার দিনের বিখ্যাত সানাই বাদক রোজ-চুক্তিতে সানাই বাজাতেন। প্রতি চার দিন অন্তর নহবৎখানার কাপড় পালটে দেওয়া হতো। গদীঘরে পাহারায় থাকতো দু'জন দারোয়ান: গণেশপ্রসাদ আর বিহারীলাল। তখনকার দিনে তাদের এক এক-জনের মাসিক বেতন ছিলো তিরিশ টাকা। তকমা-আঁটা পোশাক ছিলো তাদের গায়ে। পেতলের চাকতিতে লেখা ছিলো: মথুরানাথ সাহা থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি। একবার তৎকালীন দিনের আর এক বিখ্যাত দালাল অতুল পাঁজা এসেছেন মথুর সা-র দলের বায়না করতে। মথুরবাবু বললেন, 'কী চাই পাঁজা-মশাই?' পাঁজা মশাই বললেন, 'রজনী পোদ্দারের জমিদার বাড়িতে পার্চাদনের বায়না আছে। বাবুর বড়ো শখ তিনি আপনার দলের গান শুনবেন।'

'আচ্ছা।' মথুরবাবু হাসলেন। তাকালেন সরকারের দিকে। বললেন, রজনী পোদ্দারের বায়নার ফাইল দেখতে। সরকার ১২ বছরের হিসাব দেখে বললেন, পাঁচবার ওখানকার বায়না এনেছেন কান্তি চাটুজ্জ্যে মশাই, এবার অতুলবাবু। মথুরবাবু অনেক্ষণ চুপ করে থেকে হুঁকো বরদারকে হুঁকো দিতে বললেন। অতুল পাঁজা মশাই বললেন, 'আমি কি কোনো অসুবিধে করেছি আপনার?' মথুরবাবু মাথা নাড়লেন, বললেন, 'না-না পাঁজামশাই, না। একখান কথা জিগাই আপনেরে। কান্তিবাবুর ঘরে ঢুকেন আপনি কুন সাহসে?'

অতুল পাঁজা অবাক হয়ে তাকান, 'ঘরে ঢুকলাম মানে?'

'বুইজলেন না?' মথুরবাবু মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা সরালেন, 'বুজবার পারলেন না?'

'না।' অতুল পাঁজা মাথা ঝাঁকান।

'রজনী পুদ্দারের ঘরখান কার—আপনের, না কান্তিবাবুর?'

'ঘর কারও কেনা নয়,' অতুলবাবু কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করেন, 'জমিদার-বাবুরা আর কান্তিবাবুকে চাইছেন না, তাই……'

'তাই?' মথুরবাবু অতুল পাঁজার মুখ থেকে কথা কেড়ে নেন, 'আইচ্ছা পাঁজামশয়, আপনার মাইয়া যদি তার স্বোয়ামীরে অপছন্দ করে, তাইলে কি জামাই বদল কইরা দিবার পারেন আপনে?'

'এ-কথা বলছেন কেন আপনি?'

'কান্তিবাবুর লিগ্যা।' মথুরবাবু চোখ বুঁজে অল্পক্ষণ গড়গড়া টানেন। ভুরুক টান বন্ধ করে তাকান। 'গান গামু না।'

'কেন!' অতুল পাঁজা অবাক হয়ে তাকান।

'রজনী পুদ্দারের গান গামু আমি কান্তিবাবুর বায়না পাইলে।'

'আচ্ছা!' অতুল পাঁজার গলায় উষ্মা। 'আপনি জানেন কি, দু'শো বায়না বগলে করে আমি ঘুরি?'

মথুরবাবু চোখ বুঁজে অত্যন্ত অনীহভাবে গড়গড়া টেনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ হাঁক ছাড়লেন, 'গনশা-বিহারী।' যেমনি ডাক অমনি তকমা-আঁটা, কোমরে তরোয়াল ঝোলানো দুই অবাঙালী দারোয়ান দরজায় এসে সেলাম ঠুঁকে দাঁড়ালো, 'হজৌর।'

মথুরবাবু সরকারের দিকে তাকালেন আগে, 'হালার পুতে কয় কী? দুই শ

ঘর ? পাঁজা মশয়রে কইয়া দ্যান, অই তুই শ ঘর জমিদারীই আমি কিন্যা লমু ৷ আমার নাম মথুর সা।' অবার গড়গড়া টানেন। টানতে টানতে বলেন, 'দল করি আমি, ভাতের ভয় দ্যাহায় হালা দালালে!' তাকালেন দারোয়ানদের দিকে, 'পাঁজার পুতরে জুতাইতে জুতাইতে লাথা।'

যে-কান্তিবাবুর প্রতি মথুরানাথ সার এতো টান, সেই কান্তি চাটুজ্জ্যে মশাই বসুন্দিয়া বাজারের কাছে নৌকাডুবিতে মারা যান। ওর কাছেই অভিনেতা নিতাই দাসের বাড়ি। ওঁর গ্রামের লোকেরা বলতো, গভীর রাত্রে কান্তি চাটুজ্জ্যে মশাই মাঝ-নদী থেকে চিৎকার করতো: বাঁচাও…বাঁচাও… বাঁচাও। অনেক মাল্লা-মাঝি কান্তিবাবুকে দেখতেও পেয়েছেন। জলের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতেন। গায়ে চাদর জড়ানো।

হরিপদ একবার বলেছিলো, যশোরে গান গাইতে যাচ্ছিলো রঞ্জন অপেরা। বসুন্দিয়ায় পৌছে শেষ রাত্রের দিকে। নৌকোর মধ্যে সবাই ঘুমে অচেতন। হরিপদও। হঠাৎ সোঁ সোঁ শব্দ এবং অট্টহাসির জোর আওয়াজে ঘুম ভাঙে হরিপদর। ছুটে বাইরে এসে দেখে, মাঝিরা সবাই অজ্ঞান হয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করছে। আগ গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন কান্তি চাটুজ্জ্যে মশাই। সেই চাদর গায়ে। হাসছেন। হরিপদ বললো, 'ওই না দেখে দাদা আমার আত্মাটাও খাঁচাছাড়া হয় আর কি। প্রাণপণে রামনাম স্মরণ করি। কান্তিবাবু যতো এগিয়ে আসেন, আমি তত সরে যাই ছইয়ের দিকে। চোখ দু'টো ওর ড্যাবডেবে, ঠিক মরা গরুর গলা চোখের মতন। আমাকে দাঁড়াতে বললেন চাটুজ্জে মশাই। 'হরে', চাটুজ্জে মশাই ডাকলেন আমাকে, 'বিজে মিত্তিরকে বলিস, গয়ায় পিণ্ডি না দিলে আমি কাউকে ছাড়বো না।'



বিজয়দা অর্থাৎ বিজে মিত্তিরকে অগত্যা ছুটতে হয় গয়ায়। কান্তিবাবু যে বিজয়

মিস্তিরকে বড্ডই ভালোবাসতেন, সুতরাং তাঁর হাতের পিণ্ডি না পেলে যাবেন কেন ?

শৈলেন মোহান্ত আর কালিবাবুর আলোচনার পর, মধুর খোঁজ করতেই মুচকি হাসলেন শৈলেন। কালিবাবুর মুখেও দেখি হাসির উদ্ভাস।



'মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধব...'

রহস্যটা চট করে বোধগম্য হয় না। অথচ কথার সুরে মনে হয়, এক দুর্ভেদ্য জগতের দুয়ার বন্ধ। এক লহমা ভাবি। আঁচ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু ভোঁতা মনটা কিছুতে বিশ্বাস করতে চায় না, আমাদের মধু কিছু একটা করে ফেলতে পারে। সেই কিছু একটাই বা শেষ পর্যন্ত কী চেহারা নেবে কে জানে! দেখা যাক না একটা ঢিল ছুঁড়ে। 'শেষ পর্যন্ত তা হ'লে...'

শৈলেন মনে করলেন, সবটাই বোধ হয় আমার জানা। বার-দুই-তিন চিবুকটা বুকের সঙ্গে লাগিয়ে হাসলেন, 'হয়ে গেছে!'

আবার ভাবনা। ঢেউটা তেমন স্বচ্ছ মনে হলো না আমার কাছে। কেমন একটা রহস্যের মধ্যেই আটকা রয়ে গেলো ঘটনাটা। তার মানে কি মধু চাকরি ছেড়ে দিয়েছে! হিসেব করে কূল কিনারা পাই না। নাকি দলের কোনো ক্ষতি করেছে মধু বড়াল ?

শৈলেন কিন্তু হেসে যাচ্ছিলেন। ইঙ্গিতের হাসি।

অবশেষে মালুম হলো। ইঙ্গিত সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিতে বাধ্য হোলাম : সেই যে নয়াদিল্লির রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আশুতোষ সাহা বিএ বিএল কানে কানে বলেছিলেন, একটা কথা আছে ? সে-কথাটা আর কিছু নয়, একটা অনুরোধমাত্র : আমি যেন জয়শ্রীকে বাঁচাই। জয়শ্রী অর্থাৎ জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়। নিউ রয়েল বীণাপানি অপেরার 'স্বামী বিবেকানন্দ' পালায় ওকে

আমি প্রথম দেখি। ও সেজেছিলো 'নিবেদিতা'। যেমন চেহারা তেমনি রঙ। মানিয়েছিলোও চমৎকার। অভিনয়ে কোথাও খামতি খুঁজে পাইনি। পরের মরশুমে জয়শ্রী এলো নাট্যভারতীতে। কিষাণবাবুর মেয়ের সংখ্যা বাড়লো আর একজন। ও-দলে তখন দুই কাকু। এক. কিষাণবাবু, দুই. জয়-গোবিন্দ রায়চৌধুরী। বাৎসল্য প্রেমের চাপে মেয়েটার প্রাণ ওষ্ঠাগত। জয়দা কিষাণবাবুকে মোটা একটা অঙ্কের টাকা ধার দিয়েছিলেন। সেই দৌলতে দলে তাঁর আধিপত্য বাড়ছিলো। কেবল খোকা মল্লিক ছাড়া সকলে জয়দাকেই বেশি শ্রদ্ধা করতো। পুব-বাঙলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়কে এই সময়ে জয়দা একটা বাড়ি করে দিয়েছিলেন দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টে। একতলা কোঠাবাড়ি। এ-সব নিয়েই কিষাণবাবুর সঙ্গে অন্তর্বিরোধের একটা ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়। এবং দিললিতে গিয়ে তা ভয়াবহ আকার নেয়। ওখানেই দু'পক্ষ নালিশ জানিয়েছিলো আমার কাছে। আমি বললাম, কলকাতায় ফিরে গিয়ে এর একটা সমাধান করা যাবে।

দিললির গানের পর দল গেলো বেনারসে। আমি রওয়ানা হলাম হরিদ্বারের দিকে। স্টেশনে এসে খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরলেন আশুবাবু। বললেন, মেয়েটাকে আমি যেন বাঁচাই।

মেয়েটা মানে জয়শ্রী।

'জয়দা কি সত্যি বাড়ি করে দেবার টাকা ফেরৎ চাইছেন?'

'চাইবেই.' আশুবাবু বললেন—'অতগুলো টাকা বিনা-সুদে কেউ ফেলে রাখে?' আশুবাবুর চোখে মুখে কেমন এক হিংস্র ভাব এবং আক্রোশ, 'আট আনার জায়গায় হিসেব দাঁড়িয়েছে টাকায়—বুঝলেন না?' আমি অবাক। যতদূর জানি জয়দা অন্তত সে-রকম মানুষই হয়। তা ছাড়া গাঁটের পয়সা তিনি সবটাই খরচ করেননি। একজন বিল্ডিং কনট্রাকটরকে দিয়ে কাজ করিয়েছেন। সেই টাকা জয়দা আস্তে আস্তে দিচ্ছেন।

'লোকটা কি খুব সুবিধের?' আশুবাবু আমাকেই শুধোন। নিজেই জবাব দেন, 'খুব সুবিধের লোক নয়। এখন টাকা টাকা করে মেয়েটার মাথা খাচ্ছে। পরের মরশুমের জন্য কোথাও থেকে এ্যাডভান্স পাইয়ে দিয়ে আপনি জয়শ্রীকে উদ্ধার করুন।'

দিন পনেরো পর আমি কলকাতা পৌঁছলাম। পরদিন জয়শ্রীকে সঙ্গে করে

আশুবাবু আমার বাসায় এলেন। জয়শ্রীর বক্তব্য থেকে বুঝতে পারলাম সে সম্পূর্ণভাবে ঋণমুক্ত হতে চায়। অতো টাকা কিষাণবাবুর পক্ষে অ্যাডভান্স করা সম্ভব নয়। সুতরাং জয়শ্রীকে কোন দলে দেবো ভাবতে হলো আমাকে। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মেয়েটিকে বাঁচাতে পারে একটিমাত্র লোকই। তাঁর নাম শৈলেন মোহান্ত। বললাম, 'ঠিক আছে, কথা বলে আমি জানাবো।'

কিষাণবাবু আর জয়দার বিরোধটা কলকাতায় এসে সংঘর্ষের চেহারা নিলো। নাট্যভারতীর গদী শোভাবাজারে। তার মানে জয়গোবিন্দ রায় চৌধুরীর এলাকায়। অতএব জয়দা বলে গেলেন, তিনি কিষাণদাকে দেখে নেবেন। কিষাণবাবু বলে গেলেন, তিনি সাংবাদিক। যথেষ্ট ক্ষমতা তাঁর। পুলিশও হাতের মধ্যে। সুতরাং জয়বাবুকে তিনি ছাড়বেন না। একদিন দু'জনকেই ডাকলাম। আমার টেবিলে, আমার মুখোমুখি বসলো দু'জন। মিটমাটও হয়ে গেলো। শর্ত হলো এই যে, টাকাটা কিষাণবাবু এক সিজনের মধ্যে আস্তে আস্তে শোধ করবেন। এগ্রিমেণ্ট জমা থাকবে মাখনলাল নট্টর কাছে। টাকা শোধ হলে কিষাণবাবু এগ্রিমেণ্ট ফেরৎ নেবেন। কিন্তু জয়দা করবেন কী? বললেন, 'আমার একটা ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতেই হবে।' কী করবো! বললাম, 'আপনিই বলুন না কী করতে চান আপনি?'

'আমি দল করবো।' জয়দার গলায় দৃঢ় সংকল্প।

আমি বাধা দিই 'কী অভিজ্ঞতা আছে আপনার যে নতুন দল করবেন! টাকাগুলো জলে যাবে।'

'যাবে না।' জয়দা জোর গলায় বললেন, 'আমি পারবো। টাকা পয়সার অভাব হবে না।'

তাই সই। বেলা দেবীর মাধবী নাট্য কোম্পানী তখন রমেন বসু মল্লিকের হাতে। পালা 'রিকশাঅলা।' গানে প্রচুর যশ। কিন্তু আমদানীর চাইতে ব্যয় বেশি। সুতরাং রমেন, 'দি ফোর্থ বাসু অব বেঙ্গল' দল ছেড়ে দিয়ে চাকরির কথা ভাবছে। জয়দা ওই দলটাই লীজ নিলেন। জি এম হিসাবে এসেছিলো যাত্রা ইনড্রাসট্রির সর্ব কনিষ্ঠ পরিচালক রণজিৎ রায়—যে গত কয়েক বছর ধরে লোকনাট্য দলের জি এম হিসারে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

রমেনকে আমি রমেন বসু মোল্লা বলে ডাকি। খুব প্রাণোচ্ছল, উদার যুবক।

রাজনীতি করতে ভালোবাসে। বামপন্থী রাজনীতিতেই ওর বিশ্বাস। ও নিজেকে 'ফোর্থ বাসু অব বেঙ্গল' বলে বারবার ঘোষণা করে। বাকি তিন বসু কে কে? রমেন সঙ্গে সঙ্গে তালিকা দিয়ে দেবে ১ রাসবিহারী বসু, ২ সুভাষচন্দ্র বসু, ৩ জ্যোতি বসু, ৪ নম্বর বসু ও নিজে। রমেনকে কেন আমি বসুমোল্লা বলে ডাকতাম ওই প্রসঙ্গ এখানে অনুল্লেখ থাক। তবে মাধবী নাট্য কোম্পানীকে জনপ্রিয় করেছিলো রমেন বসু মল্লিকই।

মাধবী নিলেন জয়গোবিন্দ রায়চৌধুরী। রমেন বসু মল্লিকের গতি কী হলো স্বভাবতই এ-প্রশ্ন ওঠে। উত্তরে জানাই, ওই একগুঁয়ে, জেদী ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলেন বড়দা—অর্থাৎ তিনকড়ি গুছাইত।

সে-কালের প্রভাস অপেরা সে-বছরেই হলো নিউ প্রভাস অপেরা। তিনকড়ি গুছাইত তাঁর শিসকো প্রিন্টার্সে আগে যাত্রার হ্যাণ্ডবিল, পোস্টার, প্রোগ্রাম ছাপতেন। এই সুবাদে বেশ কিছু নায়েকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তার ওপর বন্ধুপুত্র হতভাগা রমেনকে নিয়ে তিনি কী-ই-বা করেন। অগত্যা দল হলো। দীনবন্ধু গুছাইতে হলেন দলের মালিক। তিনকড়িদা পৃষ্ঠপোষক এবং রমেন জেনারেল ম্যানেজার।



শৈলেন মোহান্ত রাজি হলেন। জয়শ্রীর দুর্দশা শৈলেনকে নিশ্চয়ই ব্যথিত করে থাকবে। সে-কারণে তো বটেই, তা ছাড়া ও আমার অনুরোধকে উপেক্ষা করতে পারেনি। জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় সে-বছরই বহাল হলো সত্যম্বরে। এ্যাডভান্সের টাকা নিয়ে ও আগে জয়দার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিলো। এখন শৈলেন মোহান্ত মধু সম্পর্কে আভাসে ইঙ্গিতে যা বোঝাতে চাইছে, তার সঙ্গে কি জয়শ্রীও জড়িত? কেমন যেন সন্দেহ হলো আমার। কিন্তু ওই প্রসঙ্গটা একদম চেপে গেলাম আমি। জানতাম ধরতাইটা যখন হাতে পেয়েছি, বাকিটা জানতে আমার

খুব একটা সময় লাগবে না। কারণ চিৎপুরের বাতাস কথা বলে, আর সেই ভাষা আমার অজানা নয়।

সত্যম্বরের গদীতে গেলেই টানা আড্ডা। সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতির আলোচনায় আসর জমজমাট। তর্কবিতর্ক, ঝগড়াঝাটির অন্ত নেই। এ-ব্যাপারে যতো দক্ষ শৈলেন ততো উৎসাহ আমার। এর মধ্যে যদি কালিবাবু উপস্থিত থাকেন তো পোয়াবারো। নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠবে। শৈলেনের অবশ্য সুবিধে ছিলো। গদীতেই স্নানাহার সারার ব্যবস্থা আছে 'কন্তু আমাকে যেতে হবে সেই বরানগরে। সে-দিনই চিৎপুরী হাওয়া কানে পৌঁছে দিয়ে গেলো খবরটা। যাহা কিছু রটে তাহা সত্য হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং বিস্ময় আর বিস্ময়। জয়শ্রী ভালোবেসেছে মধুকে, না মধুই বলেছে : দেহি পদ-পল্লব মুদারম্? অথবা দু'জনের চোখেই দু'জনকে মনে হয়েছে পরমপ্রিয়?

অফিস ফিরতি আবার চিৎপুরে। এবার অন্য গদী। আলোচনার বিষয় মধু-জয়শ্রীর ভালোবাসা। আসরে জনা-দুই মালিক, জনা-চারেক জি এম এবং আমি। ছোট ফণিবাবু কথিত এই বিচিত্তির পুরের মানুষেরা, আশ্চর্য, কোনো ঘটনাকেই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে চায় না। আগে হাঁটতে চায় উলটো পথে। আর সেই পথটা কামটের মতো এমন কামড়ে বসে থাকে যে, কার সাধ্য সে দাঁত তুলে নেয়। জয়শ্রীকে অনেকদিন আমি যাত্রায় দেখেছি। নাট্যভারতীতে তখন কাজ করতো মোহন-মিতাও। বয়সে তখন ওরা দু'জনই বেশ কচি। মোহন মানে মোহন চট্টোপাধ্যায়। দেখতে সুপুরুষ, টিকলো নাক, মোটা ভুরু, চোখের চাউনিতে আশ্চর্য এক মায়া, রঙ ফর্সা—অনেকটা গোরা কেষ্ট কেষ্ট ভাব। ছেলেটি বেশ লাজুকও। নাট্যভারতীতে ওকে নেওয়া হয়েছিলো কৃষ্ণ সাজাবার জন্যে। মিতা অর্থাৎ তখনকার নমিতার বয়স কত হবে? চৌদ্দ কি পনেরো বড়জোর। ভীষণ চঞ্চল, নাক মুখ সার্প, চলনে বলনে স্মার্ট এবং গানের গলাটি বেশ চমৎকার। নাট্যভারতী দলের সঙ্গে আমাকে থাকতে হয়েছিলো টানা বারো দিন। আসামে। সে সময়ে জয়শ্রীকে যেমনটি দেখেছি আজও দেখি তেমনিই। যাত্রায় এতো সম্ভ্রমবোধ আমি কোনো মেয়ের মধ্যেই দেখিনি। হাজারটা মেয়ের মিছিলে হারিয়ে যাবার মতন মহিলা জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় নয়। সুতরাং শ্রদ্ধা, স্নেহ দুই-ই অর্জ্জন করতে পেরেছিলো জয়শ্রী। তার সম্পর্কে কেউ খারাপ ইঙ্গিত করলে আমি ব্যথিত হোতাম।

চিৎপুরের গুজবকারীরা ধারণা করে নিয়েছিলো মধু-জয়শ্রীর প্রেম কোনোদিন সুখ-নীড়ের সন্ধান পাবে না। নানা লক্ষণকে হাজির করে ওরা এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো। একজন ওদের প্রেমালাপের যে বিবরণ দিয়েছিলো এ পরিচ্ছেদের প্রথমে বর্ণিত মুহূর্তে সে-কথাটাই আমার মনে পড়েছিলো। কিন্তু চিৎপুরের সবগুলো গুজবের স্বরকে অগ্রাহ্য করে মধু-জয়শ্রীর সংসার হলো। এবং হলো এক সুখনীড়। অভিনয় যাঁরা করেন, তাঁদের সকলকেই প্রায় বলতে শুনেছি, অবকাশের সময়টাতে প্রতি সন্ধ্যায় মানসিক দিক থেকে তাঁরা নাকি ভীষণ কষ্ট পান। চোখের সামনে দর্শক থাকে না, আসর কি স্টেজ থাকে না, নানা ধরনের আলোর ঝর্ণায় স্নান করা হয় না, মুখে রঙ না মাখার, অভিনীত চরিত্রের পোশাক-পরিচ্ছদ না পড়ার কষ্টটাও কম নয়। সুতরাং সন্ধ্যা হ'লেই মনে মেঘ, গায়ে ম্যাজম্যাজে ভাব এবং কেবলই হাই ওঠা আর ফৎ ফৎ করে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করা। সুতরাং অবসর নেবার মতো মনের জোর ক-জনেরই বা থাকে। জয়শ্রী তথা জয়া কিন্তু অতি হেলায় সকল কষ্টকে অতিক্রম করে প্রকৃত গৃহিণী হয়ে মধু বড়াল নামক গৃহস্থের ঘর আলো করে বসে আছে। জয়া এখন জননী। তার সন্তান সংখ্যা দুই। একটি ছেলে, একটি মেয়ে।

'অভিনয় ছেড়ে দেওয়া কি খুবই কষ্টের?' এই প্রশ্ন করেছিলাম ছন্দা চ্যাটার্জিকে। জবাবে ছন্দা বলেছিলো, জীবনের সবচেয়ে বড়ো প্রলোভনকে সে ত্যাগ করতে পারে অভিনয়ের জন্যে। ছন্দা চ্যাটার্জির স্বামী নিমাই সুর বলেছিলো, বিয়ের আগে ছন্দা নাকি এমন চুক্তি করে নেয় যে, নিমাই কোনোদিন ছন্দার অভিনয়ের ব্যাপারে বাধা দিতে পারবে না।

নিমাই সুরের সঙ্গে তখন আমার ঘনিষ্ঠতা হয়নি। ছন্দাকে দেখেছিলাম মিনারভা থিয়েটারে উৎপল দত্ত মশাইয়ের নাটকে অভিনয় করতে। সে একটা এমন বড়ো এবং সিরিয়াস রোল ছিলো না— যাতে দেখামাত্রই তাকে চেনা যায়। বিজনদার বাসায় ওদের সঙ্গে আমার পরিচয়। বিজনদা মানে নাট্যকার অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য।

সে-বছর মাখনলাল নট্ট দু'নম্বর দল করেছিলো : বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ। নট্ট কোম্পানীতে এলেন কমল মিত্র, বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজের টপে তখন অরুণ দাশগুপ্ত। বীণা অর্থাৎ আজকের বীণা দাশগুপ্ত তখনও নট্ট কোম্পানীর বাড়িই চেনে না। সে তখন বীণা চক্রবর্তী। সম্ভবত নিউ রয়েল বীণাপানি অপেরার হিরোইন।

পরিকল্পনা হয়েছিলো ভালো দল করার। বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজে অভিনয় করার জন্যে চুক্তিবদ্ধা হ'লেন শিপ্রা মিত্র। কিন্তু হিরোইনের পোস্টে আসবে কে? খোঁজ খবর নিয়ে মাখনকে সঙ্গে করে গেলাম লতিকার বাসায়। লতিকা দাশগুপ্ত। দিন কয়েক আগেই অরুণ সেনগুপ্তর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে লতিকার। রূপবাণী সিনেমা হলের পেছন দিকের একটা ফ্ল্যাটে থাকে। সেখানে গিয়ে হঠাৎই আমরা হাজির। মাখন অবশ্য ইতস্তত করছিলো। কিন্তু লতিকা যখন প্রথম অভিনয় করে প্রায় তখন থেকেই আমার সঙ্গে ওর পরিচয়। আমার অফিসে কোনো অভিনেত্রীরই প্রবেশাধিকার ছিলো না সে-সময় কিন্তু বিজয়া দশমীর পর লতিকা যেমন করে হোক একবার আসতো প্রণাম করতে। তখন অপেশাদার নাট্য-অভিনয়ের জগতে এক গুচ্ছ সম্ভাবনাময় শক্তিশালী অভিনেত্রী বিরাজ করছে। বয়সের দিক থেকে প্রায় সকলেই কাছাকাছির। লতিকার দিদি প্রতিমা দাশগুপ্ত তখন এ্যামেচার-কুইন। হিমানী গাঙ্গুলী, তৃপ্তি গাঙ্গুলী, জোৎস্না বিশ্বাস, প্রতিমা পাল, অলকা গাঙ্গুলী, যুথিকা ভট্টাচার্য, সোনালী দাশগুপ্ত, প্রতিমা দে, পুতুল চক্রবর্তী, ইরা মিত্র, বীথি গাঙ্গুলী, শেলী পাল, মায়া ঘোষ, বেলা সরকার, সীমা রায়, কেয়া চক্রবর্তী, লিলি চক্রবর্তী প্রায় সমসাময়িক কালের। এদের মধ্যে লতিকার নামই সকলের আগে মনে পড়লো। অরুণ-লতিকা দু'জনেই আমাদের সাদর আহ্বান জানালো। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলো সে-দিনই। ঠিক হলো কেবল গৌহাটি শহর ছাড়া সর্বত্রই লতিকা অভিনয় করবে। গৌহাটিতে করবে না, কারণ ওখানে ওর শ্বশুরালয়। কিন্তু সে-সময় লতিকার পক্ষে যাত্রায় জয়েন করা সম্ভব হলো না। হঠাৎ অনিবার্য কারণ দেখিয়ে লতিকা তার অক্ষমতার কথা জানালো আমাকে। অরুণ লিখলো, 'এ-অবস্থায় লতিকার পক্ষে অভিনয় করা সঙ্গত হইবে না, দাদা।' নেক্সট কে? সীমা রায়। সীমা তখন 'রৌদ্ররেখা' নাটকে অভিনয় করে দারুণ নাম করেছে। কিন্তু অসুবিধে দেখা দিলো এই যে, সীমা গান গাইতে জানে না। অথচ গাইয়ে হিরোইন চাই। ব্রজেন্দ্রকুমার দে বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজের জন্য 'পতিঘাতিনী সতী' পালা লিখেছেন লালবাঈকে নিয়ে। অতঃপর?

ভাবছি কাকে মানাবে 'লালবাঈ' চরিত্রে। কোন অভিনেত্রী একসঙ্গে নাচ গান অভিনয় তিন শাখাতেই সমান পটু। দিন কাটলো। রাতও। সকালে

মাখনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলাম ছন্দা চ্যাটারজির খোঁজে। ঠিকানা জানি না। কেবল জানা আছে যাদবপুর পেরিয়ে। ট্যাক্সি নিয়ে অলিগুলি খুঁজে অস্থির। বেলা প্রায় একটা বাজে। হঠাৎই মনে হলো একমাত্র ডাকঘরই দিতে পারে সঠিক হদিস। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে এলাম ডাকঘরে। ভাগ্যবলে পাওয়া গেলো পিয়ন মশাইকেও। তিনি আমাদের ঠিকানা এবং পথের হদিশ দিলেন। বেলা দু'টোর সময় আমরা একটি টালির ঘর, বাঁশের বেড়া, মেঝে মাটির—এমন একটি কুটিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। 'নিমাইবাবু বাড়ি আছেন? নিমাইবাবু?' বারকয়েক ডাকাডাকির পর একজন ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কে?' আমি বললাম, 'আমরা নিমাইবাবুকে খুঁজছি—নিমাই সুর।' হঠাৎ মহিলা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। খাটো করে শাড়ি-পরা। গাছকোমর বাঁধা। আমাকে দেখে যেন আকাশ থেকে পড়লেন—'প্রবোধদা! আসুন, আসুন—ভেতরে আসুন।'

লাজুক মাখনচন্দ্র মহিলাদের দেখলেই কেমন জুড়িয়ে যায়। সে ইতস্তত করছিলো। 'বাড়িতে দাদা পুরুষ টুরুষ কেউ যদি না থাকে··'। আমি ওকে ধমক দিলাম। টেনে নিয়ে গেলাম ভেতরে। ছন্দা বললো, নিমাইবাবু নাকি খানিক আগেই বেরিয়েছে। এখুনি ফিরবে। সুতরাং পড়ন্ত দুপুরে একটু চা খাওয়া গেলো। অপেক্ষা। বেলা চারটে বাজে, নদে অন্ধকার। ছন্দাকে আমি কিছু বলিনি। শুধু বলে এলাম, নিমাইবাবুকে অতি সত্বর, মানে কালকেই দেখা করতে বলতে হবে। বিষয়টি খুবই জরুরী। সঙ্গে মাখনলাল নট্ট ছিলেন সে-কথাটাও নিমাইবাবুকে জানাতে বলে আসতে হলো।

ছন্দা নাচ জানে, জানে গানও। সে-কথাটা কী করে জানলাম? তারও একটা ইতিহাস আছে। বিজনদার ওখানে পরিচয় হবার পর বেশ কিছুদিন কাটলো। লতিকা এলো না, সীমাকে নেওয়া যাচ্ছে না। ভীষণ দুর্ভাবনা। এমন সময় বিখ্যাত লোকসংগীত-শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী আমাকে ফোন করলেন একদিন। ওঁর সঙ্গে সম্পর্কটা আমার গভীর বন্ধুত্বের। বললেন, একটি মেয়ে তাঁর ছাত্রী—দেখতে শুনতে ভালো, অভিনয়েও চৌকস· সে খুবই স্টার্ভ করছে। যাত্রায় তাকে নিলে বেচারী বেঁচে যায়। বললাম, 'নামটা বলুন।' নির্মলেন্দুবাবু ছন্দার নাম করলেন। ঠিকানাটা দিতে পারলেন না। বললেন, দিন দুই পরে দিতে পারবেন। ছন্দার ভাই ফাল্গুনী ক্লাস করতে

এলে। কিন্তু আমার তো দু'দিন বসে থাকার সময়ই নেই। ব্রজেনবাবু লিখে পাঠিয়েছেন. 'আপনার পরামর্শ, পরিকল্পনা মতন 'পতিঘাতিনী সতী' রচনা শেষ। কিন্তু মাখন যখন মেয়েদের নিয়ে দল করছে তখন লালবাঈ চরিত্রে নাচগান জানা একজন সুন্দরী অভিনেত্রী দরকার। সাগর মন্থন করে সে লক্ষ্মীকে কেবল আপনিই আবিষ্কার করতে পারেন।' সুতরাং রাধতে সয়েছে, বাড়তে সইছে না। নির্মলেন্দুবাবুকে বললাম, 'জায়গাটা বলতে পারেন?' তিনি যে জায়গার কথা বলেছিলেন, সে অঞ্চল চষেই আবিষ্কার করা গেলো ছন্দাকে।

পরদিনই নিমাই-ছন্দা দু'জনে এলো আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে। কথা পাকা, মাইনে সেট্‌ল্‌ড্‌। সে-দিনই চুক্তিতে সই-সাঁবুদ। সূর্যবাবু দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করলেন মেয়েটিকে। ওরা চলে যাবার পর বললেন, 'মেয়েটা, বাবু, খুব নাম করবে দেখবেন।'



ছন্দা বললো, অভিনয় তার জীবনের লক্ষ্য, অভিনয় তার জীবনের স্বপ্ন। অভিনয়ের জন্য সে সর্বস্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। এবং ঠিক এই কারণেই নিমাইকে পরিত্রাতা পতি হিসাবে বরণ করে নিয়েছে—এ টপ রিসোর্সফুল ম্যান ইন দিস লাইন।

নিমাই সুর করতেন বাম রাজনীতি। বাগনান এলাকায় তার নামডাক যথেষ্ট। শখের থিয়েটার করতে করতে কোলাঘাটের ডাক্তারের মেয়ে ছন্দা চ্যাটারজির সঙ্গে তার পরিচয়। সেই পরিচয় কীভাবে ভালোবাসার শেকলে বাঁধা পড়লো, সে আর এক মহাভারত। তনুশ্রী বর্ণিত সেই চিৎভারত প্রসঙ্গ পরে বলা যাবে। আপাতত যে-প্রসঙ্গ বলা হচ্ছে সেখানেই থাকা যাক। ছন্দা বললো, 'অভিনয়ের সময় প্রত্যেক শিল্পী সম্পূর্ণ অন্য জগতে বাস করে। তার সামনে ঘর, সংসার, এই জগৎ, বাস্তব পৃথিবী কিছু থাকে

না। এমনি করে একজন শিল্পী মনের দিক থেকে বিভক্ত হয়ে যায়। আস্তে আস্তে তার বারো আনা মনটা চলে যায় অন্য জগতে। সে-জগতের নাম আনন্দ জগৎ। বাকি চার আনাতে কিছুতেই তখন আর মন ভরে না। সকাল থেকে সারাটা দিন কেবল সময়ের দিকে চোখ রাখা। কখন দুপুর গড়াবে। বিকেল গড়িয়ে নামবে রাত্রি · এ প্রতীক্ষা তারই। কারণ রাত্রিই অভিনয়ের সময়। রাত্রিই আসল মায়া রচনার কাল। তাই যখন একজন শিল্পী অভিনয় থেকে বঞ্চিত হয় অথবা সাময়িক অবকাশ নিতে বাধ্য হয়, তখন তাঁর দেহের মধ্যে বারো আনা বিবাগী মনটা আহত পাখির মতো ছটফট করতে থাকে। কিছুই ভালো লাগে না।'

জয়শ্রী কিন্তু বলেছিলো অন্য কথা। বলেছিলো, 'বনবাসী মন নিয়ে ঘর করার মতো অপরাধ আর কিছুতেই হতে পারে না। নারীর শাশ্বত চাওয়া বলতে একটি সুখনীড়, একজন সহৃদয় স্বামী এবং একটি কি দু'টি সন্তান। নারী-জীবনের পরিপূর্ণতা তো এখানেই। যে-নারী স্ত্রী হয়ে স্বামীসঙ্গ সর্বদা পায় না, যে-নারী মা হয়ে সন্তানের জন্যে দিবারাত্র উতলা হতে পারে না—তার জীবনে দাম্পত্য সুখটা তেতো ওষুধের মতন মনে হতে পারে। ফুলের সম্পূর্ণতা যেমন প্রস্ফুটন ও সৌরভ প্রদানের মধ্যে, ঠিক তেমনি নারীজীবনের সার্থকতা প্রকৃত জননী হওয়ার মধ্যেই।'



দরজা বন্ধ। ভেতরে দয়িত দয়িতার সরস প্রেমালাপ জমে উঠেছে। কান পেতে শুনছিলাম। ভাবছি এখনই চূড়ান্ত সময় দরজায় টোকা দেবার। ঠিক এমন সময় রবি এলো। কাঁধে ক্যামেরা, ফিল্ম এবং ফ্ল্যাশ-স্ট্যাণ্ড ভরতি ঝোলা-ব্যাগ। আমাকে ওই অবস্থায় দেখে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলো, আমি আড়ি পেতেছি। সুতরাং সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে এসে ও নিশ্চুপে পাশে দাঁড়ালো। ইঙ্গিত করতেই

কান পাতলো রবি দরজায়। এবং উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠলো ওর মুখ। কানের কাছে মুখ এনে বললো, দলের লোকরা সবই জানে এবং এখন অনেকেই গোয়েন্দাগিরিটাও দেখতে পারছে। সুতরাং এ-স্থান পরিত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তখন মুমূর্ষু গোধূলির শেষ টান ওঠার মতন অবস্থা। দিনের আলোয় ছায়ার রঙ ঢালছে অলক্ষ্যের কোনো শিল্পী। শেষ শরতের নীলাম্বরী আকাশে খাপছাড়া পাখির দাগ। সন্ধ্যা নামবে এখনই। মফঃস্বলের ছোট্ট শহরের চৌহদ্দি পার হলেই দেখা যাবে সবুজের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। বেলা সাড়ে বারোটায় দল এসে পৌঁছেছিলো এখানে। বাসবাড়ি পেতে পেতে দেড়টা। হিরোর চাই আলাদা ঘর। কেবলই একলার। সুতরাং স্কুল-বাড়ির টিচার্স ওয়েটিং রুমটা সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। ওখানে কোনো সমস্যা ছিলো না। নায়েকরা বিপদে পড়লেন খোদ মালিক দলে আসায়। তাঁর চাই আরও ভালো বন্দোবস্ত। সে-ব্যবস্থাও শেষ পর্যন্ত হয়ে গেছে। জি. এম. নিমাই চক্রবর্তী বললো, 'আপনার আর আলাদা ঘরের প্রয়োজন নেই দাদা, আপনি বরং দল ম্যানেজার সুধন্যর বিছানায় একটু আরাম করে নিন।' কফি খেয়ে গল্প করে কতক্ষণ কাটানো যায়? সুতরাং উঠি। চারপাশের নিস্তব্ধ প্রকৃতি শোভা দেখতে বেরোই। এখানে নগর ও প্রকৃতি মেলানো মেশানো—কাছেই ঘন বাঁশ ঝাড়, তেঁতুল তমালের ঘন সন্নিবেশ, অদূরে নদী, তালগাছের মাথায় পুচ্ছ নাচিয়ে প্রেমালাপমগ্ন দু'টি দোয়েল, চালের টুঁইয়ে-বসা দু'টি পায়রা গলা ফুলিয়ে কালোয়াতি করছে: বক-বকম, বকম বকম…। এ থামে তো শুরু করে ও। খানিক আগেও অক্লান্ত ঘুঘুর ডাক শোনা গিয়েছিলো। ভাবলাম, এর চাইতে বরং একটু বসা যাক হিরোর ঘরে, নয়তো দলে-আসা মালিকের সঙ্গে। তখন কিন্তু ভাবতেই পারিনি আচমকা এ-ধরনের একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হবো, আমার কৌতূহলের দানবটাকে মনের ধারালো অস্ত্রে পরাস্ত করতে পারবো না কিছুতেই।

'কফি এনেছে নিমাইবাবু', রবি বললো। 'আমরা বরং দাদা সুধন্যর ঘরে গিয়ে বসি। আপনি একটু গড়িয়ে নিন। গান তো সেই রাত আটটায়।'

কফির টানে ফিরি সুধন্যর কাছে। ওর বিছানায় তখনই উঠে এসেছে টাল-করা প্রোগ্রামের বাণ্ডিল। নিমাই একটা বাক্সের ওপর বসে আয়েস করে সিগ্রেট টানছিলো। সামনে দাঁড়ানো একটি লোক হাত নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছে।

আমাকে দেখতে পেয়ে খুব কায়দা করে সিগ্রেটা ফেলে দিলো নিমাই। উঠে এলো. 'কিছু খেয়ে নিন দাদা। বিকেলের টিফিন তো হয়নি এখনও ?'

'কী খাওয়াবে ?' আমি প্রশ্ন করি।

'ভালো সন্দেশ এনেছি—নকুড়বাবুর সন্দেশ তো আপনি পছন্দ করেন তাই…?'

'গরম মুড়ি পাওয়া যাবে ?'

'মুড়ি !' নিমাই অবাক।

'খোলায় ভাজা হচ্ছে এমন গরম গরম মুড়ি আনাও।'

'কফির সঙ্গে মুড়ি !' নিমাইয়ের গলায় একবর্ণা বিস্ময়। 'নন্দ,' নিমাই হাঁক দিলো। পলক ফেলার আগেই নন্দ এসে হাজির। এবং নিমাই-এর হুকুম প্রতিপালনের জন্য সঙ্গে সঙ্গেই দে-ছুট।

রবি কি নিমাইকে কিছু বলেছে ? নাকি আমার আড়িপাতার খবর কেউ ওর কানে পৌঁছে দিয়েছে ? তখন থেকে নিমাইচন্দ্র কিছুতেই আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে না। কাজে খুবই দড় এই দল-পরিচালকটির স্বভাব এমনিতেই খুব নম্র এবং ভদ্র। অথচ দলের ব্যাপারে যে-কোনো অসাধ্য সাধন নিমাই চক্রবর্তী করতে পারে। মহাজন জোগাড় করতে হবে—নিমাই রেডি। গান ক্যানসেল হয়েছে—বায়না তৈরি। আর্টিষ্ট পালিয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে দাঁড় করানো হয়েছে। যাত্রা ব্যবসায়ের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজই ওর জানা ! শুনেছি নিমাই প্রথমে যাত্রায় এসেছিলো সাট-হোল্ডার হিসাবে, অর্থাৎ প্রম্পটার। তারপর ক্রমে সে সবগুলো কাজই শিখে ফেলেছিলো ; কেবল অভিনয় করা ছাড়া। বিধাতা অবশ্য ওই শখটাকে অপূর্ণ রাখেন নি। নিমাই তখন শ্যামলীকে বিয়ে করেছে। প্রেম করেই বিয়ে। যাত্রা জগতের হিরোইন শ্যামলীকে ঘরে পেয়েই বোধ হয় হঠাৎ ওর দল করার শখ হয়ে থাকবে। ঘরের হিরোইনকে না দিতে হবে এ্যাডভান্স, না মাইনে। সুতরাং নিমাই চক্রবর্তী বারবার তিনবার যাত্রাদল করেও বিত্তবান হতে পারলো না। উনিশ শো সাতাত্তর সালে একদিন শ্যামলী এলো আমার কাছে। কাঁদছিলো। বললো, নিমাইয়ের মুখ থেকে বালতি বালতি রক্ত উঠছে। সে এখন হাসপাতালে, ওদের একটি সন্তান, তার মুখে চার চামচ দুধ তুলে দেবার মতন সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। নিমাইয়ের জন্য ইনজেকশন ওষুধপত্র জোগাড় করা দূরে থাক, একবেলা খাওয়ার মতো সংস্থান পর্যন্ত শ্যামলীর নেই।

আমার পক্ষে যতটা সাহায্য করা সম্ভব তা দিয়ে বললাম, 'তুই কাজ করবি ?' শ্যামলী প্রথমটায় বেশ উৎসাহী হয়ে উঠলো। বললো, 'সব দলই তো চালু হয়ে গেছে এখন কি চাকরি হবে দাদা ?' বললাম 'সেটা আমি দেখবো। চাকরি না করলে এই খরচের ধাক্কা তুই সামলাবি কী করে ?' শ্যামলী মাথা নাড়ছিলো, চোখ মুছছিলো। বললো, 'আপনার ভাই বারবার আমাকে আপনার কাছে আসতে বলেছে। আমিও আসবো আসবো করি কিন্তু হাসপাতাল আর ছেলেটাকে সামলে একদণ্ড সময় করে উঠতে পারি না। গতকাল ছেলেটাকে চন্দননগরে মা-র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। একটা চাকরি হ'লে দাদা আপনার ভাইকে আমি বাঁচিয়ে তুলতে পারি।'

ভাবছেন বুঝি বেনাবনে শ্যামলী এক মুক্তো ? নাকি ভাবছেন এই শ্যামলীই হয়তো একদিন স্বামী-সন্তান ফেলে ভিন্ন পথে হাঁটা দেবে ? অস্বীকার করার জো নেই এমনটি ঘটে, ঘটছে। কিন্তু চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে আনার মতনই স্বামীকে তরতাজা করেছে যাত্রার অনেক সাবিত্রী। শ্যামলী তাদেরই একজন।

বললাম, 'তুই একটা দরখাস্ত কর পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের কাছে। মিটিংয়ে দরখাস্ত প্রসঙ্গ উঠলে অন্তত শ পাঁচেক টাকা অর্থ সাহায্য যাতে পাস তার ব্যবস্থা করে দিতে আমি করতে চেষ্টা করবো।' শ্যামলী জানালো ও ভালো করে মুসাবিদা করতে পারবে না। সুতরাং দরখাস্তের মুসাবিদা আমাকেই করে দিতে হবে।



যতদূর মনে পড়ে দরখাস্তের একটা মুসাবিদা আমি করে দিয়েছিলাম। এবং দিন পনেরোর মধ্যে শ্যামলী পেয়েওছিলো পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের আর্থিক অনুদান নগদ পাঁচ শো টাকা। এবং শ্যামলী ওই সালে বিপ্লব মুখার্জির দল

রাজধানী যাত্রা ইউনিটে চাকরিও পেয়ে গিয়েছিলো। ১৯৭৮ সালে হঠাৎ একদিন রবি বসুর যাত্রাতীর্থ দলে নিমাইকে দেখতে পেলাম। সে এই নতুন দলের জি-এম-এর পোস্টে জয়েন করেছে। আটাত্তরেই দলটির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। খুঁজে পাওয়া যায়নি রবি বসুকে। জানি না নিমাই আর শ্যামলী তাদের সন্তানসহ কোথায় কেমন আছে।

মুখচোরা নিমাইয়ের লাজ ভাঙার জন্য নয়, আমার জানা প্রয়োজন ওই মহিলাটি কে—যে-দরজাবন্ধ ঘরে পবিত্র কুমারীর চরিত্রে অভিনয় করছে। সুতরাং ওকে ডাকি, হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাই অদূরের নদীপারের দিকে।

ততক্ষণে সন্ধ্যাপাখি তার ডানা মেলে দিয়েছে। দিনের শেষ আলোটুকু কখন যেন সুরুৎ করে পালিয়ে বেঁচেছে। এখন শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া। কথায় কথায় আসল জায়গায় চলে এসেছিলাম। এ-দলে কী হয়, কেমন করে হয়। প্রথমটা কেমন ইতস্তত করে নিমাই। শেষে পাশ-কাটাবার তালে বলে, 'আপনার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোনো ব্যাটা পার পেয়েছে কি? সামু আমাকে গেলোবারের কথা বলেছিলো। আপনিই তো ধরেছিলেন ওকে।'

'সামু!' আমি ঠিক মনে করতে পারি না।

'সেই যে গরলগাছায়?' নিমাই মনে করিয়ে দেয়। 'আপনার এক ধমকে মেয়েটা কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে। বিশুর সঙ্গে জুটি বেঁধেছে। বিয়েও হয়ে গেছে।'

এতক্ষণে মনে পড়ে। ঈশ্বরের কী অভিপ্রায় কে জানে, যতো অঘটন তা আমার চোখেই পড়ে। অবশ্য দলের হিরোইন আভাষে ইঙ্গিতে এই ঘটনা সম্পর্কে আমাকে আগেই জানান দিয়েছিলো। এবং যথারীতি দলে যেতেই চাক্ষুষ প্রমাণ।

দরজা অবশ্যই বন্ধ ছিলো। সেবারেও ফিরে এসেছিলাম আমি। খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম, সামু নামক একটি পনেরো বছরের মেয়ে দিন কয়েক আগেই দলে এসেছে। পূব-বাঙলার মেয়ে। মানুষ হয়েছে রিফিউজি ক্যাম্পে। গান শেষ হ'লে ওকে ডেকে পাঠালাম। মেয়েটি ভয়ে কুঁকড়ে গেছে দেখলাম। বললাম, 'দরজা বন্ধ ঘরে কেন গিয়েছিলি?'

'আমি যাই নাই। বাবু কইলো তাই গেলাম। বাবু কয়, আমার নাকি মাইন্সা বাইড়্যা যাইবো'

'তারপর?'

'তারপর বাবু কথা কইতে কইতে দরজা বন্ধ কইর‍্যা দিলো। কয়, আমার লগে কথা কইতে দেখলে অন্য মাইয়ারা নাকি হিংসা করবো। বাবু কাছে বইতে কইলো। বইলাম। তারপরে······'

'হ্যাঁ তারপর ?'

'হি কথা বাবু কইবার পারুম না। কঅন যায় না।' ফৎফৎ করে শুরু হলো কান্না। কান্নার সঙ্গে কিছু স্বগতোক্তি। কিংবা বলা যায় অভিযোগও। মেয়েটি বলছিলো, সে নিরুপায়। সংসারে বাবা মা ভাইবোন মিলে তার পাঁচ জনের সংসার। এই সংসারের মুখে অন্ন তুলে দেওয়াই তার কাজ। তাই······

এখানে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা আসলে এক বিকৃত মানসতার। নিরাবরণ রমনী-দেহ অঙ্কন গুণী শিল্পীর হাতে মহত্ব এবং পবিত্রতা পেতে পারে। তা হতেও পারে গ্রেট আর্ট। কিন্তু বয়স্ক লোক যখন এক কিশোরীর বসনহীন নিটোল শরীরটাকে অক্ষম আক্রোশের শিকার করে নেয়, তাকে কী বলা যায় ? একেই কি বলবো অশ্লীলতা ? আমাদের সাহিত্যের শ্লীল অশ্লীলতা নিয়ে মাঝে মাঝে দেখি রাজনৈতিক প্রভুরা সপারিষদ বিচার করতে বসেন। কিন্তু তাবৎ বিশ্বজুড়ে মহিলারা যে মডেল হয়ে বিত্ত উপার্জ্জন করেন বা গ্রেট আর্টিস্টরা যে এসব নগ্ন দেহকে প্রত্যক্ষ করতে করতে মহৎ চিত্র কি ভাস্কর্যের সৃষ্টি করেন তখন কিন্তু প্রতিবাদ ওঠে না। তার মানে কি এই যে অক্ষমরাই অশ্লীলতার লক্ষ্য ? অপসংস্কৃতিজনিত এক আলোচনা-সভায় একবার একটি চমৎকার উদাহরণের কথা উল্লেখ করতে হয়েছিলো। কিছু রমণী-দেহলোভী-শয়তান একজন মহিলাকে বলপ্রয়োগে বিবস্ত্র করেছিলো। মহিলা দেখলেন, একদল পুরুষের চোখে ক্ষুধার্ত নেকড়ের দৃষ্টি। অসহায় সেই মহিলা অগত্যা একটি গান গাইতে শুরু করলেন। গানটির ভাবার্থ যদি হয় এই যে : হে প্রভু, তুমি অলক্ষ্যে কিংবা যদি থাকো সম্মুখেই, তুমিই দেখ নারীর এই গোপন রূপ, কারণ এতো তোমারই সৃষ্টি—তুমিই দিয়েছ সাত ছিদ্রের কলসী এই দেহ এবং লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। সুতরাং আমার লজ্জা, আমার অপমান, আমার গৌরব-অগৌরব সবই তোমার। তবে ওই মুহূর্তকে কি অশ্লীলতার পর্যায়ে ফেলা যায় ?

সামুর নিরাবরণ দেহ সৌন্দর্য যিনি উপভোগ করেছেন, হ'তে পারে তিনি এক রোগগ্রস্থ অক্ষম কামুক। কিন্তু সামু ? তার মনটাতো নিবেদিত ছিলো অভাব

নামক ঈশ্বরের পদতলে : এই দেহ দর্শনের যদি মূল্য দাও প্রভু, তবে দর্শন করো : তাতেই আমার পরিতৃপ্তি। কেবল বেতনটা যেন বাড়ে।



ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেছিলেন মানবী? জগৎ সংসারকে রক্ষা করতে? ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে? মানবেতিহাসের পথরেখা অঙ্কন করতে? বিজয়দা বলেন, 'ভুয়ো ভুয়ে'—সব ভাঁওতা। মাতৃশক্তির অভ্যুদয় হয়েছিলো এই জগতের ভারসাম্য রক্ষা করতে। একদিকে তিনিই প্রকৃতি, অপর দিকে তিনিই ধ্বংস। মহিলারা আসলে এক একটা বাজারের থলে। যে ব্যাটা গরীব সেও আয়পত্র করে ওখানে রাখে—কোটিপতিও তাই। পার্থক্য শুধু এই, একটা থলে ছিদ্রবিহীন অন্যটা ছিদ্রের আকার। এ-ভাবেই বিধাতা বিশ্ব সংসারে ব্যালান্স রাখছেন।'

সঠিক সাম্যর মতন ঘটনা নয়। অথচ গোটা চিৎপুরের সন্দেহ তাই। সুন্দরী, যৌবনবতী অভিনেত্রী মহাশয়া সর্বদা কেন একজন বৃদ্ধের গায়ের সঙ্গে এঁটুলির মতন লেগে আছে! তা হ'লে নিশ্চয় একটা কিছু আছে! কী? নাইবা বললাম। চিৎপুরী গুজব ওই বৃদ্ধের নাড়িভুড়ি ধরে টানাটানি করছিলো। ব্যাটা চার ছেলে তিন মেয়ের জনক। নাতি নাতনীর সংখ্যা অনেক। শেষ বয়সে নাতনীর বয়েসী একটি মেয়ের সঙ্গে—ছিঃ ছিঃ! আর একদল ওই সুন্দরী অভিনেত্রীর মুণ্ডুপাত করে যাচ্ছিলো : কিসের অভাবটা তোর যে একটা বুড়ো ভামের সঙ্গে লৎগৎ করছিস! কী দেবে তোকে ওই বুড়ো? তোর যে জগজ্জননীর মতন রূপ, দেহে যে ইন্দ্রাণীর মতন যৌবন ঢলোঢলো—তা দিয়ে বিধাতাকে পর্যন্ত কাবু করা যায়। তা না, কোন আক্কেলে পড়ে আছিস একটা প্রায় মরা বটবৃক্ষের তলে?

কথা প্রসঙ্গে মেয়েটিকে আমি শুধোবার সুযোগ পেয়েছিলাম। কেন ও বিয়ে করছে না—বাবা মায়ের আপত্তি আছে কি বিয়েতে—এই পথ ধরে এসেছিলাম গুজবে মৌতাত চিৎপুরের প্রশ্নোত্তর জানতে। শুনে মেয়েটি হাসলো। বললো,

এ-জগতে মেয়ে হয়ে জন্মানো এক ভয়ানক অভিশাপ। অরণ্যের পশুগুলোকে চেনা যায় তারা অরণ্যের নিয়ম মেনে শিকারের মান নির্ধারণ করে। হরিণ না পেলে বাঘ শেয়ালটা খায় না। ...'খানা নেহি মিলতি তো শের ভূখে মর যাতি হ্যায়, লেকিন কুত্তা খাতে খাতে ভি ভিখ মাঙতে যাতি হ্যায়!' মেয়েটি বললো, 'অরণ্যের চাইতে জনারণ্য এক ভয়াবহ স্থান। এখানে প্রতি পদক্ষেপে আত্মরক্ষার পদ্ধতির কথা ভাবতে হয়। এও দাদা, আত্মরক্ষারই এক কায়দা। সবাই সন্দেহ করুক না। সন্দেহ অন্তত ওদের এটুকু বোঝাবে যে, মেয়েটির যা ছিলো তা দিয়েছে ওই বুড়োর পায়েই। এখানে আর কিছু পাবার নেই। এটাই আমাদের এক অস্ত্রস্বরূপ। এ-তো দাদা এ্যাকটিং। তবে নিশ্চিন্ত এ-কারণে যে, বুড়োর নখে আর ধার নেই। চোয়ালে নেই একটাও দাঁত।'



নদী পার থেকে সটান প্রত্যাবর্তন সাজঘরে। ততক্ষণে প্রথম দিকের আর্টিস্টরা মেক-আপে বসে গেছে। দেখলাম শ্রীমতী হিরোইন সাজঘরের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে অচেনা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে।

'দাদা!' দেখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রণাম। 'শুনলাম দরজার কাছে গিয়েও ফিরে এসেছেন! ঢুকলেই পারতেন। দরজাটা তো ভেজানো ছিলো মাত্র।'

বললাম, 'তোরা কথা বলছিলি ·'

'কথা-না, কথা-না—', মেয়েটি মাথা নাড়ছিলো; 'একটা খাটো রিহার্সাল দিয়ে নিলাম। নতুন পালা খোলা হবে কিনা, তাই। বইটা দাদা ভালোই লিখেছে ভদ্রলোক। নামঃ বাহুবন্ধন। নতুন পালাকার।'

হায় ঈশ্বর, এ তোমার কেমন ছলনা! এ-কথাটাই মনে মনে আমাকে বলতে হলো।

চৌদ্দ

তখন সন্ধ্যা। নিউ গণেশ অপেরার গদিঘরে গোষ্ঠবিহারী ঘোষ মহাশয় নিজেই দেখি ধূপদানি হাতে সন্ধ্যা দিচ্ছেন। দেওয়ালে ঠাকুর দেবতার অনেক ছবি। মাঝখানে বেশ বড়োসড়ো একটি কালীমূর্তির ফটো। তার সামনে গলগলে ধোঁয়া-ওঠা ধূপদানিটা আরতি দেওয়ার কায়দায় দোলাচ্ছেন আর বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। কী? কান পাতি। গোষ্ঠদা বলছেন, 'মা তুই বিচার করিস। গোপলা শালা কাল থেকে গদীতে আসার নাম করছে না। অ্যাডভান্স নিয়ে সটকে পড়েছে। শালাকে ওলাওঠা দিয়ে শিক্ষা দিস মা। মেরে ফেলিস না শালাকে। তা হ'লে দল বন্ধ হয়ে যাবে আমার! তুই মা বিচার কর। শালা আমাকে বাপ বলেছে, তুই আমাকে সন্তানহারা করিসনি মা। বাপ হওয়ার ঠ্যালা শালা তুই কি বুঝবি মাগো·· তুই তো শালা মা···'

প্রণাম সেরে ধূপদানি রাখতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি, 'ছে কী চাই?' গোষ্ঠবিহারী ঘোষ সেই প্রথম দেখলেন আমাকে। আপাদমস্তক লক্ষ্য করছিলেন। বাঙলার শত্রুঘন সিনহা অভয় হালদার, জি এম অব নিউ গণেশ অপেরা অদূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলো। তার মুখে মিটিমিটি হাসি। যেন বাঘের মুখে শিকার পড়ার পরিণতি সে উপভোগ করছে।

আমি আমার নাম বললাম। বললাম 'আপনি আমাকে ঠিক···'

গোষ্ঠবাবু আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলেন, 'চিনি চিনি, ছে আপনি চিৎপুরের কানে ফুঁসমন্তর দিলেন আর গোষ্ঠ ঘোষ চিনবে না আপনাকে?' গোষ্ঠবাবু চেয়ার দেখিয়ে দিলেন আমাকে, 'ছে বসতে আজ্ঞা হোক।'

মুখোমুখি বসলাম। মাঝখানে একটা টেবিল। বললাম, 'সবই তো শুনেছেন। উৎসবে একপালা গান গাইতে হবে। সেলের ফিফটি পারসেন্ট আমি দলকে দেবো।'

'দেবেন?'

'হ্যা।'

'দেবেন !'

'হ্যাঁ।'

'ছে আমি গাইলুম নি।' গোষ্ঠবাবু মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

'গাইবেন না !'

'না। গাইলুম নি।'

'কিন্তু সকলেই গাইছে। শর্তে রাজি হয়েছে সকলে।'

'আমি শর্তে রাজি হলুম নি।'

আমি বিরক্ত হই লোকটির প্রতি। এ কী রকম ব্যবহার রে বাবা! এত বড় একটা ব্যাপার আমলেই আনছেন না ভদ্রলোক! অস্বস্তি অনুভব করি এবং তীক্ষ উত্তেজনাও। তাকাতে গিয়ে দেখি, অভিনেতা-পালাকার আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়ও অভয় হালদারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে। আমি উত্তেজনা অনুভব করি। চলে যাবো ? নিজেকে শুধোই। পর মুহূর্তে ভাবি, না। জেনেই যাই, কেন নিউ গণেশ অপেরা শোভাবাজার রাজবাড়ির উৎসবে যাত্রা গাইবে না।

গোষ্ঠবিহারী ঘোষ প্রচুর বিত্তশালী লোক। গায়ে সদ্যভাঙা গিলেকরা দামী বিলিতি আদ্দির পাঞ্জাবী। সোনার বোতামে চারটি হীরে বসানো। হাতে পাঞ্জাবীর ওপর পরেছেন সোনার ব্যাণ্ডে বাঁধা ঘড়ি। গলায় অন্তত ভরি সাতেকের সোনার হার প্যাঁচ দেওয়া। দশ আঙুলে আটটি সোনার আঙটি—রঙবেরঙের দামী পাথর বসানো। পরণে কোঁচানো ফরাসডাঙ্গা ধুতি। পায়ে চকচকে পাম্প-সু। গায়ে ভুরভুর করছে বিদেশী সেন্টের গন্ধ। লোকটা গোমড়া-মুখ করে জেদি ছেলের মতো বসে আছে গুম মেরে।

'তা হ'লে কোন শর্তে গাইবেন ?' আমি বললাম।

'চা-ফা খাওয়া হলে ছে বলবো 'খন।'

চা এলো, বিপুলাকৃতি চারটি রাজভোগও। দেখেই আমার চক্ষু চড়কগাছ।

'এতো আমি খেতে পারবো না।'

'ছে খেতে হবে।'

'কিন্তু আমার পেটেই যে অতো জায়গা হবে না।'

'না হলে গান গাইলুম নি।'

আচ্ছা ফ্যাসাদ। কেমন লোক রে বাবা! খেলুম নি তো গান গাইলুম নি!

মতলবটা কী বুঝতেই পারছি না। অগত্যা কোনোরকমে দু'টি রাজভোগ গলাধঃকরণ করি। অসহায়ের মতন তাকাই সামনের গম্ভীর ফুলবাবুটির দিকে। অবস্থা বুঝে কিনা কে জানে, ভদ্রলোক হুঙ্কার ছাড়েন—'কেষ্টা!' সঙ্গে সঙ্গে কেষ্টা এসে হাজির। বাবুর চোখের ইশারা মতন প্লেট সরিয়ে নেয়। আমি চা খেতে থাকি।

এতক্ষণে কথা বলেন গোষ্ঠবিহারী ঘোষ, 'ছে সবাই চুক্তি করেছে আধা বখরা লেবে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি দেবেন কেন?'

'মানে একটা খরচ খরচা তো আছেই…'

'থাকবেই। শালাদের হাজার হাজার টাকা যে ইয়ের গর্তে যাচ্ছে…'

'মানে…', আমি কথা কেড়ে নিই—পাছে গোষ্ঠবিহারী ঘোষ মুখ খারাপ করেন সেই ভয়ে। 'পরে তো বলতে পারে আমি টাকা পয়সা দিইনি…'

'বলবে। দিলেও শালারা বলবে। মশাই এর নাম চিৎপুর। আপনি পুরা দেবেন, ছে ওরা বলবে প্রবোধবাবু পয়সা না দিয়ে মহল্লা বানিয়েছে।'

'তাই নাকি!' আমি অবাক হই।

'বললুম নি, এর নাম চিৎপুর? এ-হচ্ছে মানুষ কেনাবেচার বাজার।' গোষ্ঠবাবু আরও গম্ভীর হলেন। 'হারামীর বাজার।' একটা পান মুখে গুঁজলেন ভদ্রলোক।

'পয়লা দিন গান দিয়েছেন কাকে?'

'নট্ট কোম্পানীকে।'

'আমি গাইবো। ছে আমাকে পয়লা আসর দিতে হবে।'

'কিন্তু…' আমি অস্বস্তি অনুভব করি। 'মানে, নট্ট কোম্পানীকে কথা দেওয়া হয়েছে…।'

'ছে-কথা তুলে লিন।' একটু চুপচাপ। 'শুনে লিন, ছে আমার নাম গোষ্ঠ ঘোষ। আমি শালা যাত্রা করি। কসাইখানা খুলিনি। আপনি এত বড় একটা কাজ করছেন আর শালারা আপনাকে ভাগাড়ে ফেলতে চাইছে! আমি পয়সা-উয়সা লিতে পারবো নি! ভালো কাজের আমি শালা দারোয়ান আছি। আমাকে পয়লা দিন ফিট করে লিন। আনন্দময়ের 'পরিচয়' পালা। টপে আছে গোপলা…।'

বললাম, 'তা হ'লে নট্ট কোম্পানীর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। ওঁরা মত দিলেই হতে পারে।'

'কথা বলুন।' গোষ্ঠবিহারী ঘোষ একটা সেন্টের শিশি বের করলেন পকেট থেকে। পাশের স্টীলের আলমারীতে ঠুকে তার মাথাটা ভাঙলেন এবং গোটা সেন্টটা ছিটিয়ে দিলেন নিজের পোশাকে। 'নট্ট যদি পয়সা না নেয় তো ছে আমি লাস্টে ফিট হয়ে যাবো। ছেড়ে দেবো পজিশন। আপনি কথা বলুন।'

'না,' আশুতোষ সাহা বি এ বি এল জানালেন, তাঁদের মালিক নিথরচায় যাত্রা করতে সম্মত নয়। 'গণেশ অপেরা গান করুক প্রথম দিন, আমাদের দিন দ্বিতীয় তারিখ।' এখানে এ-কথাটা বলে রাখা দরকার, মাখনলাল নট্টর সঙ্গে তখনও আমার আলাপ হয়নি।

আমি হারিনি। বিধাতা আমাকে হারতে দেননি। যদিও পরীক্ষা করেছেন বহুভাবে। কাগজে বিজ্ঞাপন, শহর জুড়ে লাগানো পোস্টার, বাজারে, থিয়েটার-হলের সামনে হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হয়েছিলো। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে রোজ টিকিট-কাউন্টার খোলা সত্ত্বেও দশ তারিখ পর্যন্ত একদমই বিক্রি নেই। কলেজ স্কোয়ারে মণ্ডল এ্যাণ্ড সন্স এবং থিয়েটার-পাড়ার উত্তমাশা রেস্তোরাঁয়ও টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা ছিলো। দক্ষিণ কলকাতায় শেলীদির মলয় গীত বীথিতেও ছিলো বিক্রির জন্য টিকিট। খোঁজ নিয়ে জানলাম, একটি টিকিটও বিক্রি হয়নি। এ-অবস্থায় মাথার ঠিক রাখাই কঠিন। ততক্ষণে সবাই হাসাহাসি করতে শুরু করেছে। দীপকের মুখ কিন্তু কাঁদোকাঁদো। হরিপ্রসাদ ভেঙে পড়েছে। কী করি! ঠিক করলাম ঘোষণামতো চৌদ্দ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন হবে ঠিকই। কিন্তু উৎসব শুরু হবে একুশ তারিখ থেকে। চৌদ্দ তারিখে সারাদিনে শ-খানেক টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিলো। পরদিন সবগুলো সংবাদপত্রে উদ্বোধনের খবর বেরোলো। সকাল ৭টায় বরানগর থেকে টিকিট নিয়ে শোভাবাজার রাজবাড়ি পৌঁছে দেখি, টিকিট কাউন্টারের সামনে শ-দেড়েক লোকের লাইন। আমার দু'চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে গেলো।

একুশ তারিখে উৎসবের প্রথম দিন ছিলো নিউ গণেশ অপেরার 'পরিচয়' পালা। হাউস-ফুল। সেই থেকে মেতে উঠলো গোটা বাঙলা। সকাল থেকে যে-লাইন পড়ে তা আর শেষ হতে চায় না। ঘনঘন ট্রাঙ্ককল আসে। আসানসোল ধানবাদ, উত্তরবঙ্গ, আসাম থেকে। হঠাৎ এলো দিললির ফোন।

শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় সদলবলে আসছেন দিল্লি থেকে। সাগরপার থেকে এলো ছটি পরিদর্শক দল। বাসে-ট্রামে রাস্তায় সর্বত্র আলোচনা। কাগজের বিজ্ঞাপনে নিত্য নতুন ক্যাপশন ছাপা হচ্ছে : 'আরও যাত্রা দেখুন', 'যাত্রাই আমাদের একমাত্র দেশীয় অভিনয়-কলা', 'যাত্রা আমাদের বুকের রক্ত' ইত্যাদি ইত্যাদি।

পয়লা সেপ্টেম্বরের পর থেকে পড়লো টাকার টান। যাত্রাদলেরা বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর সদস্য হওয়া বাদ পঁচিশ টাকা করে দিয়েছিলো। প্রীতিদা বিজ্ঞাপন বাবদ আর টাকা দিতে পারছিলেন না। সুতরাং শেলীদি আর আমি বেরোলোম ডোনেশন তোলার জন্য। মনে আছে, প্রথমে গিয়েছিলাম মেট্রোপলিটান বিল্ডিংসে। শ্রীদেবেন ভট্টাচার্যকে সব বলার পর তিনি পাঁচখানা সিজন কার্ড নিলেন। দান করলেন পাঁচ শো টাকা। সাধনা ঔষধালয়ের ডাঃ নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ইন্-ডোর পাবলিসিটি বাবদ দিয়েছিলেন তিন শো পঞ্চাশ টাকা। ব্যক্তিগতভাবে কিছু বিত্তশালী ব্যক্তিদের কাছে সিজন-কার্ড পুশ করে যা পেয়েছিলাম, তাতেও কুলোয় না। একদিন অনুপায় হয়ে তরুণ অপেরা এবং মণ্ডল এ্যাণ্ড সন্স এর মালিক সুধীর মণ্ডলের কাছে ধার করতে হলো চারশো টাকা। গৌরদা অর্থাৎ গৌরচন্দ্র দাস ধার দিয়েছিলেন পাঁচশো টাকা। পনেরো সেপ্টেম্বর থেকে আমার অবস্থা স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছল। এর মধ্যে অমর শেঠ পেয়ে গেছে অর্ধেক টাকা। এন সি পাল এবং তপন ইলেকট্রিকও।

এই সময়ে বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর দ্বিতীয় বার্ষিক নির্বাচন হয়। কার্যকরী সমিতিতে সকলেই থাকেন। কেবল নতুন নাম সংযোজিত হয়, সংগঠন সম্পাদক : রমেন ঘোষ। রমেনের একটি নাটকের ক্লাব ছিলো : দিশারী। ও খবর টবর ছাপাতে আসতো। এই সূত্রে পরিচয়। এবং বলা যায় আত্মীয়তাও। প্রীতি রায় ওর পাড়াতেই থাকতেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন বললেন, রমেনকে যেন আমি গাইড করি। কারণ ওর লেখাপড়ার দৌড় সামান্য। ঝোঁক ফিল্ম লাইনের দিকে। এবং ও নাকি কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় যে, তরুণ ও নবাগত অভিনেতা অভিনেত্রীদের চলচ্চিত্রে সুযোগ দিয়ে থাকে। শুনে চমকে উঠেছিলাম। তারপর থেকে প্রায় বিকেলেই রমেন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। ও খুব বিশ্বস্ত ছিলো তো বটেই এবং দায়িত্ব-জ্ঞানও ছিলো টনটনে। রমেন আমার বাসাতেও আসতো। নিজে হাতে চা করে খেতো,

আমার স্ত্রীর অসুখের সময় ও রান্নাবান্না করেও খাইয়েছে আমাদের। বলতে গেলে অনুগত কনিষ্ঠের মতোই ভাবতাম ওকে। যাতে খারাপ সঙ্গে মিশতে না পারে তার জন্য যতটা সম্ভব কাছেকাছে রেখেছিলাম এবং সংগঠন সম্পাদক পদে বসিয়েছিলাম। নিখিলবঙ্গ যাত্রা উৎসবে ওর কাজ ছিলো প্রত্যহ কাগজগুলোতে বিজ্ঞাপন পৌঁছে দেওয়া এবং ভলান্টিয়ারদের ব্যাজ দেওয়া ও রাখা। ময়নাগুড়ির মানু রায় চৌধুরী তখন থাকতো হাওড়াতে। ওখানকার একটি গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করতো ও। মানু ছিলো যাত্রা উৎসবের ভলান্টিয়ারদের প্রধান। দৈনিক দেড় টাকা মূল্যের টিফিন দেওয়া হতো ভলান্টিয়ারদের। এবং পথ ও হাত-খরচা আড়াই টাকা করে প্রত্যহ। ডবল শো হ'লে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো। হোল-নাইট যাত্রাতেও তাই।

ভিড় উপচে পড়লো নট্ট কম্পানীর 'লোহার জাল' পালার দিন। বেলা সাড়ে চারটায় রাজবাড়ির কাউণ্টারের সব টিকিট শেষ। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলাচল বন্ধ। লোকে লোকারণ্য। ভেতরে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। ভেতরে জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাজার খানেক টিকিট কেনা দর্শক। সর্বেশ্বরকে শুধোতে এলাম, এতো লোক টিকিট পাচ্ছে কোথায়? ও বললে', অন্যান্য সেণ্টার থেকে এনেছে। উত্তমাশার লোক বললো, তাঁর ওখানে আর টিকিট নেই। হঠাৎ কয়েক শো লোক টিকিট কাউণ্টারে আক্রমণ করলো। ভেঙে ফেললো টিকিট-উইনডো। আমি ক্যাশ-বাক্সটা নিয়ে পেছনের দিকের জানলা গলিয়ে ফেলে দিলাম। তাকিয়ে দেখি, শোভাবাজার রাজবাড়ির ওই বিশাল লোহার গেটটা মানুষের চাপে বিকট শব্দে ভেঙে পড়লো। আমি ছুটলাম ভেতরে। গিয়ে দেখি গান আরম্ভ করতে পারছে না নট্ট কোম্পানী। শিল্পীরা আসরে গেলেই উঠছে ভয়াবহ চিৎকার। ক্ষিপ্ত হয়ে সূর্যবাবুকে আমি বললাম, "কেমন যাত্রাদল আপনার? গানে জমিয়ে দিতে পারছেন না?' বেরুতে যাবো, অমর এসে বললো, 'বাইরে একটাকার টিকিট কুড়ি থেকে চল্লিশে দর উঠছে। দূর দূর থেকে গাড়ি গাড়ি লোক এসেছে, আসছে—হাত পায়ে ধরছে শুধু দাঁড়িয়ে যাত্রা দেখার জন্য যে কোনো মূল্যে।

কিন্তু সারা মণ্ডপে এক ইঞ্চি ফাঁক নেই। আমি গ্যালারীর নীচ দিয়ে আমার ঘরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ রব উঠলো: মার মার শালাকে, শালা বেঁটে ওই পালাচ্ছে! দমাদ্দম কয়েক ঘা পড়লো আমার মাথায় বুকে পিঠে ও পেটে। দেখি আশুবাবু

পাঁজাকোলে তুলেছেন আমায়। ছুটছেন পেছন দিককার গেট দিয়ে। গ্রে স্ট্রীট সেণ্ট্রাল এভিনিউর মোড়ে মিত্র কাফেতে বসালেন আমাকে। বললেন, 'চুপচাপ বসে চা খান। বেরোবেন না। দেখলেই ক্ষেপে উঠবে দর্শকরা। আমি গান স্টার্ট করে দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবো।'

হ্যাঁ আমি কাঁদছিলাম। নীরব কান্না। কিন্তু ব্যথা বেদনার কান্না নয়। একমাত্র বিজয়ীরাই চিনতে পারবেন এই কান্নার স্বরূপ! হে ঈশ্বর, হে আমার ইষ্টদেবী—এ তোমারই আশীর্বাদ। তামাম দেশ যদি যাত্রা দেখার জন্ত প্রত্যহ আমাকে এমনি শাস্তি দেয়, সে শাস্তিই আমার বিজয় পতাকা এবং তা গ্রহণ করতে আমার কোনো কষ্ট নেই।

ঘণ্টাখানেক পরে আশুবাবু এলেন। বললেন, 'বরফ হয়ে গেছে আসর—আসুন, দেখবেন নট্ট কোম্পানী কেমন ম্যাজিক দেখাতে পারে।'

ফিরে এসে দেখলাম হুবহু তাই। বাঁধভাঙা জনরাশি মন্ত্রমুগ্ধের মতন। একটা টুঁ শব্দ নেই দর্শকদের মধ্যে। নট্ট কোম্পানীর 'লোহার জালে'র মধ্যে অনায়াসে আত্মসমর্পন করে বসে আছে সবাই।

একুশ তারিখ থেকে আমার আর বাড়ি ফেরা হয় না। স্নান করি এখানেই। বরানগর থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার আসে। ভুলেন্দ্র ভৌমিক প্রায়শ সঙ্গে সঙ্গে থাকে আমার। রোজ অফিস করি। বিকেল পাঁচটা বাজলে আবার আমি শোভাবাজার রাজবাড়িতে। রাত্রে কোনোদিন আমার সঙ্গে থাকে রমেন, নয়তো সর্বেশ্বর নইলে জগন্নাথ অথবা ভুলেন্দ্র। সে এক আলাদা উন্মাদনা।

দিন যতো এগোয় ভিড় জমজমাট হয় ততই। সত্যম্বর অপেরার 'সোনাই দীঘি' পালার অভিনয়-সন্ধ্যাতেও ছিলো হাউস-ফুল। কিন্তু নট্ট কোম্পানী সেলের অর্ধেক হিসেবে যে-অঙ্কের টাকা পেয়েছিলো সোনাই দীঘির অংশ তার চাইতে কিছু কম হয়। শৈলেন প্রচণ্ড রেগে যান এ-কারণে। এবং তাঁর ধারণা হয়েছিলো, এখানে কোনো ষড়যন্ত্র থাকা সম্ভব। আমি যতো বোঝাই যে, লোহার জাল পালার দিন টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন প্রচুর লোক। কিন্তু কার কথা কে শোনে। ও চ্যালেঞ্জ করে বসলো। আমি অবশ্য গোড়া থেকেই নিয়ম করে দিয়েছিলাম, টিকিটের যে-অংশ গেটে ছিঁড়ে নেওয়া হবে তা যেন সযত্নে রাখা হয়। রাত্রে হিসাব মেলাবার সময় কাউণ্টারে কাটা অংশ মিলিয়ে দেখে নিতে হবে। সর্বেশ্বর, রাজু, অমর খুবই উত্তেজিত হয়েছিলো শৈলেনের অভিযোগ শুনে। অবশ্য কাউণ্টার

পার্ট গুণতিতে ও মিলিয়ে নেবার পর শৈলেন শান্ত হন। ২৪ সেপ্টেম্বর প্রমোদকর মকুবের অনুমতি নিয়ে আমি ফিরলাম। মণ্ডপে সেদিন জয়োল্লাস। আমরা জয়ী হয়েছি, জয় হয়েছে আমাদের। সবচেয়ে উল্লাস দীপকের।

নিউ রয়েল বীণাপানির 'ভাগ্যের বলি' পালাভিনয়ের দিনেও মণ্ডপ পরিপূর্ণ। শান্তিগোপাল নায়ক। সুন্দর সুঠাম দেখতে, মানিয়েছিলেও চমৎকার। অভিনয় দেখে আমি অবাক। নারায়ণ ভট্টাচার্যের কাছে ওর বিষয়ে সব শুনতে পারলাম। এত খোঁজ-খবর করছি দেখে নারাণ অবাক। বললো, 'এতো কৌতূহল কেন আপনার?' জবাবে আমি বলেছিলাম, 'ছেলেটি খুব বড়ো অভিনেতা হবে একদিন।' নারাণ অর্থাৎ নারায়ণ ভট্টাচার্য তখনও অভিনয় করছে। সারারাত্রিব্যাপী অভিনয় আসরে একদিন 'রঘু ডাকাত' পালা হলো। রূপকুমার নামলো রঘুর চরিত্রে। কে রূপকুমার? ওটা ছিলো নারায়ণ ভট্টাচার্যের ছদ্মনাম। দীর্ঘকায়, বলিষ্ট, গায়ের রঙ দুধে-আলতায়—ওই সময়ে নারায়ণের মতন সুপুরুষ অভিনেতা আর কে ছিলেন? অরুণ দাশগুপ্তের কথা এ-প্রসঙ্গে মনেপড়া স্বাভাবিক! কিন্তু অরুণ দাশগুপ্ত তখন একটি অখ্যাত দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবশ্য দলটির পালাভিনয়ে যশ ছিলো যথেষ্টই। সারারাত্রিরই অভিনয়-আসরে সন্তোষকুমার ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বোস, জ্যোতির্ময় বসুরায় এবং কলকাতার সংস্কৃতি-জগতের বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবের শেষ অভিনয়ের আগে একটি সংবর্ধনার অনুষ্ঠান করি। পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে-কে এই সংবর্ধনার আসরে পালা-সম্রাট উপাধি দেওয়া হয়। সূর্যকুমার দত্তকে শ্রেষ্ঠ পালা-নির্দেশক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বড় ফণিবাবুকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান দেওয়া হয়! মহেন্দ্র দত্ত পান শ্রেষ্ঠ সুরকারের সম্মান এবং প্রধান দল মালিক হিসাবে সংবধনা জানানো হয় গৌর দাসকে।



নীরু নাগের নাগ কোম্পানী ও গণবাণী দলের গদীতে ছিয়াশি সনের শ্রাবণ

মাসের শেষ দিকে আলোচনা হচ্ছিলো গোষ্ঠবিহারী ঘোষ সম্পর্কে। আসর জমজমাট। অনাদি চক্রবর্তী, বিজয় মিত্র, বীণা ঘোষ, অচিন্ত্য বেরা, তপোবন নাট্য কোম্পানীর দুলাল চাটুজ্জে এবং আরও অনেকে ছিলেন। অনাদি তার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলো। সে-মরশুমে ও জয়েন করেছে গণেশ অপেরায়। খুব টাকার দরকার সুতরাং সন্ধ্যার পর নিউ গণেশ অপেরার গদীতে গিয়ে উপস্থিত। গোষ্ঠদা তখন সেন্টের শিশি ভেঙে গায়ে ছিটিয়েছেন সবে। হাতের ছড়িটা তুলে নেবেন, ঠিক এই সময়ে অনাদির প্রবেশ। গোষ্ঠদা খুব একটা বিরক্ত হলেন না। বললেন, 'অনাদিবাবু, আপনি ওখানে থেকে এলেন আর আমার ওখানে যাওয়ার টাইম হয়ে গেলো। অনাদি আকাশ থেকে পড়লো। কিছুই বুঝতে পারছে না! বললো, 'কর্তা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' গোষ্ঠদা বললেন, 'টাকা পয়সা চাই তো?' অনাদি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। গোষ্ঠদা বললেন, 'আসা হচ্ছে কোথা থেকে?' অনাদি বললো, 'বাড়ি থেকে?' গোষ্ঠ ঘোষ বললেন, 'কার বাড়ি?' অনাদি তখন অথৈ জলে। কী জবাব দেবে এর? মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললো, 'কেন? আমার বাড়ি থেকে?' গোষ্ঠদা একটা ছোট্ট ধমক দিলেন। বললেন, 'চিৎপুরে কোন শালা সন্ধেবেলায় নিজের বাড়ি থেকে আসে?' অনাদি হাসে। গোষ্ঠবিহারী ঘোষ ডান চোখটা ছোট করে অদ্ভুত কায়দায় ইঙ্গিত করেন 'আমার এখন ছেই পরের বাড়ি যাওয়ার সময় হয়ে গেলো।'

বীণাদি, বীণা ঘোষকে চিৎপুরের লোকেরা আখ্যা দিয়েছে: বাঘিনী। তাঁকে ভয় করে না এমন মালিক বলতে গেলে যাত্রাপাড়ায় নেই। সেকালের পরিচালকেরা তো মনে করতো বীণা ঘোষ স্বয়ং চণ্ডী। রঙ্গমঞ্চ থেকে আসেন যাত্রায়। তখন তাঁর টগবগে যশ। নিউ রয়েলের নারাণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সে-মরশুমে চুক্তি হয়েছে বীণাদির। কিন্তু মহলা শেষ হবার পর হঠাৎ মত-বিরোধ। সেই সময়ে দল ছেড়ে বীণা ঘোষ এসে জয়েন করলেন নিউ গণেশ অপেরায়। দিন কয়েক পরেই এ-দলের গান নতুন বাজারে। নায়েকদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠদা নিজে। কারণ নতুন বাজারেই ছিলো গোষ্ঠদার দুধের কারবারের ডিপো।

আসর বসেছে পাইকারী পট্টিতে। অনেকটা ফাঁকা জায়গা—কম করে নব্বই বাই নব্বই ফুট তো বটেই। গান যখন নিউ গণেশ অপেরার সুতরাং মণ্ডপ হয়েছে জমকালো। আসরের মাথায় ঝুলছে ঝাড় লণ্ঠন। গান শুরু রাত্রি দশটায়। ৮

গোপাল চ্যাটারজি সকালে আমার বরানগরের বাসায় গিয়েছিলেন গোষ্ঠদাকে নিয়ে। সম্ভবত অভয় হালদার অফিস থেকে নতুন বাজারে নিয়ে এলো আমাকে। এসে দেখি কনসার্ট বাজছে। চারদিকে দর্শকের ভিড়। সাজঘরে গেটে দাঁড়িয়েছিলেন সুখেন্দুবাবু। আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন আড়ালে, বললেন, সাজঘরে এখনই একটা তুলকালাম কাণ্ড নাকি হবার কথা। প্রথমে বুঝতে পারিনি। সুখেন্দুবাবুর কথায় জানলাম : খবর এসেছে, নারাণ ভট্চাজ্জি নাকি সদলে রওয়ানা হয়েছে গদী থেকে। আসছে এখানেই। বীণা ঘোষ উইদাউট নোটিশে দল ছেড়ে আসার বদলা নেবে।

'বীণাদি শুনেছেন?' আমি প্রশ্ন করি।

সুখেন্দুবাবু মাথা নেড়ে সায় জানালেন। বললেন 'তিনিও ফুল রেডি। একটা পুরো তালিম নিয়ে এখন থেকেই হুঙ্কার ছাড়ছেন।'

'গোষ্ঠদা কোথায়?'

'বাবু ওই যে ', আসরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয় সুখেন্দুবিকাশ রায়। 'বাবুও তৈরি হয়ে সামনের সারিতে বসে আছেন সপারিষদ। বলেছেন, আপনি এলেই যেন তাঁর পাশে আপনাকে বসিয়ে দেওয়া হয়।'

সাজঘরে ঢুকবো কি ঢুকবো না ভাবতে ভাবতে সিগ্রেট ধরাতে গিয়ে চমকে উঠি। হ্যা, হুঙ্কারই বটে। চিৎপুরের বাঘিনী বীণা ঘোষ গন্ধ পেয়ে গেছে মানুষ নারাণের। শিকার নাগালের মধ্যে আসার আগেই তাই রণহুঙ্কার। সুখেন্দুবাবুকে অগত্যা সুধোই, বীণা ঘোষ মেক-আপ সেরেছেন কী? সুখেন্দুবাবু জানান : মেক-আপ পোশাক-পরা—দুই-ই কমপ্লিট। কথা বলতে বলতেই আচমকা আর একটা ঘটনা ঘটে। হঠাৎ সুখেন্দুবাবু এক ছুটে অন্তর্ধান হন। তবে কি বাঘিনী বেরিয়ে এলো খাঁচা থেকে! সাজঘরের গেটের দিকে তাকাই। না। তবে? এবার নজরে পড়ে। দেখি, সদলবলে এগিয়ে আসছে নারাণ। তার ডান বগলে অনেকটা ছোট আকারের গদার মতন কিছু চাপা। ডান হাতে চকচক করছে কিছু একটা। সোর্ড? ড্যাগার? পিস্তল? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নারাণের সারা মুখে আক্রোশের আগুন কিন্তু দু'চোখে ছিটেফোঁটা রক্তাভা নেই। এ-এক অদ্ভুত এক্সপ্রেশন। আমি বিপদ গণছি। চোখের সামনেই দেখবো এক অভাবিত মহারণ?

নারাণ আসছে। দূরত্ব কমে আসছে ক্রমশ। সাজঘরের সামনে যে ভিড় ছিলো

নিমেষে তা উধাও। বিপদের গন্ধ পাওয়া হরিণের মতন সব পালিয়েছে। ওদিকে আসরের কনসার্ট ততক্ষণে উঠে এসেচে উঁচু পর্দায়। মনে হচ্ছিলো, এ-যেন লড়াই শুরুর আগেকার রণদামামা। অনেক মানুষের কলরোল মিলিয়ে অনায়াসে ভাবা যেতে পারে আমি পলাশীর প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। এ-পাশে সিরাজের শিবির। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনারা ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে এ-দিকেই। আশঙ্কা ছিলো কিছু একটা ঘটবেই ঘটবে। ঘটলোও। সাজঘরের দরজায় বোমার মতো ফেটে পড়লো এক হুঙ্কার। বীণা ঘোষ। রয়্যাল ড্রেসে সজ্জিত, একমাথা এলোমেলো রুক্ষ চুলের উইগ-পরা। দু'হাতে তুলে ধরেছেন বিশাল এক ত্রিশূল। এবং সে-ত্রিশূল শত্রুর দিকে তাক-করা। সারা শরীর দুলছে, এবার বুঝি শুরু হবে তাথৈ তাণ্ডব। বীণাদি একটা ঝম্প দিলেন এবং তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো ভয়াবহ এক বজ্র, 'আয়, আয়রে পামর…'

নারাণ হঠাৎ সদলবলে থমকে দাঁড়ালো অদূরে। ওর নড়বড়ে মাথাটা স্থির হতে দেখলাম। চকচকে বস্তুধরা ডান হাত দিয়ে চোখ ঘষে নিলো। সম্ভবত এমন একটা দৃশ্যের কথা কদাচ সে কল্পনা করতেও পারেনি। সুতরাং এটা চোখের ভুল না সত্য—এটা পরখ করে নিচ্ছিলো। কিন্তু নারাণের শাগরেদরা তখন নন্দীভৃঙ্গির মতন রণনৃত্য শুরু করে দিয়েছে।

ওদিকে ত্রিশূল হাতে ধেইধেই নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছেন বীণাদি। নারাণ কী যেন বলতে বলতে পিছু হটছে।

অগত্যা এগিয়ে আসতে হলো আমাকেই। সোজা এসে হাত চেপে ধরলাম নারাণের। নিয়ে গেলাম আসরের দিকে। লক্ষ্মী, বাধ্য, অনুগত ছেলের মতো নারাণ চললো আমার সঙ্গে। একবারের জন্যেও বেঁকে দাঁড়ালো না। আমি ওকে গোষ্ঠদার পাশে বসিয়ে নিয়ে হাতের চকচকে বস্তুটা কেড়ে নিয়ে দেখি, ওমা এযে একটা ভুজালির শূন্য খাপ!

গোষ্ঠদা অবশ্য স্বাগত জানালেন নারাণকে। আমি পাশেই বসলাম! সে এক মজার দৃশ্য। দুই মালিকই বিনয়ের অবতার। কথায় বৈষ্ণবী চাল। খানিক পরে, নারাণ বললো, 'তা হ'লে বীণা ঘোষকে আপনি নিলেন?'

'নিলুম। নিজে জয়েন্ট করলো যে, তাকে ফেলে দিতে পারে গোষ্ঠ ঘোষ?'

'কিন্তু আপনি কী নিলেন জানেন কী?'

'মেয়ে মানুষ। ফিমেল আর্টিশ…'

'উহুঁ।' নারাণ বাধা দিলো, 'পিপে। পিপে নিলেন।'
'পিপে!' গোষ্ঠ ঘোষ গম্ভীর হলেন, একটু ভাবলেনও। বললেন, 'গোষ্ঠ ঘোষ পিপে কেনে না নারাণবাবু। ছে কিনি তো ডিস্টিলাইজেশন।'
'দেখবেন, কী কাণ্ড করে?'
'ছে বমি করবে বলছেন তো? করুক। আমি চাংজন চাকর রেখে দেবো বমি কাচবার জন্তে। দেখি, ছে কত বমি করতে পারে বীণা ঘোষ।'



বীণাদির সেই চামুণ্ডা মূর্তির প্রসঙ্গ নিয়ে আসর গুলজার। বীণাদি হাসছিলেন। বললেন, 'প্রবোধদা জানেন, আমার হাতের ত্রিশূলটা ছিলো যাত্রাদলের নকল ত্রিশূল। বাকিটুকু আমার এ্যাকটিং।' সবাই হেসে উঠলো একসঙ্গে। হাসি থামলে নীরু বললো, 'সেই রণচণ্ডী আপনি ভয় করছেন ওইটুকু মেয়েকে?'
সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিলেন বীণা ঘোষ। বললেন, 'ভয় নয়, ভয় নয়—অশান্তি আর অস্বস্তি। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।'
গণবাণীতে সে বছর উৎপল দত্তর দু'খানি পালা। 'সাদা পোশাক' নতুন লেখা। 'সন্ন্যাসীর তরবারি' বছর কয়েক আগে লোকনাট্য উপহার দিয়ে প্রচুর যশ পেয়েছিলো। সে সময় শেখর গাঙ্গুলী ছিলো লোকনাট্যের হিরো। বর্ণালী হিরোইন। অমরপও ওই দলে। এবং অনাদি চক্রবর্তী, নিরঞ্জন ঘোষ, অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। নীরু সেই পালাটিই আবার প্রযোজনা করার আয়োজন করেছে। এবং শেখর গাঙ্গুলীর সঙ্গেও একটা যোগাযোগ করে ফেলেছে। শেখর নাকি কথা দিয়েছে, সে নট্ট কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে গণবাণীতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বেশ কিছু টাকাও অগ্রিম নিয়েছে। এ-বিষয়ে আমার পরামর্শ চেয়েছিলো নীরু। আমি তাকে হিসেব করে বুঝিয়েও দিয়েছিলাম, শেখরকে নিয়ে এমন কিছু লাভ হচ্ছে না তার। কারণ সত্তর পারসেণ্ট বায়না তখন হয়ে গেছে—শেখর গাঙ্গুলী

যোগ দিলেই দলের রেট কিছুতেই বাড়ানো যাবে না। কিন্তু নীরু পুব-বাঙলার ছেলে। তার জেদ বেশি। আমাকে ও বললো, শেখর গাঙ্গুলী আর শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী নাকি তিন বছর থাকার চুক্তিপত্রে সই করে টাকা নিয়েছে। সুতরাং পরবর্তী দু'বছরের দিকে তাকিয়ে সে শেখরদের নিতে সংকল্পবদ্ধ। কাজটা ন্যায়সঙ্গত হবে না—এটা আমি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম নীরুকে। এমনকি বলতে বাধ্য হোলাম: মাখন কিছুতেই শেখরকে ছাড়তে পারে না। তার সঙ্গে পাঁচ বছরের কনট্রাক্ট আছে শেখরের। এ্যাডভান্সও নিয়েছে প্রচুর টাকা। এবং মাখন যদি আইনের শরণ নেয়, তা হ'লে কিছুতেই শেখর ছাড় পাবে না! পেতে পারে না। কিন্তু কে যে বুদ্ধি দিয়েছিলো নীরুকে জানি না। তাকে বোঝানো হয়েছিলো ওয়ানসাইডেড কনট্রাক্ট-এর নাকি কোনো মূল্য নেই। তবু অনেকটা নরম হয়েছিলো নীরু। সে আমাকে জানিয়েছিলো, মাখন যদি শেখরকে ছেড়ে দিতে বলে তবেই সে ছেড়ে দেবে, নইলে নয়। কিন্তু যেখানে ফরিয়াদী নট্ট কোম্পানী, আসামী শেখর গাঙ্গুলী—সেক্ষেত্রে মাখনলাল নট্ট কেন তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় বসবে?

শেখর গাঙ্গুলী কেন নট্ট কোম্পানী ছাড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। এবং এই নিয়ে আত্মাভিমানী মাখন আমার ওপর অনেক তম্বি করেছে। রেগে গেলে তার জ্ঞান থাকে না। ওই অবস্থায় সে বলেছিলো: আমাকে সে দেখে নেবে। কারণ আমি এর একটা সফল নিষ্পত্তি নাকি ইচ্ছে করেই করছি না। এ রকম তম্বি মাখন প্রায়ই করে আমার ওপর। ওটা আমাকে স্পর্শই করেনি একদম। পরে শুনলাম, সে বলে বেড়াচ্ছে, আমি নাকি তার দলের ক্ষতি করেছি। তাতেও দুঃখ হতে পারতো আমার। কিন্তু মাখনকে তো আমি প্রায় গোড়া থেকেই চিনি। সুতরাং অভিমানের প্রশ্ন আসে না। 'দেবী সুলতানা' এবং 'নাম ভূমিকায়' পালার উদ্বোধনী অভিনয়েও নিমন্ত্রিত হইনি বলে আমার দুঃখ ছিলো না। কিন্তু যখন দেখলাম, দলের বিজ্ঞাপনের স্ট্যাণ্ডার্ডটাকে নরকে নামিয়ে নিয়ে এলো, তখন আমার চোখে জল এসেছিলো। আমি আমার নালিশ ঈশ্বরকেই জানালাম: হে ঈশ্বর, যাদের আমি শীর্ষে বসাতে চাই, হায়, তারা বারবার পিছলে নেমে আসে কেন! তিন মাস পরে সেই অস্বস্তির মেঘ কাটলো। ততদিন হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছে এই মর্মে যে, শেখর গাঙ্গুলী নট্ট কোম্পানীতেই চাকরি করতে বাধ্য।

নট্ট কোম্পানীর ক্ষতি আমি করিনি, এই সাফাই গাইবার জন্ত প্রসঙ্গটা বড় করছি না কিন্তু। আসলে বীণা ঘোষ যে-মেয়েটির জন্ত গণবাণী ছাড়তে চাইছিলেন সে-প্রসঙ্গে আসাই আমার উদ্দেশ্য। এবং কাহিনীর দিক থেকে সেটা কম গুরুত্বের নয়।

অরুণ দাশগুপ্ত এবং বীণা দাশগুপ্তা নট্ট কোম্পানী ছাড়লেন ঠিক মরশুমের মধ্যেই। বিকেলে খবর এলো: মাখনলাল নট্ট এবং অরুণ দাশগুপ্ত একই সঙ্গে ময়দানে ফুটবল খেলা দেখতে গেছে। সেদিন রাত সাড়ে এগারোটার সময় ফোন এলো মাখনের। বললো: অরুণ দাশগুপ্ত জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি নট্ট কোম্পানীতে আর অভিনয় করবেন না। আমি খুব একটা অবাক হইনি। কারণ মাসখানেক আগে এ-খবরটা আমাকে দিয়েছিলেন আমার সহকর্মী জয়ন্ত গাঙ্গুলী। তখন বিশ্বাসই করিনি। তারপর অবশ্য অরুণবাবু এবং বীণা বারকয়েক বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেছেন। শুনেছিলাম 'ময়লা কাগজ' পালার পার্টও নাকি ফেরৎ দিয়েছিলো বীণা। একদিন হঠাৎই নট্ট কোম্পানীর গদীতে গিয়ে উপস্থিত হোলাম। মহলা চলছিলো ঘরে। মনেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুর করছিলেন। রিহার্সাল ভাঙার পর অরুণবাবুর সঙ্গে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা কাটাকাটি চলছিলো। বীণা সেদিন মহলায় অনুপস্থিত। তর্কাতর্কি যখন চরমে তখন বাধ্য হয়েই নাক গলাতে হলো আমাকে। ব্যাপার কী? অরুণবাবু বললেন, 'ভালো কাজ বেরুচ্ছে না। বীণার পার্টে কিছু নেই।' আমি পাণ্ডুলিপি টেনে নিলাম। দেখি মাত্র সাতটি দৃশ্য আছে। আগত্যা অরুণবাবুকে আমি বললাম, 'এটা কী করছেন আপনি! গোটা পালাটা লিখতে দিন ভৈরবকে। তারপর আপনি বলবেন কার কাজ বেরুলো না।' অরুণবাবু অবশ্য ও ব্যাপারে আর কিছু বলেননি। কেবল জানালেন, বীণার পার্ট পছন্দ হয়নি। আমি বললাম, 'সেটা ওরা ভাইবোনে বুঝবে।' এখানে বলে রাখা ভালো, বীণা চক্রবর্তী যখন নট্ট কোম্পানীতে জয়েন করেছিলো, তখন থেকেই সে এ-বাড়ির মেয়ে বলে সম্পর্ক পাতিয়েছিলো। সুতরাং মাখনলাল নট্ট এবং বীণাকেই আমি ভাইবোন বলে উল্লেখ করলাম।

এ-পর্যন্তই জানা ছিলো আমার। তারপর হঠাৎ এই খবর। এবং সে এক বিশাল কাহিনী। আপাততঃ অরুণ ও বীণা দাশগুপ্তার নট্ট কোম্পানী ছাড়ার কথা উহ্য রেখে আমি সেই মেয়েটির প্রসঙ্গে আসছি—যার নাম শুনলে যাত্রাদলের মালিকরা আগেই জোড়-হাত করে।

নট্ট কোম্পানীর সামনে তখন সত্যিই বিপদ। কাকে বসানো যায় টপে? ভাবছি আর ভাবছি। অবশেষে একদিন সকাল এগারোটার সময় অফিসে বসে মাখন আর আমি স্থির করলাম, শেখর গাঙ্গুলীকেই দলে নেওয়া যেতে পারে। কারণ শেখরের সঙ্গে অগ্রগামী দলের দীনেশ নন্দীর সম্পর্কটা জটিল হয়ে এসেছে। ওদের ওপর বিরক্ত হয়েছে দীনেশ। সুতরাং এই সুযোগ। আমি অফিস থেকে ফোন করলাম দীনেশ নন্দীকে। 'কে দাদা?' বললাম, 'হ্যাঁ।', দীনেশ বললো, 'কিছু আজ্ঞা করবেন?' আমি বললাম, 'আজ্ঞা নয়, ভিক্ষা।' ওপাশে দীনেশ জিভে চুকচুক শব্দ করলো। বললো, 'তা হলে ফোন রেখে দিচ্ছি।' আমি ফোন রাখতে মানা করলাম। বললাম, 'একটা জিনিস চাইবো, দেবেন?' দীনেশ বললো 'দলটাই দিয়ে দেবো।' বললাম, 'দল নয়, অন্য কিছু।' দীনেশ একটু চুপ করে থাকলো, বললো, 'তা হ'লে নতুন কেনা গাড়িটা দিতে পারি অথবা নতুন বাড়ি—আপনি যা চান দেবো।' তখনই আমি শেখরের নাম বললাম। দীনেশ একবার শুধু বললো, দু'জন তো? বললাম, হ্যাঁ। 'কিন্তু আমার কী হবে?' দীনেশ জানালো। উত্তরে আমি বললাম, 'অরুণবাবু আর বীণাকে নেবেন?' দীনেশ উৎসাহের গলায় জানালো, সে এখনই আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় অরুণবাবু এবং বীণার ব্যাপারে। আমি বললাম, দুপুরে বাসায় আসতে।

এই ইতিহাস ইতিহাস গন্ধের ব্যাপারটা, বিশ্বাস করুন লিখতেও আনন্দ পাচ্ছি না। খুব নীরস হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে একটা ভয়ঙ্কর গল্প। সে গল্পটা আমি কিন্তু তখন ধরতেই পারিনি।

পরদিন সকালে রবি দাসকে হাওড়ায় পাঠিয়ে শেখরকে আনানো হলো আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে। মাখন বসেই ছিলো আমার সামনে। কথা পাড়তেই শেখর রাজি। কিন্তু শেখরের ওই আনন্দের উচ্ছ্বাসে নিমেষে কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিলো। আমতা আমতা করতে লাগলো সেই জবরদস্ত জওয়ান। আমি তাকিয়ে আছি। খানিক ইতস্তত করে শেখর বললো, 'কিন্তু শর্মিষ্ঠা?'

আমি আগেই আঁচ করেছিলাম, নামটা নিশ্চয় উঠবে। তৈরিও ছিলাম। মাখন আমাকে বলেছিলো যাবৎকাল সে জীবিত থাকবে, ততকাল নট্ট কোম্পানীর টপে স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে নেওয়া হবে না। সেই প্রতিজ্ঞার কথাই শেখরকে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে শেখরের সারা-মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেলো।

তার মানে শেখর গাঙ্গুলী নিজেও শর্মিষ্ঠাকে ভয় করে যমের মতো। অনেকক্ষণ ও চুপ করে থাকলো।

না, আমি যে গল্পটা বলবো বলেছি, সে গল্প কিন্তু এটা নয়। এটা তার আগে ঘটে যাওয়া নিছক একটি ঘটনামাত্র। শেখর গাঙ্গুলী সম্পর্কে যখন মাখনের সঙ্গে আলোচনা হয়, তখন আমি নিজেই বলেছিলাম শর্মিষ্ঠার কথা। মাখন একবার 'ওরে বাবা' বলে তার প্রতিজ্ঞার কথা আমাকে জানিয়েছিলো।

বেলা প্রায় একটা বাজে তখন। শেখর নীরবে কয়েকটা সিগ্রেট খেয়ে গেলো। মাখন মাথা নিচু করে গুম হয়ে বসে আছে। দু'রাউণ্ড চা খাওয়া হয়ে গেলো তারই মধ্যে। অগত্যা আমাকেই কথা বলতে হলো। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, শেখর গাঙ্গুলী অতঃপর এ-প্রস্তাব উপেক্ষা করবে। 'তা হ'লে—' আমি টেবিলের কাগজপত্র গোছাচ্ছিলাম, যেন উঠবো। শেখর অবশেষে কথা বললো। তার বক্তব্য এই যে, এই অসাধ্যসাধন একমাত্র আমিই নাকি করতে পারি। অর্থাৎ আমি যদি বলি, তবেই শেখর গাঙ্গুলীকে একা অভিনয় করার অনুমতি দেবে শর্মিষ্ঠা। এবং একমাত্র আমার অনুরোধেই শর্মিষ্ঠা অভিনয় ছেড়ে দিয়ে বাড়ি বসে থাকবে। মাখন এতক্ষণে মাথা তুললো। তার মুখে এক টুকরো স্বস্তির আলো দেখতে পেলাম আমি। ও আমার দিকে এমন করে তাকালো যে, আমি অসম্মতি জানাতে পারলাম না।

এবার শর্মিষ্ঠা প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে কিছু না বললে তার চরিত্রটা অস্পষ্ট থাকবে এবং এই মেয়েটি সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা থেকে যাবে। যে নীলমনি দে শর্মিষ্ঠাকে মেয়ের মতো ভালোবাসতো, সেই নীলমণিই এক সময়ে ক্ষুণ্ণ এবং ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মেয়েটির প্রতি। তখন যাত্রায় শর্মিষ্ঠার পরিচয় নমিতা চক্রবর্তী বলে। এটাই ওর আসল নাম। তারপর কেবলই চিৎপুরের বাতাসে শেখর নমিতাকে নিয়ে বাওর-ঘুর্নী। কোন দলে ওরা প্রবল ঝগড়াঝাটি করেছে, কোথায় মারামারি করেছে—সকাল থেকেই চিৎপুর মজে থাকে এই মৌতাতে।

যে-বছর শেখর-নমিতা সত্যম্বর অপেরায়, সে-বছর ভরা পৌষে সত্যম্বরের পালাভিনয় দেখতে গেলাম রাণীগঞ্জের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ওপার থেকেও মাইল তিনেক দূরে। সুবল অধিকারী কলকাতা থেকে গাড়ি করে আমাকে নিয়ে যান আসরে। সঙ্গে ছিলো রবি—রবি দাস। জমজমাট শীত পড়েছে। রাত দশটা নাগাদ স্পটে পৌঁছে দেখি ঘাসের ওপর বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার মতন শিশির।

দাঁতে দাঁতে ঠকাঠক শব্দ তুলছে। কোনো রকমে এক কাপ করে কফি খেয়ে আসরে গিয়ে বসলাম। শেখর নমিতা হিরো আর হিরোইন। যখনই ওরা আসরে একটি দৃশ্যে একত্র হয়, তখনই দেখি সুরপার্টির লোকেরা মুখ টিপে হাসে, ইঙ্গিত করে। পরে সব খবরই এসেছিলো আমার কাছে। অর্থাৎ ওদের বন্ধ আর সংঘর্ষটা এমনই প্রকাশ্য যে, দলের চাকরটা পর্যন্ত তার হদিস জেনে বসে আছে।

যাত্রা শেষ হলে আবার দু'কাপ কফি মিললো। সুবলবাবু দেখলাম সাজঘরেই লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমরা দু'জনে একটা বাক্সের ওপর বসে ঠক-ঠক কাঁপছি। বুঝতে পারছি না কেন গাড়ি পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে না।

আর্টিস্টরা সকলে একে একে বাসাবাড়ির দিকে রওনা হলো। চাকর বাকরেরা উধাও। আমার চক্ষু চড়ক গাছ। হঠাৎ শুনতে পেলাম নাসিকা গর্জন। সুবলবাবুর নাক ডাকছে। রবি অত্যন্ত অসহায়ের মতন তাকালো আমার দিকে। ঠাণ্ডায় ওর চোখমুখ শুকিয়ে কাঠ। আমি ইশারা করতে রবি গিয়ে সুবলবাবুকে জাগাতে চাইলো। আহা রে, সারাদিনের ধকলের পর বেচারী একটু আয়েসে ঘুমোবে তাতেও বাদ সাধা!

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর 'উঁ' বলে একটা সায় দিয়ে লেপ মুড়ি দিলেন সুবল-বাবু। রবির অবস্থা তখন কাঁদো কাঁদো। ও প্রাণপণে ঠেলতে শুরু করলো সুবলবাবুকে, 'ও-সুবলদা, সুবলদা, আমাদের গাড়িটা কোথায়?'

খুব বিরক্ত হয়ে সুবলবাবু শেষ পর্যন্ত জানালেন, গাড়ি নেই। আমাদের ছেড়ে দিয়েই নাকি চলে গেছে।

রবি আর আমি আৎকে উঠলাম।

'কিন্তু আমরা যাবো কী করে? ও সুবলদা, আমরা ফিরবো কেমন করে?'

রবি লাগাতার ঠেলে যাচ্ছে সুবল অধিকারীকে। অবশেষে ঘুম-কাতর গলায় সুবল অধিকারী যা বললেন, তা হলো এই যে, প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে পাওয়া যাবে নদীর ঘাট। কাছেই। ওখানে খেয়া পার হয়ে ওপারে গেলেই রাণীগঞ্জ স্টেশন।

তারপর আর কথা চলে না। ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত পৌনে চারটা। খিদের জ্বালায় পেট জ্বলছে। বাইরের তাপাঙ্ক বোধ হয় নামতে নামতে পাতাল

ছোঁয় ছোঁয়। অগত্যা আমরা হাঁটা দিলাম। আমার শালটায় দু'জনের মুখ মাথা ঢেকে হাঁটছি তো হাঁটছিই। পথ আর ফুরোয় না। পায়ের জুতো ততক্ষণে আমসত্ত্ব হয়ে গেছে। ভেজা জুতো থেকে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে। চারদিকে কোথাও জন মনিষ্যির চিহ্ন নেই।

ভোরের আলোয় পুব আকাশ ভরে গেলে আমরা পৌঁছলাম সেই নদীর ঘাটে—স্বলবাবু যাকে বলছিলেন খুব কাছেই। তা পাক্কা মাইল চারেক পথ। ঘাটে গিয়ে দেখি, খেয়া একদম পারে আসে না। কাঁদা ঘেঁটে হাঁটুর ওপর জল ভেঙে খেয়ায় উঠতে হয়। অগত্যা পরনের ধুতি মালাকোচা মারলাম। রবি প্যাণ্টুলুন গোটালো। জলে পা দিতেই মনে হলো ধারালো অস্ত্রে দেহ থেকে কে যেন পা দু'টো কেটে নিলো। দুরন্ত স্রোতধারা পেরিয়ে খেয়া আমাদের ওপারে পৌঁছে দিলো। সেই হাঁটু জলে আবার নামা।

সেই ভোর ভোর সকালে নদীপারের খেয়াঘাটের একটি চা দোকানে গিয়ে উঠলাম দু'জনে। চা দোকানী সবে আঁচ দিয়েছে কয়লার উনুনে। চা চাইলাম। দোকানী জানালেন, দুধ নেই। অর্থাৎ এসে পৌঁছয়নি। অগত্যা সেই ধোঁয়ায় কোনোরকমে গরম করা জলে শুধু কফি গুলিয়ে চিনি সহযোগে আমরা পান করলাম। তারপর পাক্কা দেড় মাইল হেঁটে এলাম রাণীগঞ্জ স্টেশনে। দু'জনের পকেট হাতড়ে যা পাওয়া গেলো তাতে টিকিটের দাম হয়ে গিয়েও টাকা দু'য়েক অবশিষ্ট থাকলো।

সারাটা পথ রবি আক্ষেপ করছিলো। তার অভিযোগের মধ্যে এটাও ছিলো যে, শেখর আর নমিতাও তো একবার খবর নিতে পারতো আমরা কীভাবে যাবো সে বিষয়ে।

লোকনাট্য হয়ে বোধ হয় শেখর নমিতা জয়েন করলো নবরঞ্জন অপেরায়। সেখানে মরশুম শেষ হবার আগেই দল বন্ধ করে দিলেন শম্ভুদা। অসময়ে কেন দল বন্ধ করলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে শম্ভুদা নিজের নাকমলা কানমলা খেয়ে বললেন, 'আব্বার!'

এমনি করেই দুর্নাম রটছিলো। প্রদীপ অপেরায় প্রদীপ দেবনাথও এক মরশুমে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থার মধ্যে নাকি পড়েছিলো ওদের নিয়ে। তার ঠিক পরের মরশুমে ঘটলো ঘটনা। অর্থাৎ শর্মিষ্ঠা আমার শরণাপন্ন হলো। প্রদীপের কাছে তখন প্রচুর দেনা শেখর গাঙ্গুলীর। নীলমনি দে-র একটা

দুর্বলতা আছেই শেখরের প্রতি। অতএব নগদে সব টাকা শোধ দিয়ে প্রদীপের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনা হলো শেখর গাঙ্গুলীকে। নীলমণি দে প্রথমেই বলে নিয়েছিলো, সে জুটি রাখবে না। শেখর আমাকে শর্মিষ্ঠার একটি চাকরী করে দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলো। এবং আমি মাধবী নাট্য কোম্পানী থেকে এ্যাডভান্স হিসেবে টাকাও পাইয়ে দিয়েছিলাম।

হঠাৎ একদিন সকাল দশটা নাগাদ শর্মিষ্ঠা হাজির হলো আনন্দবাজার পত্রিকায়, আমার ঘরে। ওর চোখমুখ শুকনো, মলিন। গাঢ় ছায়া নেমে এসেছে দু'-চোখের কোলে। সারা মুখে থমথমে ভাব আর উৎকণ্ঠা। লিখছিলাম। তাকিয়ে ইশারায় বসতে বললাম ওকে। ও বসলো। কলম রেখে তাকাতে দেখি শর্মিষ্ঠা কাঁদছে।

সত্যি বলছি, লোকজনের মুখে নানা কথা শুনে মনে হয়েছিলো, শেখর গাঙ্গুলীর বিরাট প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে এই মহিলাই অন্তরায়। সে-বছর অনেকগুলো দল মালিককেই আমি শর্মিষ্ঠাকে চাকরি দিতে অনুরোধ করেছিলাম। জবাবে সকলেই একই কথা বলেছে যে, শেখর একা থাকলে তাঁরা নিতে রাজি কিন্তু শর্মিষ্ঠা? ওরে বাপ্‌স্। যা রটে তা সত্য ধরে নিলে শর্মিষ্ঠাকেই দোষী মনে মনে হবে। কিন্তু আমার সামনে বসে কাঁদতে দেখে, কেন জানি মনে হলো এই রহস্যের গভীরতা অনেক, অনেক এবং অনেক।

'কাঁদিস না।' আমি বললাম।

চোখ মুছতে মুছতে ও তাকালো আমার দিকে। হেঁচকি তুলছে তখনও। বললো, 'আপনার ভাই কোথায়?'

'আমি ঠিক জানি না রে'……

'আজ সাতদিন কোনো খবর নেই। লোকনাট্যে গিয়েছিলাম—' শর্মিষ্ঠা আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। থেমে থেমে বললো, 'ওরাও বললো না কিছু।' আমি দেখলাম, কথাটা বলবার এই সবচেয়ে বড়ো সুযোগ। আমি সান্ত্বনা দিয়ে কান্না থামালাম। বললাম, 'তুই সত্যি ভালোবাসিস শেখরকে?'

'বাসি।'

'কেমন বাসিস?'

'ওর জন্ম মরতে পারি।'

'ছাড়তে?'

'না।'

তখন বোঝাবার পালা। আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম, শেখরের মধ্যে আছে ছাইচাপা আগুন। সে আগুনটা জ্বলে উঠতে পারছে না শর্মিষ্ঠার জন্যেই। অথচ প্রেম তো ত্যাগেই সার্থক। শেখর খুব, খুব বড়ো অভিনেতা হলে শর্মিষ্ঠার গর্বই হবে বেশি। সুতরাং……

কথা শেষ হলো না। ডুকরে কেঁদে উঠলো মেয়েটা। যা বললো, তাতে আমিই পাথর হয়ে গেলাম। কৈশোর থেকে প্রথম যৌবনে পা দেবার সময়, যে-পুরুষ তার ঘুমন্ত মনকে জাগ্রত করে ভালবাসার ফুল ফোটায়……

সেদিন আমি আমার সমস্ত ভুল শুধরে নিতে পারলাম। শর্মিষ্ঠার ওপর যতো মিথ্যে রাগ আর অভিমান এবং অভিযোগ জমেছিলো—দেখলাম তার সবটাই মিথ্যে। সবটাই প্রচার। ওই অকল্পিত, অভাবিত রহস্যের জাল পরে উন্মোচন করা যাবে। আপাতত আমি আবার ফিরে যাই সেই মুহূর্তে, যেখানে আমার টেবিলের সামনে বসে রয়েছে মাখনলাল নট্ট এবং শেখর গাঙ্গুলী। দু' জনের মুখেই হাসির ছটা ফুটে উঠেছে।

সেদিন সন্ধ্যাতেই শেখরকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর মাখন ওদের হাওড়ার বাসায় গেলাম। ঘড়িতে তখন সাতটা বেজে সাতাশ মিনিট। সুন্দর করে সাজানো ওদের শোবার ঘরে বসলাম। দেখি একটি শিশু খাটে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। শেখর-শর্মিষ্ঠার প্রথম সন্তান। মেয়ে। নমিতা প্রণাম করলো। আমি বললাম, 'খুব ভালো করে কফি করতো নমিতা। গলাটা শুকিয়ে আছে।'

নমিতা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলো। শেখর বললো, আমি যেন বলি আগামী মরশুমে শর্মিষ্ঠার চাকরী হবে।

কফি এলো, বিস্কুট এবং মিঠাইও। আমি ঠিক জনতাম না শেখর শর্মিষ্ঠাকে কী বলেছে। কফি খাওয়া শেষ করে শর্মিষ্ঠার দিকে তাকালাম। দেখলাম ও তৈরি হয়ে আছে কিছু শোনার জন্য। দৃষ্টিতেও ব্যগ্র প্রতীক্ষা। সব আমি খুলেই বললাম। এবং তার মধ্যে একথাও ছিলো যে, শর্মিষ্ঠাকে নট্ট কোম্পানীতে নেওয়া যাবে না। শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কেঁদে উঠলো শর্মিষ্ঠা। সে কান্না আর থামে না।

ঘড়ির কাঁটা সঠিক নিয়মে ঘুরছে। মাখন আমার পাশে বসে বিরক্ত হচ্ছে। শেখর বারবার ভেতর আর বারন্দা করছে। আমি ইশারায় ওদের ধৈর্য রাখতে

বলছি। তবু মাঝে মাঝেই শেখর বাক্যশর ছুঁড়ছে। অবশেষে আমি ধমকে উঠলাম।

শর্মিষ্ঠার কান্নার বেগ যখন বেশ কমে এলো তখন রাত বারোটা। আমি পাশে গিয়ে বসলাম। 'লক্ষ্মী বোন আমার', ওর মাথায় হাত রাখলাম, 'আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তুই শেখরকে একা অভিনয়ের অনুমতি দে। তুই মেয়েটাকে মানুষ কর ঘরে থেকে। সংসারের যাবতীয় খরচ তোর হাতে কোম্পানী দেবে। ধরে নিস এটাই তোর বেতন। সামনের বছর তোর চাকরীর ব্যবস্থা আমি করে দেবো।'

শর্মিষ্ঠার কান্না কিন্তু সত্যিকারের একজন শিল্পীর কান্না। সেই ফ্রক-পরা বয়স থেকে যে-মেয়েটা অভিনয়-শিল্পের সঙ্গে জড়িত, আসরে আসরে যার অতো যশ—তার বেকার হয়ে যাওয়া যে কতখানি বেদনার তা ক-জনইবা বোঝেন। তবু নট্ট কোম্পানীর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এই অবাঞ্ছিত ভূমিকায় আমাকে অভিনয় করতে হলো। দ্বিতীয়ত, যে-মেয়েটা কখনোই শেখরের অবর্তমান অনুভব করেনি তার কাছ থেকেও শেখরকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো।

চোখ মুছলো শর্মিষ্ঠা। বললো, 'পৃথিবীর কোনো শক্তি যা পারতো না কেবল আপনার কথায় দাদা আমি তাতে সম্মতি জানালাম।' শর্মিষ্ঠা এবার নীরবে কাঁদছিলো। আমার দু'চোখ ভরে জল এলো। একবার মনে হলো, একি আমি যথার্থ কাজ করলাম। পরক্ষণেই ভাবলাম, নট্ট কোম্পানী প্রকৃতপক্ষে আমাদের গৌরব। সেখানে ষাটটি পরিবারের অন্নের সংস্থান হয়। অতএব ..

পরের মরশুম আসতে না-আসতেই শুরু হলো গোলমাল। শেখর বারবার আমাকে বলছিলো, সে নট্ট কোম্পানীতে থাকবে না, যদি শর্মিষ্ঠাকে নট্টতে না নেওয়া হয়। কয়েকটা চিঠিও লেখে এ-বিষয়ে। দু'জনে মিলে অনেকবার আসেও আমার বাসায়। আমি ওদের ধৈর্য ধরতে বলেছিলাম। সে ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি ওদের পক্ষে। এদিকে খবর আসে, শেখরকে প্রায়ই দেখা যায় নীরুর গদীতে।

বীণাদিকে আমি বলেছিলাম, মিছেই আপনারা মেয়েটি সম্পর্কে এত খারাপ ধারণা করছেন। দোষ যদি ওর চার আনা হয় তো শেখরের বারো আনা। তা ছাড়া জননী হবার পর শর্মিষ্ঠা পরিণত মন পেয়েছে। অল্প বয়সের অনভিজ্ঞ মন নিয়ে এতোকাল সে যা করেছে তা সত্যি অনুশোচনার।

বিজয়দা হাসতে হাসতে বললেন, মায়ের মধ্যেই তো মেয়েদের মুক্তি।'

পনেরো

চিৎপুরের কথা ভারত সমান, বিজয় মিত্তির কহে শুন পুণ্যবান।

বিজয়দা বললেন, 'হয়রে বাবা, হয়। বিন বাপেতেও সন্তান হয়েছে, হতে পারে। এই চিৎপুরেই ধর না কেন, সেই আদি যুগে যে-অপ্সরা এসেছিলো। কী যেন নাম...' বিজয়দা হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে চাকুম চাকুম শব্দে গালভরতি পানে কয়েকবার চিবোন দিলেন, মুক্ত জানুদেশে বার কয়েক আয়েসের হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে; চিত্রলেখা। মানে অসুররাজ বাণ-এর কন্যা উষা ছিলো না? তারই প্রিয়তমা সহচরী। ইনি চৌষট্টি কলায় পূর্ণ সিদ্ধা ছিলেন। তার মানেটা কী? মানেটা হলো অভিনয়ে অতিশয় নিপুণা। তা ধরো গিয়ে উষা মেয়েটা তো স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখেই পপাত প্রেমতল। কিন্তু পাবে কী করে? অগত্যা ভরসা হলো গিয়ে ওই অপ্সরা চিত্রলেখা, মানে পরাণের সখী। কিন্তু চৌষট্টি কলায় ভুবন ভোলে বটে, আমাদের অনির মন ভোলে না। তাই নারদের কাছে তামসী বিদ্যে শিখে নিয়ে সখীর দুঃখ ঘোচাতে সে গেলো কৃষ্ণের পৌত্র অনির কাছে। তারপর নানা কাণ্ড-কারখানানা করে সে ব্যাটাকে ঠিক এনে পৌছে দিলো রাজ-অন্তঃপুরে, উষার কাছে। তারপর যা হবার তাই হলো। জানাজানি হয়ে গেলো সব। ঘটনা শুনে নারদ তো রেগেই টং। বললে: কী, তামসী বিদ্যার এই অপব্যবহার! ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ। সেই অভিশাপে অপ্সরা থেকে সটান মানবী। মেয়েটা পা ধরে কাঁদতে লাগলো: হেন দোষে গুরুদণ্ড দিও না গো প্রভু! কিন্তু নারদেরও তো করার মতো কিছু নেই। চিত্রলেখা বললো: প্রভু, আমার মুক্তির কী হবে? আমি তো আত্মসুখের তাড়নায় এমন কর্ম্ম করি নাই। প্রিয় সখীর...। ব্যাস, নারদের মন গলে একেবারে জল। বললেন: 'মর্ত্যে, গঙ্গাতীরবর্তী অরণ্যে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা হবে তোমার। সেই বলে দেবে মুক্তির পথ। তবে মর্ত্যে তুমি লোকপূজ্য হবে।'

জমজমাট আসরের অনেকেই তখন ক্লান্ত। অভিনেতা গোপাল চাটুজ্জে মশাই

বললেন, 'আসল কথায় এসো নাহে বিজে মিত্তির। তুমি বললে, বিন বাপেতে সন্তান হয়। তার কী হলো?'
বিজয় খুড়ি দুর্জয় মিত্তির সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'চোপ বা, চোপ বা। চিত্রলেখা নামটা বুঝি মনে লাগছে না? তা লাগবে কেন? তোদের মনজুড়ে এখন অন্য নাম, অন্য যৌবন। তা হ'লে শোন আমাদের ভগার জন্ম কথা।'
উনিশ শো আটষট্টি সালের বর্ষনমুখর এক সন্ধ্যায় জমজমাট ওই আসরে আমিও উপস্থিত ছিলাম। আগের দিন বিকেলেই কাণ্ডটা ঘটে গেছে। যমুনা নামের একটি মেয়ের কোল জুড়ে এসেছে নবজাতক। তাকে ঘিরে কত প্রশ্ন কিন্তু মেয়েটি শেষ পর্যন্তও স্বীকার করেনি এই সন্তানের পিতা বলে কেউ আছে। তাকে যতো শুধনো হয়, সে কাঁদতে কাঁদতে কেবল বলে, সে সতী। তার অঙ্গে কোনো পুরুষের স্পর্শ পর্যন্ত লাগেনি। কিন্তু যাত্রাদলের নাচিয়ে এই মেয়েটির কথায় চিৎপুর বিশ্বাস করেনি। কৌতূহলজনিত প্রশ্নের আঘাতে আঘাতে চৌদ্দ বছরের মেয়েটাকে তারা ক্ষতবিক্ষত করেছিলো। অবশেষে কুমারী জননী সন্তান কোলে নিয়ে চিরদিনের জন্য যাত্রাপাড়া পরিত্যাগের সংকল্প নিয়ে প্রস্থান করে। তাকে নিয়েই গুজবের স্বর্গ চিৎপুরের এই আসর। আমি কিন্তু অবিশ্বাস করিনি। পৃথিবীতে এমন কুমারী মায়ের অনেক ইতিহাস শুনেছি, পড়েছি। মেয়েটি অবশ্যই জানে না তার গর্ভসঞ্চারের কথা কিন্তু শয্যার গুণে এমনটি হয়েছে বলে জেনেছি।
প্রায় দশ বৎসর পর ১৯৭৮ সালে আবার সেই মেয়েটির মুখ মনে পড়লো আমার। মনে হলো কাল-দর্পনের ওপাশে বসে সেই মেয়েটিই সন্তান কোলে নিয়ে হাপুস নয়নে কেঁদে যাচ্ছে।

সাত সকালে খবর এলো, উপনায়িকা থানায় আটকা রয়েছে। সুতরাং এখনই না গেলে থানা থেকে বাস ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে না। এবং বাস না ছাড়লে পরের আসরে দল জয়েন করানো যাবে না।
'থানায় কেন!'
উত্তর আসে না সঙ্গে সঙ্গে। দেখি সংবাদদাতা শ্রীমান দল ম্যানেজার মুখ টিপে হাসছে। আমি ভেবেচিন্তে থই পাই না। উপনায়িকাসহ বাসটা যদি থানায় আটকে রাখা হয়, তার মানে কোনো গুরুতর অপরাধের ব্যাপার নিশ্চয়।

আর অপরাধের জন্যই যদি বাসসহ দলটা থানায় আটকে রাখা হয় তবে শ্রীমানের মুখে কেন ইঙ্গিতের হাসি!

'ড্রাইভার ধরা পড়েছে?'

'বাসেই আছে।'

তার মানে এ্যাকসিডেন্ট নয়। আমার সামনে আরও ধাঁধা। বিরক্ত হই, 'আমি তো বুঝতেই পারছি না কিছু। খুলে বলো তো কী হয়েছে?'

'বাচ্চা।' শ্রীমান মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললো।

বাচ্চা! রহস্যের অন্ধকারে হাতড়াতে শুরু করি, 'কার বাচ্চা!'

'চন্দনাদির। শেষ রাত্রে হয়েছে।'

'হয়েছে মানে, দলেই?'

উত্তরে শ্রীমান ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

শরীর খারাপ ছিলো। তার ওপর সাত-সকালে ঘুম ভাঙানোতেও অস্বস্তি অনুভব করছিলাম।

বললাম, 'আমি বরং থানায় ফোন করে দিচ্ছি—'

সহসায় পা জড়িয়ে ধরলো শ্রীমান, 'ছাড়বে না দাদা। কেসটা ভীষণ জটিল। আপনি না গেলে গান জয়েন্ট হবে না।'

এ-আবার অন্য রহস্য। 'আমি তো বুঝতেই পারছি না তোদের কাণ্ডকারখানা কী! এদিকে বলছিস, বাচ্চা হয়েছে, আবার বলছিস থানায়। বাচ্চা হবার সঙ্গে থানার সম্পর্কটা কী?'

'বাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এ্যাঁ—'

'হ্যাঁ, চন্দনাদি কিছুতেই নাম বলছে না।'

'কিন্তু আমি বাপ কোথায় পাবো?'

'আপনি গিয়ে দাঁড়ালেই···'

'স্টপ।' রাগে চিৎকার করে উঠি। 'হোয়াট ডু ইউ মীন? থাপড়ে চোপড়া ভেঙে দেবো তোর।'

পায়ে হাত রেখে শ্রীমান মা কালীর মতো জিভ কাটে। নিজের জন্মের দোষ দেয় নিজেই, 'মাফ করে দিন দাদা, আমি ঠিক ও-কথা বলতে চাইনি। মানে আপনি না গেলে ব্রহ্মার বাপ শিবের সাধ্যি নেই চন্দনাদির মুখ থেকে

নামটা টেনে বের করে। বাপ না বেরোলে দাদা, দলের লোকদের ওপর থেকে পুলিশের সন্দেহ যাবে না। দলও ছাড়বে না।'

মাসখানেক আগেই দলের গান শুনতে গিয়েছিলাম। সকলের সঙ্গে চন্দনাও এসে খোঁজ খবর নিয়েছিলো আমার। বেশ মনে আছে তখনও ওর সিঁথিপথে রক্তের দাগ দেখিনি। ও যখন চাকরী করতে এলো তখন থেকে সকলেই জানে চন্দনা কুমারী।

থানায় পৌঁছলাম সকাল দশটায়। দেখি বাচ্চাকে টাওয়েলে জড়িয়ে কোলে শুইয়ে পা তুলে বসে আছে চেয়ারে। মাথা তুলছে না।

দলের লোকরা সব আশপাশে ঘুরঘুর করছে। মেয়েরা বসে আছে বাসে। বাসটা থানার চৌহদ্দীতে ঢোকানো। আমি একজন অভিনেত্রীকে ডাকলাম। তাকে খুলে বলতে বললাম সব ঘটনাটা। কিন্তু বলবে কি, সে বেচারী লজ্জায়, হাসিতে জুড়িয়ে যাচ্ছে। আমি গম্ভীর হই, 'তোরা বুঝতে পারিসনি কিছু?'

না। মেয়েটি মাথা নেড়ে জানালো আগে, মুখ খুললো পরে, 'একদমই বোঝা যায়নি। তবে আলোদি একদিন আমাদের সামনেই ওকে ডেকেছিলেন। বললেন, চন্দনা তোর তলপেটটা একটু যেন···। উত্তরে চন্দনাদি মুচকি হেসে বললেন, ফ্যাট আলোদি, ফ্যাট হয়েছে···'

'বাচ্চাটা হলো কখন?'

'দেখিনি।' মেয়েটি হাসতে গিয়ে আঁচলে মুখ ঢাকা দিলো। 'যাত্রা হয়ে গেলে বাসাবাড়িতে শুতে গেলাম আমরা। ঘুমোচ্ছিলাম সবাই। হঠাৎ তনুদির চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে দেখি চন্দনাদি ছেলে কোলে করে বসে আছে।'

সব শোনার পর আমার নিজেরই কেমন অস্বস্তি লাগছিলো। কী করে মেয়েটিকে শুধবো বাচ্চা হবার কাহিনী? অথবা এই বাচ্চাটার পিতার নাম? আর শুধোলেই কি মেয়েটি স্বচ্ছন্দে বলবে, না বলতে পারবে? একবার ভাবি সরাসরি জিজ্ঞেস করি। আবার ভাবি এই মহিলা এবং এই নবজাতকে নিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সকলের সামনে ওকে কিছু প্রশ্ন করাই বোকামি।

চন্দনা গোঁজ হয়ে বসে রয়েছে। মুখ তুলছে না কিছুতেই।

থানা অফিসারের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন, ভিকটিম নাকি দলেই আছে। আর সেজন্যেই মেয়েটি নাম বলতে ভরসা পাচ্ছে না—পাছে তাকে এ্যারেস্ট করা হয়। এবং তিনি আরও জানালেন যে, দলের লোকজন নিশ্চয় জানতো ব্যাপারটা। নরমাল ডেলিভারি যখন তখন নিশ্চয় ফুল-মান্থস। সুতরাং…

মনে মনে সাহস সঞ্চয় করি। পা পা করে একবুক ইতস্তত নিয়ে এগোই।

'বাচ্চাটা ভালো আছে রে?'

ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো চন্দনা।

'কাঁদিস না।' আমি সান্ত্বনা দিই। 'এখন কেঁদে আর কী হবে। দল-মালিককে বলেছি তোকে তোদের বাসায় পাঠাতে। গাড়িও রয়েছে। তুই চলে যা। কিন্তু লক্ষ্মী বোন, নামটা বলে যা। নইলে এতগুলো সম্প্রদায়…'

চন্দনা তার কাহিল, বিবর্ণ, পাণ্ডুটে ভেজা মুখ তুলে একবার তাকিয়ে আবার মাথা নিচু করলো।

'আমাকে বল।' আবার অনুরোধ করি। দু' পা এগিয়েও যাই। 'কাউকে বলবো না আমি। থানাতেও কেবল খাতাতেই থাকবে নামটা। তুই না বললে, গান-জয়েন হবে না। থানা তোদের কাউকে ছাড়বে না।'

তবু মুখ তোলে না চন্দনা। তার কোল জুড়ে টাওয়েলে জড়ানো সদ্যোজাত শিশুটি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, দেবশিশুর মতো টুকটুকে একটি লালাভ মুখ—পরম নিশ্চিন্ত। জানে না, ওরই আবির্ভাব চন্দনা নামক একজন জননীকে এই মুহূর্তে কলঙ্কের কী ভয়ানক পঙ্কের অতলে নামিয়ে এনেছে।

ভগা! আসর গুলজার করে বসা লোকগুলো এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলো।

'রামায়ণ, রামায়ণ—', বিজ্ঞের মতন বিস্ময়কর একটা ডেলিভারি দিলেন বিজয় মিত্তির। 'জার্মানরা বুঝলি, এই রামায়ণ থেকেই তো সূত্রফুত্র নিয়ে দেশটাকে ভারতের মতন উন্নত করে তুললো। সেই রামায়ণেই রয়েছে আমাদের ভগার কথা।'

সুবল অধিকারী বললেন, 'তুমি কি কর্ণের কথা বলছো?'

'মূর্খ!' বিজয়দা জব্বর গলায় একটা ধমক দিলেন। 'কেনো তো মহাভারতে। আমাদের কুন্তীর ছেলে। কুমারীর গর্ভে হলেও সে ব্যাটার বাপটা ঠিকই

ধরা পড়েছিলো। তার মানে বাপ ছিলো। কিন্তু ভগা ব্যাটার বাপই জন্মায় নি।'

সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলো বিজয়দার দিকে।

'পড়িসনি তো?' বিজয় মিত্তির এক ফুৎকারে সকলের জ্ঞানগম্যি কাচিয়ে ফেললেন, 'হিঁদুর ছেলে রামায়ণ পড়িসনি—তোরা কী র‍্যা!'

শিল্পীতীর্থের মিলন বললো, 'বা—বাঙালী। তুমি যদি এ-এখন বিজ্ঞানকে ডি-ডিঙিয়ে……'

'বিজ্ঞান!' ঠোঁট দুটো পাখির ঠোঁটের মতন করে দু'চোখ ঠেলে কপালের দিকে তুলে দিয়ে অল্পক্ষণ থম্ ধরে থাকলেন বিজয়দা। তারপর আচমকা মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিলেন, 'রাখ তোর বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের ক্ষামতা কী? সে বরং ভগার জন্মটা মেনেই নিয়েছে। আসলে কী? উ? জ্ঞান থেকেই বিজ্ঞান। কিন্তু জ্ঞানটা কী তাই বল দেখি শুনি?'।

আসর নিস্তব্ধ।

'রামায়ণ। হ্যাঁ, রামায়ণই হলো গে আসল বিজ্ঞান। আর তারই আদি কাণ্ডে রয়েছে আমাদের ভগার জন্মরহস্য। কৃত্তিবাসী সচিত্র রামায়ণের, এই ধর গিয়ে চব্বিশ পৃষ্ঠাতেই হবে।'

গোপালদা বললেন, 'রামায়ণটা না হয় বুঝলুম, কিন্তু আমাদের ভগাকে তো ঠিক আইডেন্টিফাই করতে পারলুম না।'

'দিলীপের ছেলে।' বিজয় মিত্তির রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে গোপালদার দিকে তাকালেন, 'গোমুখ্যু কোথাকার! দিলীপকে চিনলি না?'

'দিলীপ চাটুজ্জে? ভাবনা কাজী?'

'ধ্যুৎ!'

'অনামিকার দিলীপকুমার?'

'তোমার মাথা।' বিজয়দা চটে উঠলেন, 'অংশুমানের ছেলে দিলীপ। সেই যে: অংশুমান রাজ্য করে অযোধ্যানগরে। তাঁর পুত্র হইল দিলীপ নাম ধরে॥ সেই দিলীপ। তা ধর না কেন অযুত বৎসর অনাহারে ব্রহ্মার সেবা করে গেলো। কিন্তু ভুলটা করলো কোথায়? ঘরে যে যুবতী বউ সেদিকে তাকালো না। মরলোও ধর ব্রহ্মার সেবা করতে করতেই। এদিকে মহা বিপদ। সূর্যবংশই থাকে না। দেখা দিলো মহা সংকট। অবশেষে শিব এসে

দুই বউকে বর দিলেন : তোমাদের ছেলে হবে। ছেলে হবে কি র‍্যা! বিধবার পুত্র হওয়া কি চাট্টিখানি কথা?'

এবার আর কারও মুখে কথা নেই। বাস্তবিকই তো, বিজয় মিত্তিরের কথা যদি সত্য হয়, তবে দুই বিধবা নারীর সন্তান হবে কী করে!

বিজয়দা বললেন, 'দুই নারী কহে শুনি শিবের বচন। আমরা বিধবা, কিসে হইবে নন্দন॥ তাই তো, শিবের গাঁজার নেশা গেলো কেটে। মহা ফ্যাসাদ। কিন্তু বর তো ফিরিয়ে নেবারও উপায় নেই। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে যখন তখন উপায়! অনেক ভেবেচিন্তে শিব সমাধান করে দিলেন। বিনা বাপেই জন্মালো আমাদের ভগা—মানে ভগীরথ। তা হ'লে বোঝ, বাপ ছাড়াও সন্তান হতে পারে।'

'কিন্তু', প্রিন্স দিলীপ মাথা চুলকোতে থাকে। 'বুঝলুম জন্মায়, কিন্তু কেমন করে তা তো জানা হলো না বিজয়দা।'

'অপসংস্কৃতি।' বিজয় মিত্তির চোখমুখ কুঁচকে দাঁত বের করে ভেংচি কাটার মতন ভাব করলেন। 'জানতি চেয়ো না, জানতি চেয়ো না—তা হ'লেই অপ-সংস্কৃতি হয়ে যাবে, হ্যাঁ।'

'কিন্তু তুমি তো বললে, রামায়ণে আছে।'

'আছে।'

'তবে রামায়ণও অপসংস্কৃতি?'

'তুই বুদ্ধু না বুদ্ধদেব—কোনটা? পড়। পড়লে অপ হয় না। শুনসনি সেই ব্রহ্মবাক্যি?'

'তোমার তো বিজয়দা রামায়ণ মহাভারতাদি মুখস্ত', অভয় সাহা বললো, 'না হয় তুমিই আমাদের শোনালে।'

'কণ্ঠস্থ।' ঘুমের ঘোরে ঝুঁকে পড়া মাথাটা কায়দা করার মতন একটা ভঙ্গি করলেন বিজয়দা, 'চোদ্দ বছর বয়সে বেদাদি গ্রন্থ এবং পুরাণাদি…… '

'তা হ'লে বলেই ফেলো দাদা।'

'শোন্ তা হ'লে।' বিজয় মিত্তির চোখ বুঁজে পান চিবোতে চিবোতে হঠাৎ তাকালেন, 'হ্যাঁ ওই চব্বিশ পৃষ্ঠাতেই পাবি : শঙ্কর বলেন, দুই জনে কর রতি। মম বরে একের হইবে সুসন্ততি॥ নে হলো এবার?'

থানা অফিসার দেখলাম মনে মনে ভীষণ তেতে আছেন। কথা প্রসঙ্গে

তিনি জানালেন, আমরা নাকি যাত্রায় এই সব আনসোস্তাল ক্রিয়াকাণ্ড প্রশ্রয় দিই। শুনে আমি হাসলাম। বললাম, 'আচ্ছা, এ-ধরনের কেস কি আপনার থানায় আসেনি কোনোদিন?'

'এসেছে। আসে।'

'তারাও কি যাত্রার লোক?'

'না।'

'তারা সভ্য সমাজের লোক তো?'

'হ্যাঁ।'

'তবে মশাই যাত্রাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? যাত্রা কি সমাজ ছাড়া?'

ভদ্রলোক তো-তো করছিলেন। কিন্তু চন্দনার প্রতি তাঁর যে সন্দেহ তা ওঠাতে তিনি রাজি নন। তিনি জনালেন, এ-ধরনের মেয়েরা নাকি ঘনঘন কুমারী সাজে। 'তা না হ'লে মশাই এমন ইজি ডেলিভারি হতে পারে? তার মানে, বুঝতেই তো পারছেন……

আবার হাসলাম আমি। তাকালাম। 'আপনি কি ও বিদ্যাতেও পাকা?'

ভদ্রলোক নড়েচড়ে বসলেন, 'মানে, কী মীন করছেন আপনি?' গলা খাঁকারি দিচ্ছিলেন।

'মানে ধাত্রীবিদ্যেটাও কি জানতে হয় নাকি আপনাদের?'

একমুখ হেসে ফেললেন ভদ্রলোক। বললেন, 'জজ আর জার্নালিস্ট এঁদের সঙ্গে পারা কঠিন।'

বললাম, 'তা ব'লে দয়া করে আসল তথ্য উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে আমায় একটু সাহায্য করুন?'

'আলবাৎ।' চটপট জবাব দিলেন ভদ্রলোক। 'বলুন, কি হেল্প্‌ করতে পারি?'

'দয়া করে ঘরটা ফাঁকা করুন।'

'ও: সিওর…' ভদ্রলোক বারান্দায় দিকে গেলেন।

ঘরে কেউ নেই। দেওয়াল ঘড়িটার পেণ্ডুলাম টক্‌টক শব্দ করছে। আমি কিছু বলবার আগেই চন্দনা মুখ তুললো। তাকালো তখনও। ওর সারামুখে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে ভাব। চোখ দুটোতে যেন কতো রাজ্যের ঘুম লুকনো।

ওষ্ঠ দু'টো শুকনো চামচুর। চোখের নীচে গাঢ় ছায়া কাঁপছিলো। নামটা বললো আমাকে।
শুনে আৎকে উঠলাম।
চন্দনা কাঁদতে কাঁদতেই বললো, 'দাদা ওঁর যেন কোনো শাস্তি না হয়।'
'কিন্তু ও কি এই সন্তানকে স্বীকৃতি দেবে ?'
'দেবে।' চন্দনা একবার তার কোলের শিশুটির মুখ দেখে নিলো। 'আপনি গিয়ে ওকে ডেকে পাঠাবেন, দেখবেন স্বীকার করে নেবে। আপনার সামনে মিথ্যে কথা বলবে না।'
থানা অফিসারকে ডাকলাম। বললাম নামটা। আরও বললাম, ছেলেটি আমার চেনা। বড় দলের অভিনেতা। ভালো বংশেরই ছেলে।
ভদ্রলোক আর অপত্তি বা সন্দেহ করলেন না। বললেন, 'ডাইরী করাই আছে। আপনি শুধু লোকটিকে একবারের জন্য যে কোনোদিন এই থানায় পাঠিয়ে দেবেন, টু মীট মি।'
চিত্র দেবী॥ শক্তিবিশেষ। বর্তমান কলিকাতা মহানগরীর উত্তরভাগে চিত্র দেবী নামে একটি শক্তিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এই দেবীর নামানুসারে ঐ অংশের নাম চিত্রপুর ও তৎপর তাহারই অপভ্রংশে চিৎপুর হইয়াছে।
বিজয় মিত্তির কথিত অপ্সরা চিত্রলেখার নামই কি চিত্রদেবী ?
বিজয়দা বললেন, 'তখন অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্মর কাল। সুতানুটি গোবিন্দপুর-টুরও নেই। জঙ্গল আর জঙ্গল। সেই অরণ্যে এই মহা রূপসীকে দেখে ইন্দ্র ব্যাটার অবস্থা কাহিল। কামের অগ্নিশিখা লকলক করে জ্বলছে মনের মধ্যে। অতএব উদ্ভিন্ন যৌবনবতীর পত্রশয্যায় সে অসংখ্য শুকনো পাতা হয়ে ছড়িয়ে থাকলো। আর রাত্রে যেই না চিত্রলেখার চোখে ঘুম নেমে এসেছে, অমনি পটাপট পাতাগুলো জড়িয়ে ধরলো তাকে। চিত্রলেখা ছটফট ছটফট করতে লাগলো। ততক্ষণে ইন্দ্র স্বরূপ ধরে ফেলেছে। উভয়ের অঙ্গই বেশবাসহীনা চিত্রলেখা ইন্দ্রের বাহুপাশ ছিন্ন করে ছিটকে বেরিয়ে এলো। তার চোখে জ্বলছে আগুন। হাত তুলেছে অভিশাপ দেবার জন্য। আর অমনি ইন্দ্র ব্যাটা হাওয়া।
ধ্যানে বসলেন চিত্রলেখা। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সামনে আসতে বাধ্য হলেন। চিত্রলেখা জানতে চাইলেন, কেন তার এই দুরবস্থা ? উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ

বললেন, 'এই তোমার জীবনলীলা। ইন্দ্রের গাত্রগন্ধ তোমার শরীরে। এই গন্ধ থেকেই হবে গর্ভ। জন্মাবে এক পুত্র। তারই অত্যাচারে দেহ থেকে তোমার আত্মা মুক্তি পাবে। দেহ হবে প্রস্তরীভূত। সেই প্রস্তরের মূর্তিই শক্তির উৎস হিসেবে পূজিত হবে।'

'কিন্তু আমার সেই অরতিজ পুত্র?'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছিলেন।
